উৎসর্গ

শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রিয়বরেষু

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

১ ।। মধ্যযুগের ইতিহাস : কয়েকটি সমস্যা

বর্তমান গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের সপ্তম অধ্যায়ে ভারত-ইতিহাসে মধ্যযুগের সূচনা-প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে গুপ্তোত্তর যুগ থেকেই এদেশে মধ্যযুগ শুরু হয়েছিল এটাই ধরে নিতে হবে কেননা তখন থেকেই একটা ভূমি নির্ভর সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির পাকা বনিয়াদ গড়ে উঠেছিল, যার উপর গোটা মধ্যযুগীয় সমাজ ব্যবস্থা মূলত নির্ভরশীল ছিল। এখানে ১০০০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ তুর্কী আক্রমণ শুরু হয়েছিল এবং ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তাদের এখানে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা ঘটে। সচরাচর ইতিহাসের এই পর্যায়টি থেকেই মধ্যযুগের ইতিহাস রচিত হয়ে থাকে, যদিও এই সময়কার সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা পূর্ববর্তী যুগের চেয়ে গুণগতভাবে পৃথক্ ছিল না।

এর অর্থ এই নয় যে মধ্যযুগের ভারত-ইতিহাসে কোন গতিশীলতা ছিল না। প্রথম পর্বে অর্থাৎ ১০০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কালপ্রবাহে, যখন শাসকশ্রেণী ছিল ধর্মে হিন্দু, মধ্যযুগের সূচনা হয়েছে ধীরে ধীরে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্বে, যখন শাসকশ্রেণী ছিল ধর্মে মুসলমান, মধ্যযুগের আসল বৈশিষ্ট্যগুলি সার্বিকভাবে প্রকটিত হয়েছে, এবং তৃতীয় পর্বের শেষের দিকে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগের উত্তরণের প্রকাশ দেখা গেছে। এই পরিবর্তনগুলির পিছনে বিভিন্ন অর্থনৈতিক শক্তির বিকাশ ও উৎপাদন পদ্ধতির অদলবদল নিঃসন্দেহে কার্যকর ছিল, কিন্তু ভূমি-নির্ভর সামন্ততান্ত্রিক মৌল উৎপাদন ব্যবস্থাটির বিশেষ কোন রূপান্তর না হবার দরুন গুণগত কোন ব্যাপক সামাজিক পরিবর্তন ঘটেনি। অর্থাৎ সাতশো বছরেরও অধিককাল সময়ে যতটা সামাজিক পরিবর্তন আশা করা সম্ভব ততটা মোটেই হয়নি।

ইংরাজ ঐতিহাসিকেরা মধ্যযুগের জনজীবনকে বিভিন্ন অর্থনৈতিক শ্রেণীতে বিভক্ত করে দেখার পরিবর্তে ধর্মের ভিত্তিতে হিন্দু ও মুসলমান এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিলেন ও তাদের সংঘাত প্রদর্শন করার চেষ্টা করেছিলেন। এই দৃষ্টিভঙ্গী আজও খুব সক্রিয়। তাঁরা আমাদের শিখিয়েছিলেন যে মুসলমান আমলে

হিন্দুদের সর্বনাশ হয়েছিল, নিরবচ্ছিন্ন অত্যাচার ও লাঞ্ছনার ভিতর দিয়ে তাদের দিন কাটাতে হয়েছিল, এবং এদেশে বৃটিশ রাজত্ব কায়েম হবার পর হিন্দুরা হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল। পরবর্তীকালে যে সকল ঐতিহাসিক হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রভাবে গড়ে উঠেছিলেন তাঁরা ভারত-ইতিহাসের মধ্যযুগটিকে তাই নেতিমূলক যুগ হিসাবে ধরে নিয়েছিলেন, এবং দিল্লী-সুলতানী বা মুঘল আমলে যাঁরা কেন্দ্রীয় শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে যাঁরা হিন্দু, যেমন রাণা প্রতাপ বা শিবাজী, তাঁদের আদর্শ চরিত্র জাতীয় বীর হিসাবে দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন। পক্ষান্তরে মুসলমান ঐতিহাসিকদের মধ্যে অনেকেই এই যুগটিকে ইসলামের বিজয়ের এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্বের ও গৌরবময় যুগ হিসাবে দেখাতে চেয়েছিলেন। উভয় তরফের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে একটি ক্ষেত্রে বড় মিল ছিল যা হচ্ছে শাসকদের ব্যক্তিত্ব, তাদের ব্যক্তিগত উচ্চাশা, যোগ্যতা-অযোগ্যতা, উদারতা-ধর্মান্ধতা, এইগুলিই যেন মধ্যযুগের ইতিহাসের নিয়ামক, অন্য কিছু নয়। উভয় তরফেরই বক্তব্য মুসলমানরা বিচ্ছিন্নভাবেই বাইরে থেকে এসেছে, বৃহত্তর ভারতীয় জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েই তারা রাজত্ব গড়ে তুলেছে, বিচ্ছিন্নভাবেই উদার কিংবা অনুদার হয়েছে, সমগ্র ভারতীয় পরিবেশের সঙ্গে তাদের যেন কোন সম্পর্কই ছিল না, তার উপর তারা কেউই নির্ভরশীল ছিল না। এটা যথার্থ ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী নয়।

মধ্যযুগে বিভিন্ন অর্থনৈতিক শ্রেণীর সংঘাত অবশ্যই ছিল, সেটা কিন্তু হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের নয়। সে যুগে নিষ্ঠুরতা ও নৃশংসতার কোন ঘাটতি ছিল না, সেটা সে যুগের শাসকশ্রেণীর বিশেষত্ব, তারা কোন্ ধর্মাবলম্বী ছিল সেটা বড় কথা নয়। জনসাধারণের সংখ্যা গরিষ্ঠ অংশ হিসাবে উৎপীড়িতদের মধ্যে হিন্দুদেরই সাংখ্যাধিক্য থাকবে এটাই স্বাভাবিক। মধ্যযুগে কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার খবর পাওয়া যায় না, এবং সুলতানরা যে ব্যাপকভাবে হিন্দুদের ইসলামধর্মে দীক্ষা দেবার চেষ্টা করে-ছিলেন, বা প্রচণ্ড উৎসাহে ইসলামী আদর্শ প্রচার করেছিলেন তার কোন প্রমাণ নেই। বলপূর্বক ধর্মান্তরের ঘটনা যে পাওয়া যায় না তা নয়, কিন্তু এগুলি ঘটত মূলত রাজনৈতিক স্বার্থে, কোন ব্যক্তি বা পরিবারের ক্ষেত্রে, কখনোই ব্যাপকভাবে সাধারণের মধ্যে নয়। মন্দিরাদি ধ্বংসের ব্যাপারগুলি ছিল লুণ্ঠনের উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং এটাও কোন সার্বিক নীতি ছিল না। মন্দির নিয়েও রাজনীতি ছিল, যার মধ্যে শাসকেরাও মাঝে মাঝে জড়িয়ে পড়ত। হিন্দু সাধুসন্তদের প্রতিও অনেক মুসলমান সুলতান শ্রদ্ধাশীল ছিলেন তার প্রমাণ আছে।

যে সব নিম্নবর্ণের লোকেরা—হয়ত সামাজিক ন্যায়বিচারের আশায়—ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল, তারা তা পায়নি। ধর্ম বদল করলেও পেশার বদল হয়নি, মর্যাদারও বৃদ্ধি হয়নি, শাসকদের চোখেও নয়। এমন কি উচ্চদের ক্ষেত্রেও ভারতে দীক্ষিত মুসলমান ও বহিরাগত মুসলমানদের মধ্যে পার্থক্য ছিল। ক্ষমতার জন্য বিভিন্ন মুসলমান গোষ্ঠীর পারস্পরিক সংঘর্ষে বিবদমান পক্ষগুলিকে হিন্দু সামন্তরাজা ও জমিদারদের উপরই নির্ভর করতে হত। রাজনৈতিক শক্তির বিন্যাস নূতনভাবে হওয়া সত্ত্বেও পূর্বের কাঠামোর—অর্থাৎ দেশজুড়ে অসংখ্য ছোট ছোট সামন্তরাজ্যের অবস্থিতির—কোন পরিবর্তন হয় নি। তাই বাস্তব শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে হিন্দুরাই সর্বেসর্বা রয়ে গিয়েছিল। কেন্দ্র থেকে গ্রাম পর্যন্ত সর্বস্তরে পূর্বতন পদাধিকারীদের সরিয়ে নিয়ে নিজেদের লোক বসানো অসম্ভব ছিল, কাজেই এই সকল ক্ষেত্রে হিন্দু রাজা, রাও, জমিদার, রাণা, চৌধুরী এরাই রয়ে গিয়েছিল, নির্দিষ্ট খাজনা ও আনুগত্যের বিনিময়ে এরা তাদের পূর্বতন সকল সুযোগ সুবিধা ও পদমর্যাদা বজায় রাখতে পেরেছিল। এই ঐতিহ্য বরাবরই বজায় ছিল, এমন কি পরবর্তীকালের ইংরাজ আমলেও ভারতের অনেকখানি অংশ জুড়ে। জমিদার শ্রেণী ছিল মূলত হিন্দু, ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রটিও ছিল হিন্দু ও জৈনদের দখলে। মুদ্রাব্যবস্থার তারাই ছিল পরিচালক, এমন কি কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলির রাজস্ববিভাগের কর্মচারীরা এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে শাসন ও সামরিক বিভাগের অধিকারীরাও ছিল হিন্দু।

কাজেই ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীর নিরিখে মধ্যযুগের ইতিহাস বিশ্লেষণের যে কোন প্রচেষ্টাই প্রকৃত ঐতিহাসিক বোঝাপড়ার পক্ষে অনুকূল হবে না। এ-পর্যন্ত মধ্যযুগের বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর পারস্পরিক সম্পর্ক, বিভিন্ন অর্থনৈতিক শক্তির সংঘাত ও জনজীবনে তার প্রতিক্রিয়া, এই সকল বিষয় নিয়ে পর্যাপ্ত কাজ হয়নি। এমন কি মধ্যযুগে রচিত ঐতিহাসিক গ্রন্থসমূহের প্রকৃত চরিত্র বিশ্লেষণ করা হয়নি। সেই যুগের কোন বিশেষ ঐতিহাসিকের বক্তব্যের যথার্থতা সর্বক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্যের উপরেই নির্ভর করে না। সেটি জানতে পারা যায় তৎরচিত গ্রন্থটির আভ্যন্তরীণ সমালোচনার দ্বারা। দুর্ভাগ্যক্রমে এখানে সে ধরনের গবেষণা হতে আজও বাকি আছে।

২ ॥ রাজনৈতিক প্রচ্ছদপট

এদেশে তুর্কী অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে সময় লেগেছিল দীর্ঘকাল, প্রায় চারশো বছর, এবং সেই হিসাবে এই সুদীর্ঘকালীন ব্যাপারটিকে কোনমতেই বহিরাক্রমণ ও তার সাফল্য বলে গণ্য করা যায় না। মুঘলেরা এদেশে স্থানীয় তুর্কীদেরই পরাস্ত করে ক্ষমতায় আসীন হয়েছিল, এবং তারাও কিছুকালের মধ্যে স্থানীয় শক্তিতে পরিণত হয়। আমরা পূর্বেই বলেছি, বিভিন্ন অঞ্চল তুর্কীদের অধীনে যাবার পর সেখানকার বিজিত রাজারাই দখলদারদের তরফ থেকে অধীনস্থ রাজা হিসাবে শাসনকার্য চালাবার অধিকার পেয়েছিলেন। আলাউদ্দীন খলজীর মত জবরদস্ত সুলতানও এই রীতি মেনে চলেছিলেন। কেউ কেউ নিষ্ঠাভরে অধীনতা মেনে নিয়ে নিজস্ব দায়িত্ব পালন করেছেন, আবার কেউ কেউ সুযোগ বুঝে আনুগত্য বদলেছেন বা বিদ্রোহ করেছেন। অর্থাৎ তুর্কী শক্তিগুলির প্রাধান্যলাভের পূর্বযুগে ভারতীয় রাজনীতির যে প্যাটার্ণ চালু ছিল, পরবর্তীকালেও তার বিশেষ হেরফের হয়নি।

তুর্কী শক্তিগুলির প্রতিষ্ঠালাভের যুগে উত্তর ও পশ্চিম ভারতের স্থায়ী রাজনৈতিক শক্তিসমূহের বিন্যাস আমরা যে অঞ্চলগুলি ধরে দেখতে পাই সেগুলি হচ্ছে কাশ্মীর, পাঞ্জাব, কনৌজ (হরিয়ানা ও উত্তরপ্রদেশের কিয়দংশ), গুজরাত, রাজস্থান ও তৎসন্নিহিত অঞ্চল। কাশ্মীরে তুর্কী অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে। ১৩৩৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজা উদয়নের মৃত্যু ঘটলে তাঁর মুসলমান সেনাপতি শাহ্‌মের তাঁর বিধবা পত্নীকে বিবাহ করেন এবং শংসদ্দীন বা সামসুদ্দীন নাম নিয়ে সিংহাসনে বসেন। পাঞ্জাবে গজনীর ইয়ামিনি বংশের অধিকার স্থাপিত হয়েছিল একাদশ শতকে যাঁদের নিযুক্ত প্রতিনিধিরা ওই অঞ্চল শাসন করতেন। দ্বাদশ শতকের শেষের দিকে ১১৮৬ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাব ঘুরীদের অধিকারে আসে মুইজুদ্দীন মুহম্মদ ঘুরীর লাহোর বিজয়ের পর। কনৌজ তুর্কীদের দ্বারা বিজিত হয়েছিল ত্রয়োদশ শতকের মাঝামাঝি। ১২৩৬ খ্রীষ্টাব্দের কিছু আগে ইলতুৎমিশ অড়কমল্লকে পরাস্ত করে কনৌজ দখল করেন। পুনরায় ১২৯৯ খ্রীষ্টাব্দে আলাউদ্দীন খলজীর দুই সেনাপতি উলুঘ খান ও নুসরৎ খান কর্ণের নিকট থেকে কনৌজ অধিকার করেন। গুজরাতে তুর্কী অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় ত্রয়োদশ শতকের শেষ বছরে। রাজস্থান ও তার সন্নিহিত অঞ্চলগুলি ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকের আগে বিজিত হয়নি। বয়ানশ্রীপথ, অর্থাৎ ভরতপুর অঞ্চলের যদুবংশীয়রা ত্রয়োদশ শতকের শেষ পর্যন্ত স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেছিলেন। প্রতীহার বিগ্রহের বংশধরদের হাত থেকে বলবন গোয়ালিয়র

দখল করেন ১২৫৮ খ্রীষ্টাব্দে। মেবারের গুহিল বংশীয় রত্নসিংহের আমলে ১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দে আলাউদ্দীন খলজী চিতোর দখল করেন। শাকম্ভরীর চাহমান বংশীয় তৃতীয় পৃথ্বীরাজ ১১৯২ খ্রীষ্টাব্দে মুহম্মদ ঘুরীর হাতে পরাজিত ও নিহত হন। ১১৯৪-এর কিছু পরে কুতবুদ্দীন আজমীর দখল করেন, এবং ১১৯৭ খ্রীষ্টাব্দে নাডোল। আলাউদ্দীন খলজী ১৩০১ খ্রীষ্টাব্দে রণথম্ভোর দখল করেন এবং ১৩১১ খ্রীষ্টাব্দে জালোর।

মধ্যাঞ্চলের শক্তিগুলি ছিল মালব (বর্তমান মধ্যপ্রদেশের একটা বড় অংশ), জেজাকভুক্তি (যার উত্তর সীমা ছিল আগ্রা থেকে শুরু করে যমুনা নদী বরাবর এলাহাবাদ পর্যন্ত এবং দক্ষিণ সীমা ছিল জব্বলপুর পর্যন্ত) এবং ডাহল (জব্বলপুর ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল)। মধ্যাঞ্চলের এই রাজ্যগুলি চতুর্দশ শতকের পূর্বে বিজিত হয়নি। ১৩০৫ খ্রীষ্টাব্দে আলাউদ্দীন খলজী মালব অধিকার করেন। জেজাকভুক্তির চন্দেল্লরা এবং ডাহলের কলচুরিরা চতুর্দশ শতকেও নিজেদের স্বাতন্ত্র বজায় রাখতে পেরেছিল।

দক্ষিণ অঞ্চলের মধ্য ও পশ্চিমদিকের শক্তিকেন্দ্রগুলি ছিল কল্যাণ, কোঙ্কণ ও দেবগিরি, পূর্বদিকের কেন্দ্রগুলি ছিল বরঙ্গল, অন্ধ্র ও কলিঙ্গ, এবং সুদূর দক্ষিণে পাণ্ড্যরাজ্য। চতুর্দশ শতক পর্যন্ত তুর্কীশক্তি কার্যত দক্ষিণে প্রবেশ করতে পারেনি। দক্ষিণ ভারতের মধ্য ও পশ্চিম অঞ্চলের শক্তিগুলির মধ্যে একমাত্র দেবগিরিই তুর্কী আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছিল, কিন্তু ১৩১৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে তা পাকাপাকিভাবে বিজিত হয়নি। দক্ষিণ ভারতের পূর্বাঞ্চলে বরঙ্গলের কাকতীয়রা চতুর্দশ শতকেও তুর্কী অধিকারে আসেনি। উড়িষ্যা শুধু তুর্কীদের প্রতিহতই করেনি, তাদের বিরুদ্ধে সাফল্যের সঙ্গে আক্রমণাত্মক যুদ্ধ চালিয়েছিল। সুদূর দক্ষিণের পাণ্ড্যরা ও দোর-সমুদ্রের হোয়সলরা তাদের স্বাধীন সত্তা বজায় রাখতে পেরেছিল খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতকেও।

পূর্বাঞ্চলের শক্তিগুলি ছিল মিথিলা, বঙ্গদেশ ও কামরূপ। বখ্‌তিয়ার খলজীর হাতে ১২০২ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ বাংলার সেনবংশীয় রাজা লক্ষ্মণসেন পরাস্ত হলেও তাঁর উত্তরাধিকারীরা ত্রয়োদশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করেছিলেন। মিথিলার রাজা হরিসিংহ ১৩২৪ খ্রীষ্টাব্দে সম্ভবত গিয়াসুদ্দীন বলবনের একটি আক্রমণ প্রতিহত করেছিলেন। চতুর্দশ শতকেও কামরূপ তুর্কী অধিকারে আসেনি।

৩ ॥ পাঞ্জাব, কনৌজ, গুজরাত

১০৩০ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান মামুদের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারী মাসুদ নিয়াল্তিগীন নামক এক ব্যক্তিকে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। কিন্তু এই ব্যক্তি মাসুদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করলে তিনি তিলক নামক একজন হিন্দুকে তাঁর বিরুদ্ধে পাঠান। যুদ্ধে নিয়াল্তিগীন পরাজিত হন এবং পলায়নকালে জাঠরা তাঁকে নিহত করে। মৌদুদ যখন গজনীর সুলতান তখন পরমার ভোজ, কলচুরি কর্ণ ও চাহমান অনহিলের নেতৃত্বে একটি স্থানীয় শক্তিজোট নগরকোট ও হান্সী থেকে তুর্কীদের উচ্ছেদ করে। গজনীর পরবর্তী এক সুলতান ইব্রাহিম ১০৭৫-এ তাঁর পুত্র মাহ্মুদকে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন, যিনি আগ্রা ও কনৌজ লুণ্ঠন করলেও উজ্জয়িনী আক্রমণ করতে গিয়ে পরমার লক্ষ্মদেবের নিকট পরাজিত হন। গজনীর তৃতীয় মাসুদের আমলে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা ছিলেন উজ্দ্-উদ্-দৌলা, যাঁর সেনাপতি তুঘাতিগীন কনৌজের গাহড়বাল রাজা মদনচন্দ্রকে পরাজিত ও বন্দী করেন। কিন্তু মদনচন্দ্রের পুত্র গোবিন্দচন্দ্র এর প্রতিশোধ নেন এবং পিতাকে উদ্ধার করেন। ১১১৮র পর থেকেই পাঞ্জাবের শাসনকর্তারা গজনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন, অপর দিকে গজনীও ঘুর বংশীয়দের হাতে বিপন্ন হয়। ১১৫৭ খ্রীষ্টাব্দে গজনীর সুলতান খুসরব শাহ্ গজনী হারিয়ে লাহোর এসে রাজত্ব শুরু করেন, এবং তাঁর পুত্র খুসরব মালিকের সময় ১১৮১, ১১৮৪ এবং ১১৮৬ সালে মুহম্মদ ঘুরীর আক্রমণে পাঞ্জাবের গজনীর সুলতানদের শাসনের অবসান ঘটে।

১০৬৮ থেকে ১০৮০-র মধ্যে কনৌজ গজনীর সুলতানদের হাতে এসেছিল এবং তাঁদের তরফ থেকে চাঁদ রায় নামক একজন হিন্দু কনৌজের স্থানীয় শাসক নিযুক্ত হন। ইনিই সম্ভবত গাহড়বাল বংশীয় চন্দ্রদেব যিনি পরে স্বাধীনতা ঘোষণা করে-ছিলেন। তাঁর লেখমালা থেকে জানা যায় যে কনৌজ, বারানসী ও অযোধ্যা তাঁর অধীনে ছিল। তাঁর পুত্র মদনচন্দ্র ও পৌত্র গোবিন্দ চন্দ্রের কথা আগেই বলা হয়েছে। গোবিন্দ চন্দ্রের উত্তরাধিকারী বিজয়চন্দ্র গজনীর খুসরব মালিকের আক্রমণ প্রতিহত করেন। ১১৭০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর পুত্র জয়চন্দ্র রাজা হন। ১১৯৩ খ্রীষ্টাব্দে এটাওয়া জেলার চন্দাবার নামক স্থানে তিনি মুহম্মদ ঘুরীর হাতে শোচনীয় ভাবে পরাজিত হন, কিন্তু ১১৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর পুত্র হরিশ্চন্দ্র যে জৌনপুর, মীর্জাপুর ও কনৌজের উপর পুনরায় অধিকার স্থাপন করতে পেরেছিলেন তার প্রমাণ আছে। তাঁর উত্তরাধিকারী অড়ক্কমল্লের হাত থেকে ইলতুৎমিশ কনৌজ দখল করেন ১২৩৬

খ্রীষ্টাব্দের কিছু আগে।

১০২৫ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান মাহ্‌মুদের সোমনাথ লুণ্ঠন ও গুজরাত আক্রমণের কালে সেখানকার রাজা ছিলেন চৌলুক্যবংশীয় ভীম, যাঁর উত্তরাধিকারীরা ছিলেন কর্ণ (১০৬৪-৯৪), জয়সিংহ (১০৯৪-১১৪৫), কুমার পাল (১১৪৫-৭২) এবং অজয়পাল (১১৭২-৭৬)। শেষোক্তের পুত্র মূলরাজের আমলে ১১৭৮ খ্রীষ্টাব্দে মুহম্মদ ঘুরী একটি নিষ্ফল আক্রমণ করেন। পরবর্তী রাজা দ্বিতীয় ভীম ১১৯৫ খ্রীষ্টাব্দে কুতবুদ্দীনের আক্রমণ প্রতিহত করেন, কিন্তু ১১৯৭ খ্রীষ্টাব্দে কুতবুদ্দীন পুনরায় গুজরাত আক্রমণ করেন এবং অনহিলপাটক লুণ্ঠন করেন। পরবর্তীকালে গুজরাতে চৌলুক্যদের সামন্ত বাঘেল বংশীয়রা শক্তিমান হয়, এবং ওই বংশীয় সারঙ্গদেব (১২৭৪-৯৬) গুহিল সমর সিংহের সহায়তায় তুর্কী আক্রমণ প্রতিহত করেন। পরবর্তী রাজা কর্ণকে আলাউদ্দীন খলজীর দুই সেনাপতি উলুঘ খান ও নুসরৎ খান পরাস্ত করে গুজরাত দখল করেন ১২৯৯ খ্রীষ্টাব্দে।

৪ ॥ রাজস্থান ও সন্নিহিত অঞ্চল

রাজস্থান ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজবংশ একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত রাজত্ব করেছিল। বয়ান-শ্রীপথ অঞ্চল, অর্থাৎ ভরতপুরে, যদুবংশীয়দের শাসন ছিল। এই বংশের কুনবার পাল ১১৯৬ খ্রীষ্টাব্দে মুহম্মদ ঘুরী কর্তৃক পরাজিত হলেও তাঁর উত্তরাধিকারীরা ত্রয়োদশ শতকের শেষ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। গোয়ালিয়রে কচ্ছপঘাত বংশীয় কীর্তিরাজ ১০২১ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান মাহমুদের বশ্যতা স্বীকার করেন। ১০৯৬ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কীরা তাঁর বংশধরদের কাছ থেকে গোয়ালিয়র অধিকার করে। আরম শাহ যখন দিল্লীর সুলতান, প্রতীহার বিগ্রহ তুর্কীদের পরাজিত করে গোয়ালিয়র দখল করেন। তাঁর উত্তরাধিকারীদের হাত থেকে বলবন ১২৫৮ খ্রীষ্টাব্দে গোয়ালিয়র জয় করেন। কচ্ছপঘাতদের আর একটি শাখা নারওয়ারে রাজত্ব করত, ১২৩৪ খ্রীষ্টাব্দে যাদের রাজা ছাহড়দেব ইলতুৎমিশের সেনাপতি মালিক নসরতুদ্দীন তয়সাইকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। ১২৫১ খ্রীষ্টাব্দে বলবন তাঁকে পরাজিত করলেও নারওয়ার দখল করতে পারেননি। আবু-পাহাড় অঞ্চলের পরমার শাসক ধারাবর্ষ ১১৯৭ খ্রীষ্টাব্দে কুতবুদ্দীনের সেনাপতি খুসরবের হাতে পরাজিত হলেও, সে ধাক্কা সামলাতে পেরেছিলেন। মেবারের গুহিল বংশীয় জৈত্রসিংহের আমলে ত্রয়োদশ শতকের গোড়ার দিকে ইলতুৎমিশ মেবারের

উপর আক্রমণ চালান, কিন্তু বাঘেল বীরধবল জৈত্রসিংহকে সাহায্য করতে আসছেন এই সংবাদ পেয়ে ইলতুৎমিশ তাঁর সৈন্যবাহিনী ফিরিয়ে নেন। ত্রয়োদশ শতকের শেষের দিকে জৈত্রসিংহের বংশধর সমর সিংহ আলাউদ্দীন খলজীর ভাই উলুঘ খানের বশ্যতা স্বীকার করেন। তাঁর পুত্র রত্নসিংহের আমলে ১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দে আলাউদ্দীন খলজী চিতোর জয় করেন, এবং তার কিছুকাল পরে রত্নসিংহের ভাগ্নে মালদেবের হাতে চিতোরের শাসনভার অর্পণ করেন। মালদেব আলাউদ্দীনের সামন্ত হিসাবেই শাসন করেছিলেন। শিশোদিয়ায় গুহিলদের একটি শাখাবংশ রাজত্ব করত যার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রাহপ। তুঘলক বংশীয়দের রাজত্বকালে এই বংশের হম্মীর মালদেবের পুত্র জেসোকে উৎখাত করে চিতোরে শিশোদিয়াদের প্রাধান্য স্থাপন করেন।

একাদশ থেকে চতুর্দশ শতকের সূত্রপাত পর্যন্ত চাহমানদের পাঁচটি শাখা শাকম্ভরী রণস্তম্ভপুর, নাডোল, জাবালিপুর ও দেবড়ায় যথাক্রমে রাজত্ব করত। শাকম্ভরীর চাহমানরা বিস্তৃত রাজ্যের অধিকারী ছিলেন। ১১৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় পৃথ্বীরাজ এই বংশের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এদিকে ১১৭৮ খ্রীষ্টাব্দে মুহম্মদ ঘুরী চাহমানদের অপর একটি শাখাবংশের রাজধানী নাডোল অধিকার করেন, কিন্তু অপর দিকে তাঁর এক বাহিনী চৌলুক্য দ্বিতীয় মূলরাজের হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় এবং মুহম্মদ ঘুরী নিজ অঞ্চলে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হন। ১১৮৬ খ্রীষ্টাব্দে মুহম্মদ ঘুরী ইয়ামিনি বংশের শেষ শাসক খুসরব মালিককে পরাজিত করে গজনী অধিকার করেন এবং শক্তি সংহত করার পর পুনরায় ভারতের দিকে নজর দেন। পৃথ্বীরাজের সঙ্গে তাঁর মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় প্রথম বার ১১৯০-৯১ খ্রীষ্টাব্দে থানেশ্বর থেকে ১৪ মাইল দূরে তরাইন নামক স্থানে। মুহম্মদ ঘুরী পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন। পরের বছর তিনি ওই একই স্থানে পৃথ্বীরাজের মুখোমুখি হন। এবং যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ পরাজিত, বন্দী এবং পরে নিহত হন। হাসান নিজামী লিখেছেন যে মুহম্মদ ঘুরী পৃথ্বীরাজের এক নাবালক পুত্রকে সিংহাসনে বসিয়েছিলেন! অতঃপর তিনি দিল্লী দখল করে তাঁর সেনাপতি কুতবুদ্দীনের হাতে ওই অঞ্চলের দায়িত্ব অর্পণ করে ফিরে যান। ১১৯৪-এর কিছু পরে কুতবুদ্দীন আজমীর দখল করেন। চাহমানদের দ্বিতীয় একটি শাখা রাজত্ব করত রণস্তম্ভপুর বা রণথম্ভোর অঞ্চলে। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোবিন্দরাজ ও তাঁর পুত্র বালহণদেব ইলতুৎমিশের সামন্ত ছিলেন, কিন্তু বালহণদেব ১২১৫ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পরে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১৩০১ খ্রীষ্টাব্দে আলাউদ্দীন

খলজী রনথম্ভোর দখল করেন। চাহমানদের যে শাখাটি নাডোলে রাজত্ব করত সেই শাখার কেলহন (১১৬৩-৯৪) কাসহ্রদ নামক স্থানে চৌলুক্যদের সঙ্গে মুহম্মদ ঘুরীকে প্রতিহত করেছিলেন। তাঁর পুত্র জয়তীসীহের আমলে ১১৯৭ খ্রীষ্টাব্দে কুতবুদ্দীন নাডোলের কিছু অংশ দখল করেন। চাহমানদের জাবালিপুর বা জালোর শাখায় উদয়সিংহ ১২১১ থেকে ১২১৬-র মধ্যে কোন সময়ে ইলতুৎমিশের কাছে পরাজিত হয়ে তাঁর সামন্তে পরিণত হন। ১৩১১ খ্রীষ্টাব্দে আলাউদ্দীন খলজী এই শাখার শেষ রাজা কানহ্‌রকে পরাস্ত করে জালোর দখল করেন।

৫।। মধ্যাঞ্চল : মালব, জেজাকভুক্তি, ডাহল

মধ্যাঞ্চলের রাজনৈতিক শক্তিগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য মালবের পরমারগণ। মুঞ্জ ও সিন্ধুরাজের অধীনে পরমারদের শক্তি সঞ্চয়ের কথা আমরা পূর্ববর্তী খণ্ডে আলোচনা করেছি। সিন্ধুরাজের পুত্র ভোজ (১০০০-১০৫৫) ১০০৮ খ্রীষ্টাব্দে গজনীর মাহ্‌মুদের বিরুদ্ধে শাহি-আনন্দপালকে সাহায্য করেছিলেন। ১০১৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আনন্দপালের পুত্র ত্রিলোচন পালকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, এবং ১০৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কীদের বিরুদ্ধে একটি শক্তিজোট গঠন করে সাতমাস কাল লাহোর দুর্গ অবরুদ্ধ করে রেখেছিলেন। এর পর প্রায় দুশো বছর মালব স্বাধীন ছিল। ১২৩৩ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ মালবে তুর্কী আক্রমণ ঘটে। ইলতুৎমিশ ভিলসা জয় করেন ও উজ্জয়িনী লুণ্ঠন করেন, কিন্তু এই বিজয় ক্ষণস্থায়ী হয়েছিল। ১২৫০ খ্রীষ্টাব্দে গিয়াসুদ্দীন বলবন মালবে হানা দেন, অপরাপর হিন্দুশক্তির আক্রমণও এর পর বেশ কিছুকাল ধরে মালবকে সহ্য করতে হয়। রাজা দ্বিতীয় ভোজের সময় ১২৮৩-র কিছু পর জালালুদ্দীন খলজী মালব লুণ্ঠন করেন। পরবর্তী রাজা মহ্‌লকদেবের সময় ১৩০৫ খ্রীষ্টাব্দে আলাউদ্দীন খলজী মালব অধিকার করেন।

যে জেজাকভুক্তি অঞ্চলে, যার উত্তর সীমা ছিল আগ্রা থেকে শুরু করে যমুনা নদী বরাবর এলাহাবাদ পর্যন্ত এবং দক্ষিণ সীমা ছিল জব্বলপুর পর্যন্ত, চন্দেল্লগণ রাজত্ব করতেন সেখানে ১১৬৩ থেকে ১২০২ পর্যন্ত রাজত্ব করেন মদনবর্মার পৌত্র পরমর্দী। ১২০২ খ্রীষ্টাব্দে কুতবুদ্দীন কালঞ্জর আক্রমণ করলে পরমর্দী অপমানজনক শর্তে সন্ধি করেন, যাতে ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁর মন্ত্রী অজয়দেব তাঁকে হত্যা করেন এবং যুদ্ধ চালিয়ে যান। অবশ্য তিনি জয়লাভ করতে পারেন নি। কুতবুদ্দীন কালঞ্জর লুঠ করেন এবং মহোবা অধিকার করেন। কিন্তু পরমর্দীর পুত্র ত্রৈলোক্যবর্মা (১২০৫-৪১) তুর্কী

বাহিনীকে ককড়াদহের যুদ্ধে পরাজিত করেন এবং হৃত সমস্ত এলাকাই উদ্ধার করেন। তাঁর পুত্র বীরবর্মা, যাঁর জানা তারিখ ১২৫৪, চন্দেল্ল রাজ্যের স্বাভাবিক সীমা অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছিলেন। পরবর্তী রাজারা ছিলেন ভোজবর্মা ও হম্মীর বর্মা, যাঁর শেষ জানা তারিখ ১৩০৮। ১৩০৯ খ্রীষ্টাব্দে আলাউদ্দীন খলজী হম্মীর বর্মা বা তাঁর উত্তরাধিকারীর কাছ থেকে দামোহ্‌ জেলাটি দখল করেন। পরবর্তী চন্দেল্লরাজ ছিলেন বীরবর্মা যাঁর উত্তরাধিকারীদের সম্পর্কে কিছু জানা যায় না।

ডাহল বা জব্বলপুর ও তৎসলংগ্ন অঞ্চলসমূহে দ্বিতীয় কোক্কল ও তৎপুত্র গাঙ্গেয়দেবের আমলে কলচুরিদের (ত্রিপুরী শাখা) বিশেষ প্রতিষ্ঠা ঘটে। ১০৩৪ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা আহ্‌মদ নিয়াল্‌তিগিন কাশী লুণ্ঠন করলে গাঙ্গেয়দেব তাঁর প্রতিশোধ নেন তুর্কী অধিকৃত কাংরা উপত্যকায় আক্রমণ চালিয়ে। তাঁর পুত্র লক্ষ্মীকর্ণ ১০৩৭ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পরে পশ্চিমদিকে অভিযান করেন এবং কির বা কাংরা অঞ্চলে তুর্কীদের পরাস্ত করেন। তাঁর উত্তরাধিকারী হন যথাক্রমে যশঃকর্ণ, গয়াকর্ণ, নরসিংহ ও জয়সিংহ। শেষোক্তজন খুসরব মালিকের নেতৃত্বাধীন একটি তুর্কী আক্রমণ প্রতিহত করেন, তাঁর পুত্র বিজয় সিংহের লেখমালা থেকে জানা যায় তিনি ১২১১ পর্যন্ত বাঘেলখণ্ড ও ডাহলমণ্ডলের উপর অধিকার বজায় রেখেছিলেন। তাঁর পুত্রের নাম অজয় সিংহ, যাঁর সম্পর্কে খুব কম কথাই আমাদের জানা আছে।

৬ ॥ পূর্ব ভারত : বঙ্গদেশ, মিথিলা, কামরূপ

সেনবংশীয় রাজা লক্ষ্মণসেনের আমলে বখ্‌তিয়ার খলজী কর্তৃক বাংলাদেশের নদীয়ায় তুর্কী অধিকারের কাহিনী প্রথম খণ্ডে বলা হয়েছে। বখ্‌তিয়ার নদীয়া ও উত্তর বঙ্গ ১২০২ নাগাদ জয় করেছিলেন, কিন্তু পূর্ববঙ্গে লক্ষ্মণসেন তার পরেও রাজত্ব করেছেন। ১২০৫ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্মণ সেনের উত্তরাধিকারী হন বিশ্বরূপ সেন যিনি তুর্কীদের একটি যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন সম্ভবত লক্ষ্মণাবতীর সুলতান গিয়াসুদ্দীন আইওয়াজ। বিশ্বরূপ ১৪ বছর রাজত্ব করেছিলেন এবং তারপর সিংহাসনে আসেন তাঁর ভাই কেশব সেন। তিনিও একটি তুর্কী আক্রমণ প্রতিহত করেছিলেন বলে তাঁর লেখমালায় দাবি করেছেন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন মালিক সৈফুদ্দীন। মিনহাজ-উদ্দীন লিখেছেন যে সেন রাজারা পূর্ববঙ্গে ১২৪৫ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন।

সেন রাজাদের পতনের যুগে সমতট ও বঙ্গে দেববংশীয় কয়েকজন রাজা রাজত্ব

করেছিলেন যাঁদের মধ্যে জনৈক দামোদরের তারিখ পাওয়া গেছে ১২৩৪ ও ১২৪৩ খ্রীষ্টাব্দ। এঁর পুত্র ছিলেন দনুজ মাধব যিনি সেনদের অবশিষ্ট রাজ্য অধিকার করেছিলেন। তারিখ-ই-মুবারক শাহী গ্রন্থে সুলতান বলবনের সঙ্গে এই দনুজ মাধব বা দনুজ রায়ের সাক্ষাৎকারের কথা আছে। তুঘ্রিল খানের বিরুদ্ধে এই দনুজ বলবনকে সাহায্য করেছিলেন ১২৮৩ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ। এই বংশের পরবর্তী সংবাদ জানা যায় না।

মিথিলায়, অর্থাৎ তীরভুক্তি বা তিরহুত অঞ্চলে, ১০৯৭ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ কর্ণাটক বংশীয় জনৈক নান্যদেব ক্ষমতায় এসেছিলেন। পরবর্তী রাজারা ছিলেন গঙ্গদেব, নৃসিংহ, রাম সিংহ, শক্তি সিংহ, ভূপাল সিংহ, ও হরি সিংহ। হরিসিংহ ১৩২৪ খ্রীষ্টাব্দে সম্ভবত গিয়াসুদ্দীন বলবনের একটি আক্রমণ প্রতিহত করেছিলেন।

কামরূপে দ্বাদশ শতকে আমরা একটি রাজবংশের পরিচয় পাই যাঁদের পরপর চারজন রাজত্ব করেছিলেন—ভাস্কর, রাল্লারিদেব, উদয়কর্ণ ও বল্লভদেব। ১২০৫ সাল নাগাদ বখ্‌তিয়ার খলজী কামরূপে অভিযান করতে গিয়ে প্রচণ্ড ক্ষতির সম্মুখীন হন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী পূর্বোক্ত বল্লভদের অথবা তাঁর উত্তরাধিকারী কে ছিলেন ঠিক বলা যায় না। ১২৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ইখতিয়ারউদ্দীন উজবক তুঘ্রিল খান কামরূপে পরাজিত ও নিহত হন। ১৩৩৭ খ্রীষ্টাব্দে মাহমুদ শাহের কামরূপ আক্রমণও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

৭ ॥ দক্ষিণ ভারত

ত্রয়োদশ শতকের শেষ দশকের পূর্ব পর্যন্ত তুর্কী শক্তি দক্ষিণ ভারতে কার্যত প্রবেশ করতে পারেনি। দক্ষিণ ভারতের মধ্য ও পশ্চিমাঞ্চলে ১০০০ থেকে ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কল্যাণের পরবর্তী-চালুক্যগণ, কল্যাণের কলচুরিগণ কোঙ্কণের শিলাহারগণ ও দেবগিরির যাদবগণ রাজত্ব করেছিলেন। এই সকল শক্তিগুলির মধ্যে দেবগিরির যাদবগণই একমাত্র তুর্কী আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছিলেন। ১২৯৪ খ্রীষ্টাব্দে আলাউদ্দীন খলজী দেবগিরি আক্রমণ করে রাজা রামচন্দ্রকে পরাজিত করেন। তাঁর পুত্র শংকরদেবও আলাউদ্দীনের হাতে পরাজিত হন। ১৩০৭ খ্রীষ্টাব্দে আলাউদ্দীনের সেনাপতি মালিক কাফুর দেবগিরি আক্রমণ করে রামচন্দ্রকে বন্দী করেন। দিল্লীতে ছয় মাস বন্দী থাকার পর আলাউদ্দীন তাঁকে মুক্ত করে দেন।এবং তিনি দেবগিরিতে আবার আলাউদ্দীনের সামন্ত হিসাবে ফিরে আসেন। ১৩০৮

খ্রীষ্টাব্দে যখন মালিক কাফুর তেলেঙ্গনা এবং ১৩১১ খ্রীষ্টাব্দে দোরসমুদ্র আক্রমণ করেন রামচন্দ্র তাঁকে সাহায্য করেন। ১৩১১ খ্রীষ্টাব্দে রামচন্দ্রের পুত্র শংকরদেব রাজা হয়ে দিল্লীর সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হন, এবং আলাউদ্দীনের নির্দেশে কাফুর তাঁকে পরাজিত ও নিহত করে দেবগিরি দখল করে নেন। আলাউদ্দীনের মৃত্যুর পর দিল্লীতে গোলযোগের সুযোগে শংকর দেবের জামাতা হরপালদেব স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। কিন্তু ১৩১৭ খ্রীষ্টাব্দে আলাউদ্দীনের উত্তরাধিকারী মুবারক পুনরায় দেবগিরি দখল করে নেন।

দক্ষিণ ভারতের পূর্বাঞ্চলে রাজত্ব করতেন বরঙ্গলের কাকতীয়গণ, অন্ধ্র অঞ্চলের পূর্বী চালুক্যগণ, আর একটু উত্তরে কলিঙ্গ অঞ্চলে পূর্বী গঙ্গগণ ও সোমবংশীগণ। কাকতীয় প্রতাপরুদ্রের আমলে ১৩০৯-১০ সালে আলাউদ্দীনের সেনাপতি মালিক কাফুর বরঙ্গল আক্রমণ করে তাঁকে পরাজিত করেন এবং ১৩২২ খ্রীষ্টাব্দে গিয়াসুদ্দীন বলবনের পুত্র উলুঘ খানও তাঁকে পরাস্ত করেন, কিন্তু তার পরেও তিনি স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেছিলেন। কলিঙ্গের পূর্বী গঙ্গ তৃতীয় অনঙ্গভীমের আমলে (১২১৬-৩৮) বাংলার তুর্কী শাসনকর্তা গিয়াসুদ্দীন আইওয়াজ উড়িষ্যা আক্রমণ করেন, কিন্তু অনঙ্গভীম তা ব্যর্থ করে দেন। অনঙ্গভীমের উত্তরাধিকারী প্রথম নরসিংহ ছিলেন সেই মুষ্টিমেয় ভারতীয় রাজাদের একজন যাঁরা তুর্কীদের সঙ্গে আক্রমণাত্মক যুদ্ধ করেছিলেন। ১২৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তুঘ্রিল খানকে পরাজিত করে রাঢ় অঞ্চলকে তুর্কীপ্রভাব থেকে মুক্ত করেন! ১২৫৩ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশের পরবর্তী তুর্কী শাসক উজবক রাঢ় উদ্ধারের চেষ্টা করেন, কিন্তু এবারেও তিনি নরসিংহের হাতে শোচনীয় ভাবে পরাজিত হন। অবশ্য ১২৫৫ সালে উজবক রাঢ় উদ্ধার করতে পেরেছিলেন।

সুদূর দক্ষিণে চোল রাজারা ত্রয়োদশ শতকের মধ্য পর্যন্ত রাজত্ব করে শেষ পর্যন্ত পাণ্ড্যদের অধীন হয়ে যান। সুদূরতম দক্ষিণে পাণ্ড্য রাজারা স্বাধীন ভাবে চতুর্দশ শতক পর্যন্ত রাজত্ব করেন। শেষ শক্তিমান পাণ্ড্যরাজ কুলশেখরের (১২৬৮-১৩১০) দুই পুত্রের মধ্যে সুন্দর পাণ্ড্য ছিলেন বৈধ পুত্র এবং বীর পাণ্ড্য অবৈধ। কুলশেখর বীর পাণ্ড্যকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করলে সুন্দর পাণ্ড্য ১৩১০ খ্রীষ্টাব্দে কুলশেখরকে হত্যা করে সিংহাসন দখল করেন। কিন্তু বীর পাণ্ড্য সুন্দর পাণ্ড্যকে উৎখাত করলে শেষোক্তজন আলাউদ্দীন খলজীর সেনাপতি মালিক কাফুরের সাহায্য চান। কাফুর দক্ষিণে যুদ্ধ করলেও এ-ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেছিলেন কিনা, করলেও তা কি ধরনের ছিল, এবং তা আদৌ কোন ফল প্রসব করেছিল কিনা, জানা যায়

না। কিন্তু এর পরেও দীর্ঘকাল পাণ্ড্যরাজ্য স্বাধীনভাবে টিঁকে ছিল। দোরসমুদ্রের হোয়সল বংশীয় রাজারাও চতুর্দশ শতক পর্যন্ত স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেছিলেন। রাজা তৃতীয় বল্লাল ১৩১০ খ্রীষ্টাব্দে আলাউদ্দীন খলজীর সেনাপতি মালিক কাফুরের নিকট পরাজিত হন ও দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য হন। পরবর্তীকালে খলজী ও তুঘলকদের দুর্বলতার সুযোগে তিনি স্থানীয় তুর্কীশক্তিগুলির বিরুদ্ধে দীর্ঘকালীন সংগ্রাম চালিয়ে যান, এবং ত্রিচিনোপোলীতে এক যুদ্ধ চলাকালীন জয় লাভের মুহূর্তে তিনি নিহত হন। বল্লালের এই প্রতিরোধ পরবর্তী বিজয়নগর রাজ্য গঠনের পক্ষে বিশেষ অনুকূল হয়েছিল।

৮॥ মুহম্মদ ঘুরী

তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধের সাফল্যের দ্বারা মুহম্মদ ঘুরী ভারতবর্ষে তুর্কী অধিকারের পথ প্রশস্ত করেছিলেন, যে ঘটনার কথা প্রথম খণ্ডে উল্লিখিত হয়েছে। এই ঘুর বংশীয়গণ বাস করতেন আফগানিস্তানের গজনী ও হিরাটের মধ্যবর্তী অঞ্চলে। ১১৬৩ খ্রীষ্টাব্দে গজনবী সুলতানদের পতনের পর এই ঘুর-বংশীয় গিয়াসুদ্দীন মুহম্মদ আফগানিস্তানের অনেকটা অংশ জুড়ে একটি সুবিস্তৃত রাজ্য স্থাপন করেন। তিনি গজনী থেকে গুজ্‌-তুর্কদের বিতাড়িত করেন এবং নিজ ভ্রাতা শিহাবুদ্দীন মুহম্মদ ঘুরীকে ১১৭৩ খৃষ্টাব্দে ওই প্রদেশের শাসক নিযুক্ত করেন। মুহম্মদ ঘুরী নামে অধিকতর পরিচিত এই শিহাবুদ্দীনের অপর নাম ছিল মুহজুদ্দীন মুহম্মদ বিন সাম।

মুহম্মদ ঘুরী ডেরা-ইসমাইল-খানের পশ্চিমস্থ গোমাল-পাশ দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন এবং ১১৭৫ খ্রীষ্টাব্দে কারামিতদের নিকট থেকে মুলতান ও উচ অধিকার করেন। অতঃপর তিনি দক্ষিণের মরুভূমি অতিক্রম করে গুজরাত অভিমুখে রওনা হন, রণনীতির দিক্‌ থেকে যা ছিল একটি ভ্রান্ত পদক্ষেপ। ১১৭৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গুজরাতের চৌলুক্যবংশীয় রাজা দ্বিতীয় মূলরাজের হাতে পরাজিত ও প্রায় সর্বস্বান্ত হন। কোনক্রমে তিনি পলায়ন করতে সক্ষম হন।

প্রথমবারের এই ব্যর্থতার পর তাঁর সামনে আবার সুযোগ আসে। জম্মুর শাসক চক্রদেব ভারতে তখনও-পর্যন্ত টিঁকে থাকা গজনবী সুলতান খুসরব মালিকের বিরুদ্ধে তাঁর সাহায্যের প্রত্যাশী হন, কেননা খুসরব খোক্কর টাইবদের জম্মুর শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে সাহায্য দিচ্ছিলেন। এই সুযোগে মুহম্মদ ঘুরী প্রথমেই ১১৭৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে পেশোয়ার দখল করেন। শিয়ালকোট অধিকৃত হয় ১১৮৫ খ্রীষ্টাব্দে

এবং পর বৎসর ১১৮৬ খ্রীষ্টাব্দে একটি বিশ্বাসঘাতকতার সাহায্যে খুসরব মালিককে হটিয়ে লাহোর দখল করেন।

১১৯০-৯১ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম তরইনের যুদ্ধে মুহম্মদ ঘুরীর আবার ভাগ্যবিপর্যয় হয়, কিন্তু চাহমান-রাজা তৃতীয় পৃথ্বীরাজের নির্বুদ্ধিতায় তিনি রক্ষা পান। ১১৯২ খ্রীষ্টাব্দে তরইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে তিনি পৃথ্বীরাজকে পরাজিত ও নিহত করেন এবং দিল্লী অধিকার করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য তিনি দিল্লী ও আজমীরের স্থানীয় হিন্দু শাসকদের তাঁর সামন্তরাজা হিসাবে পূর্বের ন্যায় কাজ চালাতে অনুমতি দেন। এছাড়া তিনি হান্‌সী, কুহ্‌রাম, সুরসুতী ও সির্‌হিন্দে চারটি সামরিক ঘাটি প্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর তিনি তাঁর প্রিয় সেনাপতি মালিক কুতবুদ্দীন অইবকের উপর ভারতীয় বিষয়াবলীর দায়িত্ব দিয়ে স্বস্থানে প্রস্থান করেন।

কুতবুদ্দীনের উপর মুহম্মদ ঘুরী ভারত বিষয়ক সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণেরই অনুমতি দিয়েছিলেন। একটি স্থায়ী শক্তিকেন্দ্রের প্রয়োজনে কুতবুদ্দীন ১১৯৩ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর চাহমান শাসককে অপসারিত করেন। ইতিপূর্বেই তিনি রণথম্ভোর দুর্গ অধিকার করে সেখানে একটি শক্তিশালী ঘাটি তৈরী করেছিলেন। কিন্তু চাহমানগণ পরলোকগত পৃথ্বীরাজের ভাই হরিরাজের নেতৃত্বে আজমীর ও রণথম্ভোর পুনরধিকার করে। কুতবুদ্দীন হরিরাজকে শায়েস্তা করার জন্য অগ্রসর হলে অপসারিত দিল্লীর শাসক বিদ্রোহ ঘোষণা করেন, ফলে কুতবুদ্দীনকে বাধ্য হয়ে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করতে হয়। ইতিমধ্যে মুহম্মক ঘুরী গজনী থেকে কুতবুদ্দীনকে ডেকে পাঠান, কেননা তিনি সেখানে খ্‌ওয়ারিজমী তুর্কীদের হাতে বিব্রত হচ্ছিলেন। ফলে কুতবুদ্দীন ছয় মাসেরও বেশি সময় ভারতে অনুপস্থিত থাকেন। আশ্চর্যের বিষয় এখান থেকে তুর্কীদের অপসারণের এমন সুবর্ণ সুযোগের কোন ব্যবহারই ভারতীয় শক্তিগুলি করেনি।

ওদিকে মুহম্মদ ঘুরী আফগানিস্তানের ব্যাপার সামাল দিয়ে পুনরায় ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। ১১৯৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে তিনি পঞ্চাশ হাজার অশ্বারোহী সেনা নিয়ে গাহড়বাল রাজ জয়চন্দ্রের সম্মুখীন হন যমুনার তীরে এটাওয়া এবং কনৌজের মধ্যবর্তী চন্দাওয়ার নামক স্থানের নিকটে। যুদ্ধে জয়চন্দ্র পরাজিত হন এবং মুহম্মদ ঘুরী বারাণসী পর্যন্ত লুণ্ঠন চালান। পরে অবশ্য গাহড়বালরা তাদের হৃতরাজ্য কিছুটা পুনরুদ্ধার করতে পেরেছিল। যাই হোক লুণ্ঠিত বিপুল ধনসম্ভার নিয়ে মুহম্মদ ঘুরী গজনীতে ফিরে যান, ভারতীয় বিষয়াবলীর ভার কুতবুদ্দীনের উপর ন্যস্ত করে।

ইতিমধ্যে পূর্বোক্ত চাহমান বংশীয় হরিরাজ আজমীর দখল করেছেন এবং তাঁর সেনাপতি ঝটরাইকে দিল্লী পুনর্দখলের জন্য পাঠিয়েছেন। কুতবুদ্দীন পথেই ঝটরাইকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন এবং অতিক্রুত আজমীর দখল করেন। পরাজিত হরিরাজ আত্মহত্যা করেন। ১১৯৪-এর কিছু পরে আজমীর প্রত্যক্ষভাবেই কুতবুদ্দীনের শাসনাধিকারে আসে।

১১৯৫ খ্রীষ্টাব্দে মুহম্মদ ঘুরী আরও একবার ভারত অভিযান করেন এবং বয়ান ও গোয়ালিয়রের কিয়দংশ অধিকার করেন। এরপর ভারতীয় রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে তিনি আর প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত ছিলেন না। তাঁর আরব্ধ কাজ সম্পন্ন করেছিলেন কুতবুদ্দীন।

তুর্কী শক্তির কেন্দ্রীকরণ: ১১৯৫-৯৬ খ্রীষ্টাব্দে আজমীরের মেহ্‌র উপজাতি চৌলুক্যদের সহায়তায় তুর্কীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এই বিদ্রোহে কুতবুদ্দীন একেবারে কোণঠাসা হয়ে পড়েন, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে গজনী থেকে আগত সৈন্য-বাহিনী ও রসদের সাহায্যে তিনি পরিত্রাণ লাভ করেন। পরবৎসর কুতবুদ্দীন গুজরাতের অনহিল্লপাঠক বা অনহিলবারায় অভিযান করেন। রাজা দ্বিতীয় ভীম দূরবর্তী অঞ্চলে পশ্চাদাপসরণ করেন কিন্তু তাঁর সামন্ত রাই করণ আবু পাহাড় অঞ্চলের পরমার শাসক ধারাবর্ষের সহায়তায় তাঁকে বাধা দেন। এই যুদ্ধে কুতবুদ্দীন অত্যাশ্চর্য রণকৌশলের পরিচয় দেন এবং অনহিল্লপাঠক লুণ্ঠন করেন। গুজরাত-পক্ষীয় প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোক নিহত হয় এবং কুড়ি হাজার বন্দী হয়। কুতবুদ্দীন দিল্লী ফিরে গেলে ভীম তাঁর গোপন স্থান থেকে বেরিয়ে আসেন এবং ধীরে ধীরে তুর্কীদের গুজরাত থেকে বিতাড়িত করেন। তথাপি এতে গুজরাতের যে ক্ষতি হয়েছিল সহজে তার পূরণ হয়নি।

১১৯৭-৯৮ এ কাতেহ্‌র ও বদায়ুন কুতবুদ্দীনের অধিকারে আসে। অতঃপর তিনি জেজাকভুক্তির (বুন্দেলখণ্ড) চন্দেল্লদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। ১২০২ খ্রীষ্টাব্দে চন্দেল্লরাজ পরমর্দী কালঞ্জর দুর্গে কুতবুদ্দীন কর্তৃক অবরুদ্ধ হন, এবং সন্ধির ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হবার আগেই তিনি মারা যান। তাঁর সেনাপতি অজয়দেব নূতন ভাবে পুনরায় তুর্কীবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কালঞ্জর, মহোবা ও খজুরাহো তুর্কীদের হস্তগত হয়।

পূর্ব ভারতে অভিযান: মুহম্মদ ঘুরী বা কুতবুদ্দীন কেউই পূর্বাঞ্চল নিয়ে মাথা ঘামাননি। ইখতিয়ার-উদ্দীন মুহম্মদ বখ্‌তিয়ার খলজী নামক একজন কুতবুদ্দীনের

অধীনস্থ ভাগ্যান্বেষী যোদ্ধা পূর্বাঞ্চলের দ্বার তুর্কীদের নিকট উন্মুক্ত করে দেন। তিনি একটি ছোট লুন্ঠনকারীর দল গঠন করেন এবং মগধ অঞ্চলে লুঠপাট চালিয়ে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করেন যা দিয়ে তিনি একটি বড় বাহিনী গঠন করেন। আশ্চর্যের বিষয়, তিনি কোথাও কোন বাধা পাননি। কুতবুদ্দীনের অনুমতি নিয়ে ১২০০ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পরে তিনি ওদন্তপুরী মহাবিহার (নালন্দার নিকটবর্তী বিহার শরীফ) ধ্বংস করেন। তারপর তিনি আরও পূর্বদিকে অভিযান করার অনুমতি চান। অনুমতি মেলে এই শর্তে যে তাঁকে নিজ সম্পদের উপরই নির্ভর করে অভিযান করতে হবে, দিল্লী কোন দায়িত্ব নেবে না। তাতেই রাজি হয়ে তিনি প্রথম নদীয়া জয় করেন ১২০২ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ। এই যুদ্ধের বিষয় পূর্ববর্তী খণ্ডে বিস্তারিত ভাবে বলা হয়েছে। নদীয়া লুন্ঠনের পর বখ্‌তিয়ার বর্তমান গৌড়ের নিকট লখ্‌নাবতী নামক স্থানে ঘাঁটি নির্মাণ করেন। এখান থেকে তিনি তিব্বত বিজয়ের পরিকল্পনা করেন। কিন্তু তাঁর তিব্বত অভিযান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, এবং কোনক্রমে প্রাণরক্ষা করে তিনি দেবকোট নামক স্থানে আশ্রয় নেন। এখানে ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে আলি মর্দান নামক তাঁর এক অনুচর তাঁকে অসুস্থাবস্থায় হত্যা করে।

ঘুরীদের অবসান : ১২০২ খ্রীষ্টাব্দে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গিয়াসুদ্দীনের মৃত্যু হলে মুহম্মদ ঘুরী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। ১২০৫-এ আন্দখুই নামক স্থানে তিনি খওয়ারিজমী তুর্কীদের হাতে শোচনীভাবে পরাজিত হন। এদিকে উত্তর-পশ্চিম ভারতের খোকর উপজাতিরা বিদ্রোহ করে মুলতানের শাসককে পরাস্ত করে। তারা লাহোর ও গজনীর রাস্তা বন্ধ করে দেয়। বাধ্য হয়ে ১২০৫-এর ২০ শে অক্টোবর মুহম্মদ ঘুরী গজনী পরিত্যাগ করেন, এবং মাসখানেকের মধ্যে নির্মমভাবে খোকর বিদ্রোহ দমন করেন। লাহোরে তিনি পৌছান ১২০৬-এর ২৫ শে ফেব্রুয়ারী। সেখানকার ব্যাপার মিটিয়ে গজনীতে প্রত্যাবর্তনের পথে তিনি সিন্ধুতীরে দাম্যক নামক স্থানে ১৫-ই মার্চ তারিখে অজ্ঞাত পরিচয় আততায়ীর ছুরিকাঘাতে নিহত হন। তাঁর মৃত্যুর পর ঘুর সাম্রাজ্য খ্‌ওয়ারিজমীদের হাতে চলে যায়। তাজুদ্দীন ইলদিজ নামক মুহম্মদ ঘুরীর একজন ক্রীতদাস ও সেনাপতি ১২১৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত গজনীতে নিজ অধিকার বজায় রেখেছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি খ্‌ওয়ারিজম-শাহ কর্তৃক বিতাড়িত হন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দিল্লী সুলতানীর পত্তন

১॥ কুতবুদ্দীন অইবক (১২০৬-১২১০)

মুহম্মদ ঘুরীর মৃত্যুর পর আফগানিস্তান ও মধ্য এশিয়া থেকে ঘুর-বংশ কার্যত অবলুপ্ত হয় এবং সেখানে খ্‌ওয়ারিজমী তুর্কীদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে ভারতবর্ষে তিনি যেটুকু রাজত্ব স্থাপন করতে পেরেছিলেন তা বজায় থাকে। কার্যত তাঁর উত্তরাধিকারী দাঁড়ান তিনজন, যাঁরা তাঁর ক্রীতদাস ছিলেন, ও পরে বিশ্বস্ত অনুচর ও সেনাপতি হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। এঁরা ছিলেন তাজুদ্দীন ইলদিজ, নাসিরুদ্দীন কুবাচা ও কুতবুদ্দীন অইবক। মুহম্মদ ঘুরীর মৃত্যুর পর ইলদিজ গজনীর কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। কুবাচা সিন্ধু ও তার সন্নিহিত অঞ্চলে ঘাঁটি তৈরী করেন। ঘুরী-অধিকৃত ভারতের অপরাপর অঞ্চল কুতবুদ্দীনের অধীনে থাকে।

আফগানিস্তানে খ্‌ওয়ারিজমীদের প্রাধান্য তাঁদের তিনজনকেই উপলব্ধি করিয়েছিল যে ওদিককার সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক বরাবরের জন্যই চুকিয়ে দিতে হবে। কুতবুদ্দীন এই উদ্দেশ্যে তাঁর একটি নিজস্ব এলাকা গড়ে তোলার কাজে মনোনিবেশ করেন এবং ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে লাহোরে তিনি নিজেকে অধিকৃত ভারতীয় অঞ্চলসমূহের সর্বেসর্বা বলে ঘোষণা করেন। ইলদিজ ও কুবাচা তাঁর স্বাভাবিক প্রতিদ্বন্দ্বী, কারণ তাঁরা মুহম্মদ ঘুরীর মৃত্যুর পর পায়ের তলায় শক্ত মাটি খুঁজছিলেন, যা জোগাতে পারত একমাত্র ভারতবর্ষ। এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর উপর কড়া নজর রাখার জন্যই কুতবুদ্দীন অধিকাংশ সময় লাহোরে বাস করতেন। এদিকে ১২০৮ খ্রীষ্টাব্দে খ্‌ওয়ারিজমীদের ভয়ে ইলদিজ পাঞ্জাবে চলে আসেন। কুতবুদ্দীন তাঁকে তদ্দণ্ডে বিতাড়িত করেন এবং শত্রুর শেষ রাখতে নেই এই আপ্তবাক্য স্মরণ করে তাঁর পিছনে গজনী অবধি ধাওয়া করেন। কিন্তু গজনীতে ইলদিজের তখনও জনপ্রিয়তা ছিল, এবং তাঁকে সেখানে কাবু করা সহজ হবেনা বুঝতে পেরে বুদ্ধিমানের মত তড়িঘড়ি লাহোরে ফিরে এসেছিলেন। তথাপি কুতবুদ্দীন সুনির্দিষ্ট সীমানাসহ একটি রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, তবে তাকে পোক্ত করার আগেই ১২১০ খ্রীষ্টাব্দে আকস্মিকভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন।

২॥ ইলতুৎমিশ (১২১০-১২৩৬)

কুতবুদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আরম লাহোরে নিজেকে কুতবুদ্দীনের উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণা করেন। এদিকে দিল্লীতে একটি অধিকতর শক্তিশালী উপদল তাঁর জামাতা ইলতুৎমিশের পক্ষপাতী ছিল। শেষ পর্যন্ত ক্ষমতার দ্বন্দ্বে আরম নিহত হলে ইলতুৎমিশ পূর্ণ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন।

ইলতুৎমিশের সামনে সমস্যা ছিল প্রচুর। নাসিরুদ্দীন কুবাচা যিনি কুতবুদ্দীনের আমলে অনেকটা নিষ্ক্রিয় ছিলেন এইবার সুযোগ বুঝে মুলতান পর্যন্ত অগ্রসর হন এবং লাহোর, ভাতিন্দা এমন কি সুরস্বতীতেও প্রাধান্য স্থাপন করেন। এদিকে হিন্দু সামন্তরাজারাও স্বাধীনতা ঘোষণা করতে থাকেন। প্রতীহাররা, পরবর্তীকালে যারা পরিহার নামে পরিচিত হয়েছিল, গোয়ালিয়র পুনরধিকার করে। বঙ্গদেশের লখ্‌নাওতিতে বখ্‌তিয়ার খল্‌জীর উত্তরাধিকারী আলি মর্দান স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তাজুদ্দীন ইলদিজও খ্‌ওয়ারিজমীদের জ্বালায় অস্থির হয়ে ভারতবর্ষে ভাগ্য অন্বেষণের জন্য বদ্ধ পরিকর হয়েছিলেন, যা ইলতুৎমিশের নিজের নিরাপত্তার পক্ষে মোটেই স্বস্তির বিষয় ছিল না। খোদ দিল্লীতেও তাঁর বিরোধীর অভাব ছিলনা। আরমের সমর্থক জানদাররা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল যা দমন করতে তাঁকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল।

সব দিক বুঝেই ইলতুৎমিশ ধীরে এবং সাবধানে চলার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। ইলদিজ ইত্যবসরে কুবাচাকে লাহোর থেকে হটিয়ে পাঞ্জাবের অনেকটা অংশ দখল করেন। তা লক্ষ্য করেও ইলতুৎমিশ তৎক্ষণাৎ কিছু না করে শতদ্রুর পূর্ব দিকে তাঁর শক্তিকে সংহত করে নেন। অবশেষে ১২১৫ খ্রীষ্টাব্দে ইলদিজ যখন খ্‌ওয়ারিজমীদের ধাক্কায় গজনী থেকে পালিয়ে লাহোরে এসে পাকাপাকি আশ্রয় নেন এবং গজনী পুনরুদ্ধারে দিল্লীর সাহায্যের প্রত্যাশী হন, ইলতুৎমিশ সোজা তাঁকেই আক্রমণ করে বসেন এবং তরাইনের এক যুদ্ধে তাঁকে বন্দী করেন। তিনি তদ্দণ্ডেই লাহোর অধিকার করতে পারতেন, কিন্তু তা না করে কুবাচাকে লাহোর পুনরাধিকার করার সুযোগ দেন, এবং পশ্চিম সীমান্তে নিজের শক্তি বৃদ্ধি করেন। দু'বছর পর ১২১৭ খ্রীষ্টাব্দে সুযোগ বুঝে তিনি লাহোর অভিযান করেন। অপ্রস্তুত কুবাচা তদ্দণ্ডে উচে পলায়ন করেন, এবং বিনা বাধাতেই লাহোর অধিকৃত হয়।

কিন্তু এই সাফল্যের পরই তাঁকে একটি ভয়ঙ্কর বিপদের মুখে পড়তে হয়।

চেঙ্গিজ খানের নেতৃত্বাধীন মঙ্গোলবাহিনী ঝড়ের মত মধ্য এশিয়া ও আফগানিস্থান প্লাবিত করে ভারতের সীমান্তে উপস্থিত হয়। এই অভিযানের ধাক্কায় খওয়ারিজমী সাম্রাজ্যের নাভিশ্বাস ওঠে। খিবার যুবরাজ জালালুদ্দীন মঙ্গবরনী খুরাসান ও আফগানিস্তান থেকে তাড়া খেয়ে সিন্ধু অতিক্রম করে ভারতে হাজির হন। তাঁর অনুসন্ধানে চেঙ্গিজ ইলতুৎমিশের রাজ্যের সীমান্তে সৈন্য মোতায়েন করেন যা ইলতুৎমিশের পক্ষে মোটেই সুখকর হয়নি। ১২২২ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পরে চেঙ্গিজের মৃত্যু পর্যন্ত ইলতুৎমিশের মঙ্গোল ভীতি দূর হয়নি। মঙ্গবরনী তাঁর কাছে সাহায্য চাইলে তিনি তা দিতে অস্বীকার করেন, এবং তাঁর এলাকার মধ্যেও মঙ্গোলবাহিনীর সশাহলে বাধা দিয়ে তাদের বিরাগভাজন হয়ে নিজ রাজ্যের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে তাঁর আপত্তি ছিল।

ইলতুৎমিশের কাছ থেকে সাহায্য না পেয়ে মঙ্গবরণী সল্টরেঞ্জ অঞ্চলের জনৈক হিন্দুরাজার সাহায্যে মঙ্গোল আক্রমণের ফলে পলাতক উপজাতিদের নিয়ে একটি সৈন্যদল গঠন করেন এবং তাঁর হাঙ্গামার ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায় নাসিরুদ্দীন কুবাচার এলাকা। সিন্ধুনদীর দক্ষিণাঞ্চল অতিক্রমের পূর্বে মঙ্গবরণী উচ নগরে আগুন লাগান, সেওয়ান দখল করেন এবং দেবলের শাসককে পলায়ন করতে বাধ্য করেন। এই সব অঞ্চলে নিজের ঘাঁটি রাখার জন্য তিনি দুজন অনুচরকে রেখে যান যাঁদের নাম হাসান কারলুখ এবং উজবেক পাই। এরা দুজনেই নাসিরুদ্দীন কুবাচার গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়ায়। ওদিকে মঙ্গোলরা মুলতান অবরোধ করলে বিপুল সংখ্যক খলজী উপজাতি সেখানে আশ্রয় নেয়।

কুবাচার এই দুঃসময়ের পুরো সুযোগ নেন ইলতুৎমিশ। মঙ্গবরণী চলে যাবার অনতিকাল পরেই তিনি লাহোর দখল করেন, এবং তারপর মুলতান ও উচ থেকে কুবাচাকে বিতাড়ন করেন। ভাগ্যহত কুবাচা ১২২৮ খ্রীষ্টাব্দে জলমগ্ন হয়ে মারা যান।

নিম্নসিন্ধু অঞ্চলে মঙ্গবরণীর রেখে যাওয়া হাসান কারলুখ ও উজবেক পাই ইলতুৎমিশেরও গলার কাঁটা হয়ে থাকে। মঙ্গোলদের বিরুদ্ধে তাদের সাহায্য করা নিরর্থক ও বিপজ্জনক, আবার তাদের উৎখাত করলে মঙ্গোলদের মুখোমুখি গিয়ে পড়তে হয়, এবং সেটাও বাঞ্ছনীয় নয়। কাজেই এক্ষেত্রে পরিস্থিতির উপর সতর্কভাবে নজর রাখা ভিন্ন ইলতুৎমিশ আর কিছু করেননি।

দিল্লীর পূর্বে ও দক্ষিণেও ইলতুৎমিশ নানা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিলেন। বঙ্গদেশের কিয়দংশ অর্থাৎ লখনাওতি থেকে আলি মর্দানকে অপসৃত করে হিসাম-উদ্দীন

আইওয়াজ খলজী নামক বখতিয়ারের এক অনুচর ক্ষমতা দখল করেছিলেন ও স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। তাঁকে বাহুবলের ভয় দেখিয়ে ১২২৫ খ্রীষ্টাব্দে ইলতুৎমিশ একটি সন্ধি চুক্তি করাতে বাধ্য করেন যা অনুযায়ী তিনি বিহারের কিয়দংশ ইলতুৎমিশকে ফিরিয়ে দিতে এবং দিল্লীর অধীনতা স্বীকারে রাজি হন। কিন্তু তিনি সন্ধির শর্ত অস্বীকার করলে ইলতুৎমিশের পুত্র নাসিরুদ্দীন মাহমুদ ১২২৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করেন। কিন্তু ১২২৯ খ্রীষ্টাব্দে নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ নিজেই লখ্‌নাওতিতে মারা যান, এবং তাঁর নিযুক্ত যে ব্যক্তি লখ্‌নাওতির শাসক ছিলেন তাঁকে সরিয়ে বল্‌কা নামক এক ব্যক্তি ক্ষমতা দখল করেন। ১২২৯ খ্রীষ্টাব্দে ইলতুৎমিশ স্বয়ং একটি যুদ্ধে বল্‌কাকে পরাজিত করেন।

চম্বলের দক্ষিণে পরিহাররা তাদের পুনরধিকৃত গোয়ালিয়রের ঘাঁটি থেকে ঝাঁসি এবং নরওয়ারের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। রণথম্ভোরে চাহমানরা (চৌহান) গোবিন্দরাজের নেতৃত্বে যথেষ্ট শক্তিশালী হয়। তাদেরই একটি শাখা, যারা জালোরে রাজত্ব করত, দিল্লীর প্রতি আনুগত্য প্রত্যাহার করে। আলোয়ার অঞ্চলে যদুবংশীয়রা শক্তিশালী হয়ে বয়ান, থঙ্গির এমন কি আজমীর পর্য্যন্ত বিপন্ন করে তোলে। এই রাজপুত শক্তিগুলির বিরুদ্ধে ইলতুৎমিশ পুরোপুরি সাফল্য অর্জন করতে পারেননি। ১২২৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রণথম্ভোর অধিকার করেন, কিন্তু নাগদা অঞ্চলে গুহিলদের নিকট তাঁর বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। গুজরাতের চৌলুক্যদের বিরুদ্ধেও তিনি সাফল্যলাভ করতে পারেননি। বুন্দির চৌহানদের নিকটও তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন। চৌহান বা চাহমানদের বিভিন্ন শাখার সঙ্গে যুদ্ধে তিনি মাঝে মাঝে সাফল্য লাভ করলেও তা কোন স্থায়ী ফল প্রসব করেনি। ১২৩৪-৩৫ খ্রীষ্টাব্দে মালবের যুদ্ধে সাফল্যলাভ করলেও তিনি পরমারদের শক্তিবৃদ্ধি রোধ করতে পারেননি।

দক্ষিণ সীমান্তেও তাঁর সাফল্য ছিল একান্তই সীমাবদ্ধ। চন্দেল্লদের শক্তি তিনি খর্ব করতে পারেননি। মধ্যভারতে তাঁর এক বাহিনী জজপেল্ল বংশীয় ছাহড়দেবের নিকট পরাস্ত হয়েছিল। এমন কি তাঁর খাস এলাকাতেও তুর্কীদের বিরুদ্ধে স্থানীয় শক্তিগুলি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। বুদাউন, ফারুখাবাদ, বেরিলী, আনোলা প্রভৃতি স্থানে তুর্কী বিরোধী অভ্যুত্থান ঘটেছিল। এই সকল ক্ষেত্রে ইলতুৎমিশের ভূমিকা সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট তথ্য আমাদের হাতে নেই।

সামগ্রিক বিচারে অবশ্য একথা খুবই স্পষ্ট যে নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও ইলতুৎমিশ ভারতবর্ষে একটি কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র শক্তির কাঠামো গড়ে তুলতে সক্ষম হয়ে-

ছিলেন, যদিও মুঘলদের আগে এই কাঠামো পরিপূর্ণতা অর্জন করতে পারেনি। এছাড়া তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপের মধ্যেই পরিস্থিতি-সচেতনতা ও কূটনীতির সার্থক প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।

৩ ॥ রজিয়া, চল্লিশের চক্র, নাসিরুদ্দীন

১২৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ইলতুৎমিশের মৃত্যুর পর সিংহাসনের দ্বন্দ্বে নবগঠিত দিল্লী-সুলতানীর অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে পড়ে। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ তাঁর জীবনকালেই মারা গিয়েছিলেন ১২২৯ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর অপরাপর সন্তানদের মধ্যে ছিলেন, ফিরুজ, রজিয়া (কন্যা), মুইজুদ্দীন বহ্‌রাম ও নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ (দ্বিতীয়)। ইলতুৎমিশ তাঁর কন্যা রজিয়াকেই উত্তরাধিকারিণীরূপে মনোনীত করেছিলেন।

কিন্তু ইলতুৎমিশের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই ফিরুজ লাহোর থেকে নিজেকে সুলতান বলে ঘোষণা করেন, এবং কিছু প্রাদেশিক শাসনকর্তার সমর্থনে সত্যই ক্ষমতা দখল করতে সমর্থ হন, কিন্তু অচিরেই তিনি নিজের অপদার্থতা প্রমাণ করেন। কার্যত তাঁর মা শাহ্ তুর্কান সকল ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন। এই নীচবংশীয়া মহিলার স্বেচ্ছাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মুলতান, লাহোর, হান্‌সি, বুদাউন ও অবধের শাসনকর্তারা, যাঁরা পূর্বে ফিরুজের সমর্থক ছিলেন, তাঁর বিরোধী হয়ে যান, এবং এই সুযোগে ইলতুৎমিশের কন্যা রজিয়া শাসন কর্তৃত্ব লাভ করেন। ফিরুজের অবশিষ্ট জীবন কারাগারে অতিবাহিত হয়।

এই নূতন শাসিকা অযোগ্য ছিলেন না কিন্তু তিনি কোন শক্তিমান গোষ্ঠীর নিজস্ব লোকও ছিলেন না। তাঁর দুটি বিরোধী গোষ্ঠীর নেতারা তাঁকে অপসারণের উদ্দেশ্যে দিল্লীর সন্নিকটে সমবেত হয়েছিলেন, কিন্তু রজিয়া ভেদনীতির দ্বারা দুই তরফের দুই চাঁইকে নিজপক্ষে নিয়ে আসেন, এবং বিরোধী শিবিরে ভাঙ্গন সৃষ্টি করে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হন। ইলতুৎমিশের মুক্ত ক্রীতদাস ও অনুচরদের নিয়ে গড়ে ওঠা চল্লিশ জন ক্ষমতাবান ব্যক্তির একটি চক্র তৎকালীন প্রশাসন যন্ত্রের কার্যত মালিক হয়ে বসেছিল, যাদের একচেটিয়া অধিকারের উপর রজিয়া হস্তক্ষেপ করেছিলেন। এদের মধ্যে জালালুদ্দীন ইয়াকুৎ নামক একজন হাবসী অশ্বশালার অধ্যক্ষের পদ (আমীর-ই-অখুর) প্রাপ্ত হন। পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে তাঁর পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিনি মঙ্গোলদের ঘাঁটান নি, বরং মঙ্গবরণীর প্রতিনিধি হাসান কারলুখ, যিনি নিম্ন-সিন্ধু অঞ্চলে মঙ্গোলদের সঙ্গে সংগ্রাম কর-

ছিলেন, যখন তাঁর সাহায্য চান, তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন।

চল্লিশের চক্র রজিয়ার এই স্বাধীন কার্যকলাপ বরদাস্ত করতে পারছিল না। তাঁর রাজত্বের তৃতীয় বছরে আমীর-ই হাজিব আইতিগীনের প্রচেষ্টায়, লাহোরের শাসককে দিয়ে ১২৪০ খ্রীষ্টাব্দে একটি বিদ্রোহ ঘটানো হয়, কিন্তু অতিদ্রুত সেখানে উপস্থিত হয়ে রজিয়া সেই বিদ্রোহ দমন করেন। কিন্তু কয়েকদিন পরেই ভাতিন্দার মালিক অলতুনিয়ার নেতৃত্বে আর একটি বিদ্রোহ ঘটে এবং তা দমন করতে গিয়ে রজিয়া অলতুনিয়ার হাতে বন্দিনী হন। চক্রান্তকারীরা তখন ইলতুৎমিশের তৃতীয় পুত্র মুইজুদ্দীন বহরামকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে। এই ঘটনা ঘটে ১২৪০ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে।

এদিকে বহরামকে দাবার ঘুঁটির মত ব্যবহার করার ব্যাপার নিয়ে চল্লিশের চক্রের মধ্যে ভেদ ঘটে যায়, এবং কয়েকজন চক্রী নিহত হন। ভাতিন্দায় অলতুনিয়া নিজ বিপদ উপলব্ধি করেন। ছাড়া গাধার থেকে পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহী অনেক কাজের এটা ভেবে নিয়ে অলতুনিয়া রজিয়ার সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসেন এবং উভয়ে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন। খোকর উপজাতিদের দ্বারা গঠিত একটি বাহিনী নিয়ে তাঁরা দিল্লী অভিযান করেন, কিন্তু তাঁরা সরকারী সৈন্যবাহিনীর নিকট পরাজিত হন। পলায়ন কালে কৈথাল নামক স্থানে রজিয়া একটি গাছতলায় বিশ্রামরত অবস্থায় দস্যুদের দ্বারা নিহত হন (১৩ই অক্টোবর, ১২৪০)।

কিছুকাল পর ১২৪২-এর মে মাসে বহরাম একটি চক্রান্তের ফলে নিহত হন, এবং তাঁর স্থলে ইলতুৎমিশের পৌত্র (ফিরুজের পুত্র) আলাউদ্দীন মাসুদকে বসানো হয়। এই নূতন সুলতানকে কারা চালাবে এই নিয়ে চক্রান্ত, দ্বন্দ্ব ও রক্তপাতের কয়েকটি ঘটনা ঘটে, যার সুযোগে চল্লিশের চক্রের একজন তরুণ সদস্য গিয়াসুদ্দীন বলবন পাদপ্রদীপের আলোয় আসেন। মাসুদের রাজত্বকাল চার বছর স্থায়ী হয়েছিল। ১২৪৬ খ্রীষ্টাব্দে একটি গোপন চক্রান্তের ফলে তিনি অপসারিত হন, এবং ইলতুৎমিশের কনিষ্ঠ পুত্র নাসিরুদ্দীন মাহমুদ সুলতান রূপে ঘোষিত হন। এই চক্রান্তে বলবনের বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল।

নাসিরুদ্দীনের আমলে কার্যত বলবনই সর্বেসর্বা হয়ে দাঁড়ান। নিজ কন্যার সঙ্গে তিনি সুলতানের বিবাহ দেন এবং নায়েব বা সুলতানের পরিচালকের পদাধিকারী হন। গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন দফতর তিনি নিজের লোকদের দ্বারা পূর্ণ করেন। তাঁর ছোট ভাই কাশলি খান আমীর-ই-হজিব পদে উন্নীত হন। তাঁর জ্ঞাতি ভাই শের

খান লাহোর ও মুলতানের শাসনকর্তার পদ প্রাপ্ত হন। নাসিরুদ্দীনের সময় তুর্কী প্রাধান্যের বিরুদ্ধে ভারতীয় মুসলমান পদাধিকারীরা বিক্ষুব্ধ হন। তাঁরা মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা হত। এই বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর একজন নেতা ইমাদ-উদ্দীন রাইহান ওয়াকিল-ই-দার (রাজার গৃহস্থালী বিভাগের অধ্যক্ষ) পদটি কোনক্রমে হস্তগত করলে তুর্কী পদাধিকারীরা বিদ্রোহ করে, যার পিছনে বলবনের হাত ছিল যিনি সাময়িকভাবে পদচ্যুত হয়েছিলেন ১২৫৩-৫৪ খ্রীষ্টাব্দে। নাসিরুদ্দীন বিদ্রোহীদের দাবি মেনে নেন এবং দরবারে চূড়ান্তভাবেই তুর্কী প্রাধান্য স্বীকৃত হয়। ১২৬৫ খ্রীষ্টাব্দে অপুত্রক নাসিরুদ্দীন মারা গেলে গিয়াসুদ্দীন বলবন স্বয়ং সুলতানরূপে নিজেকে ঘোষণা করেন।

৪ ॥ আভ্যন্তরীন বিদ্রোহ সমূহ

ইলতুৎমিশের মৃত্যুর পর কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল হয়ে পড়লে নানাস্থানে বিদ্রোহ ও দিল্লীর কর্তৃত্ব অস্বীকারের প্রবণতা দেখা যায়। বিদ্রোহীদের মধ্যে যেমন হিন্দু রাজারা ছিলেন, মুসলমান শাসকেরাও সংখ্যায় কম ছিলেন না। এঁরা তুর্কীজাত হলেও কালক্রমে স্থানীয় হয়ে গিয়েছিলেন। বাইরে থেকে নূতন তুর্কী আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল কারণ মঙ্গোলরা সীমান্তে চেপে বসেছিল। ভারতীয়দের সঙ্গে বিবাহ ইত্যাদির ফলে যে নূতন প্রজন্মের সৃষ্টি হয়েছিল, বিশেষ করে উত্তর ভারতের সর্বত্র, তারা ধর্মে মুসলমান হলেও, তুর্কী কৌলিন্যের একছত্র দাবিদার দিল্লীর আমীর-ওমরাহ গোষ্ঠীর সঙ্গে একাত্মতা বোধ করত না।

ইতিমধ্যে বঙ্গদেশের কিয়দংশ বা লখ্‌নাওতির শাসক তুঘান খান, কাগজে কলমে দিল্লীর কর্তৃত্ব মানলেও, ১২৪২ খ্রীষ্টাব্দে কারা, মানিকপুর ও অবধ দখল করেন। অবধের শাসক দিল্লীর কাছে আবেদন করলেও দিল্লীর কিছু করার ছিল না। এ-দিকে তুঘান খান স্বয়ং উড়িষ্যার আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে দিল্লীর সাহায্য ভিক্ষা করেন। দিল্লী থেকে সাহায্য অবশ্য আসে কিন্তু তা ওড়িষ্যার বিরুদ্ধে ব্যবহৃত না হয়ে তুঘানের বিরুদ্ধেই ব্যবহৃত হয় এবং দিল্লীর মনোনীত তামার খান লখ্‌নাওতির শাসক পদে নিযুক্ত হন। পরবর্তী শাসক ইয়াজ্‌বক তুঘানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ১২৪৯ খ্রীষ্টাব্দে অবধ অধিকার করেন এবং নিজ নামে খুৎবা পাঠ করান। দিল্লী এক্ষেত্রেও কার্যকর কিছু করতে পারেনি। ইয়াজ্‌বকের মৃত্যুর পর দিল্লীর মনোনীত ইয়াহিয়াকে অপসারিত ও নিহত করে আর্সালান খান লখ্‌নাওতি অধিকার করেন। তিনি

এবং তাঁর পুত্র তাতার খান কার্যত দিল্লীর কর্তৃত্ব অস্বীকার করেছিলেন।

অবধ ও গাঙ্গেয় অঞ্চলেও দিল্লী সুলতানীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দেয়। দিল্লীর দরবারে ভারতীয় গোষ্ঠীর নেতা ইমাদ-উদ্দীন রাইহান, যিনি তুর্কী পদাধিকারীদের বিদ্রোহে পদচ্যুত হয়েছিলেন এবং বহ্‌রইচে বদলি হয়েছিলেন, বলবনের চিরশত্রু অবধের কুতলুঘ খানের সঙ্গে মিত্রতা করেন এবং গাঙ্গেয় সমভূমি থেকে দিল্লীকে হটিয়ে দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। তাঁরা অবশ্য দিল্লী থেকে প্রেরিত একটি বাহিনীর নিকট পরাজিত হন। রাইহান বহ্‌রইচ থেকে পলায়ন করতে বাধ্য হন, কিন্তু কুতলুঘ দিল্লীর একটি বাহিনীকে পরাস্ত করেন। বলবন স্বয়ং কুতলুঘের বিরুদ্ধে অভিযান করলে তিনি হিমালয় অঞ্চলে পালিয়ে যান, কিন্তু বলবন ফিরে যাবার পরই তিনি অবধ অবরোধ করেন এবং কারা মানিকপুরের উপর হামলা চালান। অবধের স্থানীয় শাসকের দ্বারা প্রতিহত হলেও তিনি সন্তরগড়ের প্রধানের নিকট আশ্রয় পান। এই ঘটনাগুলি ঘটে ১২৫৭ খ্রীষ্টাব্দে নাগাদ।

স্থানীয় হিন্দু শক্তিগুলিও দিল্লী সুলতানীকে উত্যক্ত করে তোলে। উড়িষ্যা তুর্কীদের নিজ সীমানায় প্রবেশ করতে দেয় নি, বরং বারবার রাঢ় ও বরেন্দ্রী অঞ্চলে তুর্কীদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক যুদ্ধ চালিয়েছে। পূর্ববঙ্গে সেন বংশ তখনও রাজত্ব করছে, তবে তাদের কাছ থেকে স্থানীয় আধা-তুর্কী শক্তিগুলির বা দিল্লী সুলতানীর আশংকার কিছু ছিল না। লখ্‌নাওতির তুর্কী শাসক ইয়জবক কামরূপ অধিকার করতে গিয়ে শোচনীয়ভাবে বিপর্যস্ত ও নিহত হয়েছিলেন। বিহার অঞ্চলের স্থানীয় হিন্দুশক্তিগুলি ক্রমাগত আকস্মিক আক্রমণের দ্বারা তুর্কীদের অতিষ্ট করে তুলেছিল। কিন্তু দিল্লী সুলতানী সর্বাধিক বেকায়দায় পড়েছিল তার দক্ষিণ সীমান্ত থেকে। চন্দেল্লগণ ১২৪১-এর মধ্যেই পুনরায় শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। তারা ককরেডিকা (রেওয়া), ঝাঁসি, নলপুর (নারওয়ার), গোপাল, মধুবন (মথুরা) এবং গোপগিরির (গোয়ালিয়র) উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। ১২৫১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে চাহড়দেবের নেতৃত্বে এখানকার জজপেল্ল রাজবংশ চান্দেরী এবং মালবেও প্রাধান্য স্থাপন করে। বলবন চন্দেল্লদের নিকট থেকে নারওয়ার এবং গোয়ালিয়র সাময়িক ভাবে অধিকার করলেও তা কোন দীর্ঘস্থায়ী ফল প্রসব করেনি।

যমুনার ঠিক দক্ষিণে মহোবা এবং হমীরপুরের মধ্যবর্তী অঞ্চলের ভর রাজপুতরা দিল্লী সুলতানীর বিপদের কারণ হয়েছিল। রেওয়াতে বাঘেলদের দ্রুত শক্তিবৃদ্ধি ঘটেছিল এবং তারা টনস্ নদী বরাবর চুনারের দক্ষিণ দিকের অঞ্চলগুলি অধিকার

করেছিল। অবধের শাসকেরা এই এলাকাটিকে নিজেদের আয়ত্তে রাখতে পারেন নি, এমনকি ১২৪৭-এ কালঞ্জর ও কারার মধ্যবর্তী অঞ্চলে বলবনের ব্যাপক আক্রমণও উদীয়মান বাঘেল শক্তিকে বিশেষ খর্ব করতে পারেনি। খোদ দিল্লীর নাকের ডগায় আলিগড় জেলার উপজাতিদের দমন করার জন্য বলবনকে দু বার ব্যাপক অভিযান চালাতে হয়েছিল। কনৌজের একাংশের জনৈক হিন্দু সামন্তরাজার বিরুদ্ধে তাঁকে ১২৪৭ খ্রীষ্টাব্দে একটি বড় গোছের যুদ্ধ করতে হয়েছিল। উত্তর প্রদেশের উত্তরাঞ্চলের উপজাতিরা, বিশেষ করে বুদাউন ও সম্ভলের কাতেরিয়ারা, চতুর্দশ শতক পর্যন্ত দিল্লী সুলতানীর বিরুদ্ধে লড়াই করে গিয়েছিল। ১২৫৪ খ্রীষ্টাব্দে বলবন এতদঞ্চলে যে বিস্তৃত অভিযান করেছিলেন তারও ফল হয়েছিল একান্তই সাময়িক।

রাজপুত রাষ্ট্রগুলি থেকেও দিল্লী সুলতানী প্রভূত বাধা পেয়েছিল। ইলতুৎমিশের মৃত্যুর পরই চৌহানরা রণথম্ভোর দখল করে বসে, এবং বাগভটের নেতৃত্বে তারা একটি নূতন চৌহান বংশের পত্তন করে। কোটা, বুন্দি ও জালোরের চৌহানদের শাখা-বংশগুলিও শক্তিশালী হয়। ১২১৩ থেকে ১২৫২-র মধ্যে উৎকীর্ণ লেখমালা থেকে জানা যায় যে রাজপুতরা বহুবারই তুর্কীদের বিরুদ্ধে সাফল্য অর্জন করেছিল। ১২৪৮-এ বলবন চৌহানদের উপর যে আক্রমণ চালিয়েছিলেন তা প্রতিহত হয়েছিল। ১২৫৮-র দ্বিতীয় অভিযানে তিনি কিছু মেওয়াটি গ্রাম লুণ্ঠন করা ভিন্ন আর কিছু করতে পারেননি।

৫ ॥ মঙ্গোল আক্রমণ

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে মঙ্গোল বাহিনীর সমাবেশের কথা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। ১২২৯ খ্রীষ্টাব্দে উক্তাই মঙ্গোল খান পদে অধিষ্ঠিত হবার পর সিন্ধু অববাহিকায় মঙ্গোল আক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধি পায় এবং তারা লাহোর লুণ্ঠন করে। ১২৪৭ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ লাহোর কার্যত দিল্লী সুলতানীর হস্তচ্যুত হয়, এবং উচ ও মুলতানের নিরাপত্তা বলেও কিছু অবশিষ্ট থাকে না। যাই হোক, লুটপাটের পর মঙ্গোলরা কিছুটা সরে গেলে বলবন এই দুটি শহর পুনরধিকার করেন, কিন্তু স্থানীয় শাসক কিশলু খানের নিকট থেকে সেই মঙ্গবরনীর প্রতিনিধি হাসান কারলুঘ মুলতান এবং ভাতিন্দার শাসক শেরখান উচ কেড়ে নেন। শের খানের ব্যাপারে বলবনের সমর্থন ছিল। ফলে কিশলু ভারতীয় গোষ্ঠীর নেতা রাইহানের পক্ষে যোগ দেন, এবং ১২৫৩ খ্রীষ্টাব্দে যখন বলবন ক্ষমতায় ছিলেন না, নিজ অধিকার ফিরে পান। ১২৫৫ খ্রীষ্টাব্দে বলবন পুনরায়

ক্ষমতায় এসে তিনি দিল্লী'র সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং ইরানের মঙ্গোল শাসক হুলাগু খানের বশ্যতা স্বীকার করেন। তাঁরই আগ্রহে ১২৫৭ খ্রীষ্টাব্দে একটি মঙ্গোল বাহিনী দিল্লীর উপকণ্ঠে উপস্থিত হয়, কিন্তু তারা তৎকালীন দিল্লীর সুলতানীর শাসক গোষ্ঠীর বিরোধীদের কাছ থেকে বিদ্রোহের যে প্রতিশ্রুতি পেয়েছিল তা পালিত না হওয়ায় প্রত্যাবর্তন করে। কিশলু অতঃপর হুলাগুখানকে দিল্লীর বিরুদ্ধে একটি পূর্ণাঙ্গ অভিযান চালাতে অনুরোধ করেন, কিন্তু হুলাগু তার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেননি। বলবন নাসিরুদ্দীন-প্রশাসনে থাকাকালীন মঙ্গোলদের অপ্রীত হবার মত কোন কাজ করা হোক বরাবর বিরত ছিলেন। হুলাগুর কাছে তিনি বন্ধুত্বের প্রস্তাব করেন, এবং প্রত্যুত্তরে হুলাগু ১২৫৯ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীতে একটি শুভেচ্ছা মিশন প্রেরণ করেন। দিল্লী সুলতানীর সঙ্গে কোন চুক্তির ফলে মঙ্গোলরা সিন্ধু অঞ্চল থেকে সরে গিয়েছিল কিনা তা জানা যায় না, তবে পাঞ্জাবের পশ্চিমে তারা বহাল তবিয়তেই ছিল, এবং এক্ষেত্রে দিল্লী কর্তৃপক্ষ ইলতুৎমিশের সাবধানী নীতি অবলম্বন করেই চলেছিলেন।

৬॥ গিয়াসুদ্দীন বলবন (১২৬৫-৮৭)

১২৬৫ খ্রীষ্টাব্দে নিঃসন্তান অবস্থায় নাসিরুদ্দীন মাহমুদ মারা গেলে গিয়াসুদ্দীন বলবন তাঁর নিজের রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর প্রথম কাজ ছিল নিজ শক্তিকে সুসংহত করা এবং সম্ভাব্য সকল প্রতিদ্বন্দ্বীকে নিকাশ করা। দুটির কোনটিতেই তাঁর কোন অসুবিধা হয়নি কারণ নাসিরুদ্দীনের আমলে নায়েব-ই-মামলিকাৎ পদে আসীন থাকাকালে তিনি ক্ষমতা প্রয়োগের বিভিন্ন রন্ধ্রপথ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়েছিলেন।

আক্ষরিক অর্থে রাজতন্ত্রের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলবন, কেননা তাঁর পূর্ববর্তী সুলতানরা, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হলেও, কিছুটা গোষ্ঠী-আনুগত্যের অধীন ছিলেন। বলবন নিজে ছিলেন ইল্‌বারি তুর্ক, কিন্তু তার রাজপদকে মহিমান্বিত করার জন্য তিনি নিজেকে পারসিক পুরাণোক্ত তুর্কী বীর আফ্রাসিয়াবের বংশধর বলে পরিচিত করেছিলেন। তিনিই প্রথম নানা প্রকার দরবারী রীতির প্রবর্তন করেছিলেন। তাঁর দর্শন লাভ করা বা তাঁর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ উচ্চ পদাধিকারীদের পক্ষেও পরম সৌভাগ্যের বিষয় বলে গণ্য করা হত। তাঁর রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের তিনি চরমতম নির্দয়তার সঙ্গে খতম করেছিলেন। বুদাউন

এবং অবধের শাসকদ্বয়কে তিনি প্রকাশ্যে বেত্রাঘাতে জর্জরিত করিয়েছিলেন। তাদের অপরাধ ছিল গৃহভৃত্যদের প্রতি দুর্ব্যবহার। আসলে এই রকম শাস্তি দিয়ে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন, রাজাই একমাত্র সকলের প্রভু, যিনি সকলের ব্যক্তিগত বিষয়ও নিয়ন্ত্রণ করার অধিকারী।

বলবনের সামনে সমস্যা ছিল নানাবিধ। রাজপুতদের আক্রমণাত্মক বিভিন্ন অভিযান, মঙ্গোলদের চাপ, তুর্কী প্রধানদের বিদ্রোহ, আইন শৃংখলার চরম অবনতি —সব কিছুই দিল্লী সুলতানীকে একটা শোচনীয় পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল। তাঁর নির্দেশে দিল্লীর আশেপাশের বনাঞ্চলগুলি পরিষ্কৃত হয়, এবং মেওয়াটিদের আকস্মিক আক্রমণ থেকে শহরকে রক্ষা করার জন্য দিল্লীর দক্ষিণ পশ্চিমে কয়েকটি সামরিক ঘাঁটি বসানো হয়। পূর্বদিকে অবধ ও দোয়াব অঞ্চলে কয়েকটি সামরিক কেন্দ্র খোলা হয়। কাম্পিল ও পুতিয়ালী (ফারুখাবাদ জেলা) অঞ্চলে বলবন স্বয়ং উপস্থিত থেকে বনজঙ্গল সাফ করান এবং নূতন রাস্তা নির্মাণ ছাড়াও তিনি বহু আফগান যোদ্ধাকে চাষের জমি দিয়ে বসতি করান যাতে প্রয়োজনে স্থানীয়ভাবে তাদের সামরিক সাহায্য পাওয়া যায়। তাঁর রাজত্বের দ্বিতীয় বছরে বুদাউনে কাতেরিয়ারা হানা দেয়। অত্যন্ত নৃশংসভাবে বলবন এর প্রতিশোধ নেন।

বলবন রাজ্য বিস্তারের পরিবর্তে নিজ শক্তিকে সংহত করার দিকে অধিকতর মনোযোগ দিয়েছিলেন। 'দূরবর্তী রাণাদের' উপর বিজয় লাভের পরিবর্তে তিনি নিজ রাজ্যের সীমানার নিরাপত্তার দিকেই অধিকতর মনোযোগী হয়েছিলেন। বলবন যে আদর্শের ভিত্তিতে তাঁর রাজতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছিলেন তা হচ্ছে তুর্কীদের জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা। এই ধারণার উদ্গাতা ইলতুৎমিশ। এই রকম একটি আদর্শই তুর্কীদের একসূত্রে বেঁধে রাখার পক্ষে উপযোগী ছিল। কিন্তু বাস্তবে এখানে তুর্কীরা ছিল ক্রমহ্রাসমান। নূতন কোন দল মঙ্গোলদের বাধা পেরিয়ে আসতে পারেনি। স্থানীয় লোকদের সঙ্গে মেলামেশার ফলে ইতিমধ্যেই একটি নূতন প্রজন্ম হয়েছিল যাদের আর বিশুদ্ধ তুর্কী বলা যেত না। তা ছাড়া এদেশে দীক্ষিত মুসলমানদের সংখ্যা তুর্কীদের ছাপিয়ে গিয়েছিল, এবং ইসলাম ধর্মী হবার দরুন শাসন- ব্যবস্থায় তাদের অংশগ্রহণের দাবিকেও সরিয়ে রাখা সম্ভব ছিল না। বস্তুত রাইহানের ক্ষমতালাভ এবং নাসিরুদ্দীনের আমলে বলবনের সাময়িক পদচ্যুতি ভারতীয় মুসলমানদের আশা-আকাঙ্খার পরিচায়ক ছিল। তা ছাড়া বাস্তব প্রয়োজনে, বিশেষ করে মঙ্গোল আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় হিন্দু শক্তিগুলির

সঙ্গেও একটা সমঝোতা গড়ে উঠেছিল। কাজেই তুর্কী-শ্রেষ্ঠত্বের আদর্শ ঐতিহাসিক নিয়মেই অচল হয়ে গিয়েছিল।

মঙ্গোলদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য বলবন একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা গড়ে তুলে-ছিলেন। তাঁর জ্ঞাতিভাই শের খান ছিলেন মুলতান ও দীপালপুরের শাসনকর্তা। তাঁর মৃত্যু হলে বলবন তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র মহম্মদকে ওই দুই অঞ্চলের দায়িত্ব দেন। ভাতিন্দা জেলাটিকে তিনি পৃথক করে একটি দ্বিতীয় ঘাঁটিতে পরিণত করেন। হঠাৎ কোন মঙ্গোল আক্রমণ ঘটলে যাতে তা ধারাবাহিকভাবে রোধ করা যায় সে ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন। মঙ্গোলরা অবশ্য সিন্ধুর পশ্চিম বরাবর ছিল এবং তারা দিল্লী সুলতানীর সঙ্গে সীমানা রক্ষা করত।

বঙ্গদেশ বরাবরই দিল্লীকে বেগ দিয়ে আসছিল। নাসিরুদ্দীনের রাজত্বের শেষ দিকে আর্সালান খান এবং তাঁর পুত্র তাতার খান প্রায় স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করতেন। তাতার খান মারা গেলে, অথবা কোন কারণে গদীচ্যুত হলে, বলবনের মনোনীত ব্যক্তি হিসাবে তুঘ্রিল লখ্‌নাওতির শাসকপদে নিযুক্ত হন। তুঘ্রিল অচিরেই জনপ্রিয়তা অর্জন করেন, এবং বলবনের বার্দ্ধক্যের সুযোগ নিয়ে ১২৮০ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তাঁকে দমন করার জন্য অবধের শাসনকর্তা আমীন খানকে পাঠানো হয়, কিন্তু তিনি পরাজিত হন। বঙ্গদেশের বিরুদ্ধে পরবর্তী দুটি অভিযানও ব্যর্থ হয়। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে বলবন স্বয়ং এক বিশাল বাহিনী নিয়ে তুঘ্রিলের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। এবার তুঘ্রিল ভীত হয়ে লখ্‌নাওতি ছেড়ে পলায়ন করেন। বলবন সোনারগাঁও পর্যন্ত হাজির হন এবং সেখানকার রাজা দেব-বংশীয় দনুজমাধবের সঙ্গে একটি বোঝাপড়ায় এসে তাঁকে দিয়ে জলপথে তুঘ্রিলকে আটকাবার বন্দোবস্ত করেন। তুঘ্রিলকে অনুসন্ধানের জন্য নানাদিকে বাহিনী প্রেরণ করা হয় এবং অবশেষে ত্রিপুরা জেলায় তাঁকে পাওয়া মাত্র তাঁর শিরশ্ছেদ করা হয়। তুঘ্রিলের অনুচরদের লখ্‌নাওতির বাজারে ফাঁসি দেওয়া হয়। নিজপুত্র বুঘরা খানকে তিনি বঙ্গদেশের দায়িত্বে রেখে আসেন। ১২৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বলবনের জ্যেষ্ঠপুত্র মহম্মদ মঙ্গোলদের সঙ্গে একটি সংঘর্ষে নিহত হন। এতে বলবন ভেঙে পড়েন, এবং পর বৎসরই (১২৮৭ খ্রীষ্টাব্দ) তিনি মারা যান। মৃত্যুশয্যায় তিনি তাঁর অপর পুত্র বুঘরা খানকে ডেকে পাঠান, এবং তাঁর উপর দিল্লী সুলতানীর ভার ন্যস্ত করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু দিল্লীর ষড়যন্ত্রী আবহাওয়া বুঘরার পছন্দ হয় নি। তিনি বঙ্গদেশে ফিরে যাওয়াই কাম্য মনে করলেন। পথে তিনি পিতার মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করেও

নিজ সিদ্ধান্তে অটল রইলেন, দিল্লী ফিরে গেলেন না। মৃত্যুর পূর্বে বলবন তাঁর পৌত্র (মহম্মদের পুত্র) কাইখুসরবকে উত্তরাধিকারী করে গিয়েছিলেন।

৭॥ **বলবনের পর**

বলবনের মৃত্যুর রাত্রেই তাঁর কোতোয়াল তাঁর আদেশ অমান্য করে জবরদস্তির দ্বারা কাইখুসরবকে মুলতানের শাসকরূপে পাচার করে দেয় এবং ওয়াজির সহ তাঁর সমর্থকদের বন্দী করে। অতঃপর সে বুঘরা খানের পুত্র কাইকোবাদকে সিংহাসনে বসায়, আর এই কোতোয়াল মহাশয়ের জামাতা নিজামুদ্দীনই সর্বেসর্বা হয়ে বসে।

নিজামুদ্দীন কাইকোবাদকে বিলাস ও ভোগের জীবনে আসক্ত করায়, এবং সকল ক্ষমতা কুক্ষিগত করে নেয়। ছয় মাসের মধ্যেই কাইখুসরবকে হত্যা করা হয়, তার সমর্থকেরাও রেহাই পায় না। পুত্রের ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা ও নিজামুদ্দীনের অপশাসনের সংবাদ লখনাওতিতে শান্তিপ্রিয় বুঘরা খানের নিকট পৌঁছায়। চিঠিপত্রে পুত্রকে সদুপদেশ দিয়েও যখন কোন কাজ হল না, বুঘরা কাইকোবাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইলেন। সরযূ নদীর তীরে উভয়ের সাক্ষাতের বর্ণনা আমীর খসরু অতি সুন্দর ভাবে লিপিবদ্ধ করেন। বুঘরা খান প্রবল ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদাবোধ সহ কাইকোবাদকে তাঁর কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করলেন, এবং নিজামুদ্দীনের মত লোকদের সংসর্গ ত্যাগ করবার উপদেশ দিয়ে বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন। কাইকোবাদ তাঁর পিতার উপদেশ কতদূর শিরোধার্য করেছিলেন বলা শক্ত, তবে তাঁর নির্দেশে নিজামুদ্দীন নিহত হয়েছিলেন। আরও কয়েকজন পদস্থ ব্যক্তি তাঁর ইঙ্গিতে নিহত হয়েছিলেন। কিন্তু এই মেরুদণ্ডহীন সুলতান শেষ পর্যন্ত অপসারিত হন এবং তাঁর জায়গায় তাঁর তিন বৎসর বয়স্ক পুত্র কায়ুমার্সকে সিংহাসনে বসানো হয় ১২৮৯ খ্রীষ্টাব্দে।

কাইকোবাদের অপসারণের ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন তাঁর আমীর-ই হাজিব মালিক কছন। এঁর গোষ্ঠী শাসনযন্ত্র থেকে অতুর্কী উপাদান নির্মূল করার পক্ষপাতী ছিল, এবং এই উপলক্ষে কাদের অপসারণ বা হত্যা করা হবে তার একটি তালিকাও প্রস্তুত করা হয়েছিল। এই তালিকার প্রথম নামটি ছিল মালিক ইয়াখ্‌রাশ ফিরুজের, যিনি খলজী গোষ্ঠীর লোক ছিলেন এবং যথেষ্ট পরিমাণে বিশুদ্ধ তুর্কী বলে গণ্য হতেন না। সৌভাগ্যক্রমে এই চক্রান্তের বিষয় তিনি জেনে যান এবং মালিক কছন তাঁকে হত্যা করার আগেই তিনি তাকে খতম করেন। শুধু তাই নয়, নিজস্ব অনুচরদের নিয়ে রাজপ্রাসাদে একটি আকস্মিক হামলা চালিয়ে তিনি বালক-রাজা কায়ুমার্সকে হস্তগত করেন, এবং কিছুকাল তার অভিভাবক হিসাবে শাসনকার্য পরিচালনার পর ১২৯০ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ জুন নিজেকে সুলতান বলে ঘোষণা করেন জালালুদ্দীন ফিরুজ নাম নিয়ে।

তৃতীয় অধ্যায়

দিল্লী সুলতানীর বিস্তার

১॥ খলজীবংশ : জালালুদ্দীন খলজী (১২৯০-৯৬)

১২৯০ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে জালালুদ্দীন ফিরুজ শাহের দিল্লীর তখতে আসীন হওয়াটা অভিজাত তুর্কীরা সুনজরে দেখেনি, এবং কিছুটা হীনমন্যতার বশেই জালালুদ্দীন খোদ দিল্লীতে বাস না করে দিল্লীর উপকণ্ঠে কিলুঘরিতে রাজধানী বসিয়েছিলেন। খলজীদের আফগান বলে মনে করা হত, যদিও তারা আদিতে তুর্কীই ছিল। কিন্তু কয়েক পুরুষ আফগানিস্তানে থাকার ফলে কুলীন ইলবারীরা তাদের তুর্কী বলে স্বীকার করত না।

জালালুদ্দীন সুলতান হবার পর নিজস্ব লোকদের নানা পদ দিয়ে সন্তুষ্ট করেছিলেন, কিন্তু প্রাক্তন পদাধিকারীদের বরখাস্ত করেন নি। বলবনবংশীয় মালিক ছজ্জুকে তিনি কারা-মানিকপুরের শাসকের পদে বহাল রেখেছিলেন। খাজা খতির, যিনি বলবন ও কাইকোবাদের সময় ওয়াজির বা প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, জালালুদ্দীনের আমলে একই কাজের ভার পেয়েছিলেন। দিল্লীর কোতোয়াল ফকরুদ্দীন স্বপদেই বহাল ছিলেন। সুলতানের ছোট ভাই ইয়াঘরুশখান দেশরক্ষা মন্ত্রীর পদ পান, এবং দুই ভাতুষ্পুত্র, আলাউদ্দীন এবং আলমাস বেগ, গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী হন।

জালালুদ্দীন ছিলেন কোমল প্রকৃতির মানুষ, এবং সিংহাসনারোহণকালে তাঁর বয়স ছিল সত্তর। তাঁর কোমল প্রকৃতি ও দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কারা-মানিকপুরের শাসক বলবনবংশীয় মালিক ছজ্জু অবধের শাসক আমীর আলি ও অপরাপর কয়েকজন ইলবারী তুর্ক প্রধানের সহযোগিতায় বিদ্রোহ করেন এবং বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হন। কিন্তু তাঁরা পরাজিত হন। শৃংখলাবদ্ধ ছজ্জুকে জালালুদ্দীন মুক্তি দেন ও মার্জনা করেন, যদিও কারার শাসনভার নিজ ভাতুষ্পুত্র ও জামাতা আলাউদ্দীনের উপর অর্পণ করেন।

সিদি মৌলা নামক একজন ধর্মগুরুর আস্তানা খলজী-বিরোধী তুর্কী প্রধানদের রাজনৈতিক চক্রান্তের কেন্দ্র ছিল, এবং সিদি ছিলেন তার মূল হোতা। এই চক্রান্তকারীরা কোন এক শুক্রবার প্রার্থনারত জালালুদ্দীনকে হত্যার পরিকল্পনা

করে। এই চক্রান্ত কিন্তু ফাঁস হয়ে যায়। সিদির সঙ্গীসাথীদের নানা প্রকার শাস্তি দেওয়া হয় এবং সিদিকে রাজসভায় নিয়ে এসে হত্যা করা হয় (১২৯১ খ্রীঃ)। তাঁকে হত্যা করা হয় জালালুদ্দীনের দ্বিতীয় পুত্র আর্কলী খানের প্রত্যক্ষ নির্দেশে।

১২৯১ খ্রীষ্টাব্দে জালালুদ্দীন রণথম্ভোর অভিযান করেন কিন্তু রণথম্ভোর দুর্গ অধিকার না করেই তিনি ফিরে আসেন। ১২৯১ খ্রীষ্টাব্দে একটি বিরাট মঙ্গোল বাহিনী সুনাম প্রদেশ পর্যন্ত অগ্রসর হয়। উত্তর পশ্চিমে এই প্রদেশটি বলবন মঙ্গোল আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য পৃথক্ভাবে সৃষ্টি করেছিলেন। জালালুদ্দীন এদের একটি অগ্রবর্তী বাহিনীকে পরাজিত করেন, কিন্তু পিছনে তাদের যে মূল বাহিনী ছিল তাদের আক্রমণের ধাক্কা সামলাতে পারবেন না বিবেচনা করে তাদের সঙ্গে সন্ধি করেন। মঙ্গোলদের একটি গোষ্ঠীর সর্দার উলঘু ৪০০০ অনুচরসহ ইসলামধর্ম গ্রহণ করেন এবং দিল্লীর পশ্চিমাঞ্চলে তাঁরা স্থায়ী বসতি স্থাপন করেন এবং 'নব মুসলিম' নামে পরিচিত হন। ১২৯২-এর শেষের দিকে জালালুদ্দীন মান্দোর জয় করেন।

জালালুদ্দীনের ভাইপো এবং জামাই আলাউদ্দীন বরাবর উচ্চাকাঙ্খী ছিলেন এবং পিতৃব্যকে হত্যা করে দিল্লীর মসনদ অধিকারের মতলব করছিলেন। ১২৯২-এর শেষের দিকে তিনি সুলতানের অনুমতি নিয়ে ভীলসা লুণ্ঠন করেন এবং লুণ্ঠিত সামগ্রীর একটি বড় অংশ পিতৃব্যকে উপহার দেন। এতে খুশি হয়ে জালালুদ্দীন তাঁকে অবধের শাসন কর্তার পদ দেন। পূর্বে তিনি কারার শাসক ছিলেন। এর পর আলাউদ্দীন তাঁর কাছ থেকে চান্দেরী অভিযানের জন্য অনুমতি চান এবং এই উদ্দেশ্যে সৈন্য সংগ্রহের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন সেজন্য কারা ও অবধের রাজস্বের সিংহভাগ প্রার্থনা করেন। এই আবেদন মঞ্জুর হলে ১২৯৬ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে আলাউদ্দীন চান্দেরী অভিযানে নির্গত হন, কিন্তু তাঁর লক্ষ্য চান্দেরী ছিল না, ছিল দেবাগার (দৌলতাবাদ) যেখানকার প্রচুর ধনসম্পদের কথা তিনি পূর্বে শুনেছিলেন।

চান্দেরী ও ভীলসার মধ্য দিয়ে তিনি ইলিচপুরে পৌছান এবং সেখান থেকে দেবগিরি অভিমুখে রওনা হ'ন। পথে দেবগিরির ২ মাইল পশ্চিমে লাসুর গিরিপথে তিনি স্থানীয় শাসক কানহার নিকট প্রবলভাবে বাধাপ্রাপ্ত হন, এবং তাঁকে পরাজিত করে দেবগিরিতে উপস্থিত হন। দেবগিরির যাদববংশীয় রাজা রামচন্দ্র তখন প্রস্তুত ছিলেন না, কেননা তাঁর সেনাবাহিনীর একটা বড় অংশ তাঁর পুত্র শংকরদেবের (সম্ভবত তাঁর প্রকৃত নাম সিংহনদেব) অধীনে সীমান্তে ব্যস্ত ছিল। রামচন্দ্র বাধ্য হয়ে তাঁর সঙ্গে একটি সন্ধিচুক্তিতে এলেন, কিন্তু আলাউদ্দীনের অভিযানের সংবাদ

পেয়ে শংকর বা সিংহন অতি দ্রুত রাজধানীতে ফিরে এসে পিতার সন্ধিচুক্তিকে অগ্রাহ্য করেই বিপুলভাবে আলাউদ্দীনের বাহিনীকে আক্রমণ করলেন। যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করতেন যদি না আলাউদ্দীনের পক্ষে আরও একটি বাহিনী নসরৎ খানের অধীনে সময় মত হাজির হত। এবারে উভয়পক্ষে যে সন্ধি হল তাতে আলাউদ্দীনের শর্তাবলী রক্ষা করা ভিন্ন কোন উপায় ছিল না। প্রচুর লুণ্ঠিত সামগ্রী ও ইলিচপুরের পুরো বার্ষিক রাজস্ব প্রদানের প্রতিশ্রুতি সহ ১২৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জুন তারিখে তিনি কারার প্রত্যাবর্তন করলেন, পথে আসীরগড়ের দুর্গ লুণ্ঠন করে।

আলাউদ্দীনের আসল মতলবের কথা একজন বুঝেছিলেন যাঁর নাম আহমদ চা যিনি জালালুদ্দীনের আত্মীয় ও বিশ্বস্ত অনুচর ছিলেন। বস্তুত এঁরই প্রচেষ্টার ফলে পূর্ববর্তী রাজবংশের আমলে জালালুদ্দীনকে যে হত্যার চক্রান্ত হয়েছিল তা ব্যর্থ হয়। ইনি সুলতানকে বোঝালেন যে আলাউদ্দীন চান্দেরী অভিযানের নাম করে সুলতানের অনুমতি ব্যতিরেকে দেবগিরি অভিযান করে খুবই গর্হিত কাজ করেছেন যার জন্য তাঁর শাস্তি হওয়া উচিত। কিন্তু জালালুদ্দীন এ উপদেশে কান দিলেন না। ওদিকে আলাউদ্দীনও অনুতপ্ত হবার ভান করে জালালুদ্দীনকে দাক্ষিণাত্য থেকে প্রাপ্ত স্বর্ণ-সম্ভার উপহার দেবার অছিলায় কারায় আমন্ত্রণ জানালেন। স্নেহান্ধ জালালুদ্দীন এই ফাঁদে পা দিলেন, এবং মানিকপুর নামক স্থানে আলাউদ্দীনের শিবিরে উপস্থিত হলেন। আলাউদ্দীন তাঁর পিতৃব্যের পদতলে পতিত হলেন, এবং সুলতান যখন তাঁর হাত ধরে তুলছেন, আলাউদ্দীনের অনুচর মহম্মদ সালিম তাঁকে পিছন থেকে ছুরিকাঘাত করে এবং তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয় অনুচর ইখ্‌তিয়ারউদ্দিন হুদ তাঁর মস্তক শিরচ্যুত করে (২০শে জুলাই ১২৯৬)।

২॥ আলাউদ্দীন খলজী (১২৯৬-১৩১৬)

সিংহাসনারোহণ: কারাতে জালালুদ্দীন নিহত হবার পর তদ্দণ্ডেই আলাউদ্দীন সিংহাসনলাভের জন্য দিল্লী অভিযান করলেন। এদিকে জালালুদ্দীনের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে তাঁর বিধবা পত্নী জালালুদ্দীনের কণিষ্ঠ পুত্র কাদির খানকে রুকনুদ্দীন ইব্রাহিম নাম দিয়ে সিংহাসনে বসিয়ে দিলেন। এদিকে তাঁর বড় ভাই অর্কলি খান তখন মুলতানে ছিলেন যিনি কদিরের দাবি মানলেন না, ফলে দিল্লীর ওমরাহ গোষ্ঠীও জালালুদ্দীনের উত্তরাধিকারের প্রশ্নে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ল। আলাউদ্দীন এই সুযোগ নিলেন। দেবগিরির লুণ্ঠিত অর্থে ওমরাহকুলকে কিনে নিতে

তাঁর কোন অসুবিধা হল না। ১২৯৬-র ২২শে অক্টোবর তারিখে আলাউদ্দীন বিজয়ীর বেশে দিল্লী প্রবেশ করলেন। জালালুদ্দীনের বিশ্বস্ত আহমদ চাপ বালক রাজা রুকনুদ্দীন ও তার মাতাকে নিয়ে মুলতানে পালিয়ে গেলেন।

সিংহাসনে আরোহণ করার পর আলাউদ্দীনের প্রথম কাজ হল জ্ঞাতিশত্রুদের নির্মূল করা। তাঁর দুই সেনাপতি উলুঘ খান (ইনি আলাউদ্দীনের ভাই আল্মাস বেগ) এবং জাফর খানকে মুলতানে এক বিরাট বাহিনী দিয়ে পাঠালেন। জালালুদ্দীনের দুই পুত্র, অর্কলি খান এবং রুকনুদ্দীন, প্রথমে বন্দী, পরে অন্ধ ও সর্বশেষে নিহত হলেন। তাঁদের সমর্থকদেরও হত্যা করা হল। এর পর আলাউদ্দীন সেই সব ওমরাহদের হত্যা করালেন যাঁরা ইতিপূর্বে অর্থের বিনিময়ে তাঁর পক্ষাবলম্বী হয়েছিলেন।

গোড়ার দিকের যুদ্ধবিগ্রহ: ১২৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে কদর খানের নেতৃত্বে এক লক্ষ মঙ্গোলের একটি বাহিনী পাঞ্জাবে অভিযান চালায় এবং লাহোর পর্যন্ত অগ্রসর হয়। আলাউদ্দীনের সেনাপতিদ্বয় উলুঘ খান এবং জাফর খান জলন্ধরের নিকট তাদের পরাজিত করেন এবং হটে যেতে বাধ্য করেন। ওই বছরেরই শেষের দিকে দ্বিতীয় মঙ্গোল আক্রমণ হয় সল্দীর নেতৃত্বে এবং তারা শেহ্‌ওয়ান দখল করে। এই আক্রমণও জাফর খান কর্তৃক প্রতিহত হয় এবং সলদি সহ বহু মঙ্গোল ধৃত ও বন্দী হয়। তৃতীয় মঙ্গোল আক্রমণ হয় ১২৯৯ খ্রীষ্টাব্দে কুতলুঘ খাজার নেতৃত্বে। এই বাহিনী সিন্ধু অতিক্রম করে দিল্লীর কাছাকাছি পর্যন্ত হাজির হয়। আলাউদ্দীনের সেনাপতি জাফর খানের চেষ্টায় এই আক্রমণ প্রতিহত হয়, কিন্তু জাফর খান স্বয়ং প্রাণ হারান।

১২৯৮ খ্রীষ্টাব্দে আলাউদ্দীন তাঁর দুই সেনাপতি উলুঘ খান ও নুসরৎ খানকে গুজরাত অভিযানে প্রেরণ করেন। অভিযানের পথে উলুঘ খান জয়শলমীর আক্রমণ করেন, এবং তারপর নুসরতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে চিতোর। চিতোরে তাঁরা সাফল্য লাভ করতে পারেননি। অতঃপর তাঁরা গুজরাতে প্রবেশ করেন এবং রাজধানী অনহিলবারা দখল করেন। গুজরাতের বাঘেল বংশীয় রাজা কর্ণ আমেদাবাদে তাঁদের বাধা দেবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে পলায়ন করেন। তারপর আলাউদ্দীনের বাহিনী সুরাট পর্যন্ত অগ্রসর হয় এবং সেখান থেকে সোমনাথ। সোমনাথের মন্দির দ্বিতীয়বার লুণ্ঠিত হয়। অতঃপর নুসরুৎ খান ক্যাম্বে বন্দর লুণ্ঠন করেন। এইখানে তিনি কাফুর নামক একজন হিন্দু ক্রীতদাসকে সংগ্রহ করেন, পরবর্তীকালে যার

একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ভূমিকা ছিল। আলাউদ্দীনের এই আক্রমণে গুজরাত সর্বস্বান্ত হয়।

এরপর আলাউদ্দীন রণথম্ভোর অভিযান করেন, যেখানকার দুর্গাধিপতি ছিলেন হমীরদেব যিনি বিদ্রোহী মঙ্গোলদের আশ্রয় দিয়েছিলেন। রণথম্ভোর দুর্গ অবরোধকালে আলাউদ্দীনের সেনাপতি নুসরৎ খান মারাত্মক ভাবে আহত হন এবং তাঁর বাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হয়। তখন আলাউদ্দীন স্বয়ং এক বিরাট বাহিনী নিয়ে রণথম্ভোর অভিযান করেন। বেশ কিছুকাল অবরুদ্ধ থাকার পর হমীরদেব শান্তি স্থাপনের জন্য তাঁর মন্ত্রী রণমলকে আলাউদ্দীনের শিবিরে প্রেরণ করেন, কিন্তু এই লোকটি আলাউদ্দীনের পক্ষভুক্ত হয়। নিরুপায় হমীরদেব যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দেন। রণথম্ভোর অধিকৃত হয় ১৩০১ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই জুলাই তারিখে। বিশ্বাসঘাতক রণমল ও তার অনুচরদের আলাউদ্দীন অতঃপর হত্যার নির্দেশ দেন। আলাউদ্দীনের চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যে তিনি বিশ্বাসঘাতকতার সুযোগ গ্রহণ করতেন, কিন্তু কার্যসিদ্ধি হবার পর বিশ্বাসঘাতকদের বাঁচিয়ে রাখতেন না।

বিদ্রোহ সমূহ: আলাউদ্দীনকে নানা ধরনের বিদ্রোহের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। গুজরাত থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে জালোরের নিকটবর্তী একটি স্থানে লুণ্ঠিত সামগ্রীর বখরা নিয়ে তাঁর সৈন্যবাহিনীর একাংশের মধ্যে বিদ্রোহ ঘটে, এবং বিদ্রোহীরা নুসরৎ খানের ভাই আলাউদ্দীনের এক ভাইপোকে হত্যা করে। চরম নৃশংসতার সঙ্গে এই বিদ্রোহ দমন করা হয়। আলাউদ্দীনের রণথম্ভোর অভিযানকালে দিল্লীর অনতিদূরে তিলপথ নামক স্থানে আলাউদ্দীনের অপর এক ভ্রাতুষ্পুত্র আকৎ খান তাঁকে হত্যার চেষ্টা করেছিলেন। সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। যখন তিনি রণথম্ভোর অবরোধ করে অপেক্ষা করছিলেন সেই সময় তাঁর দুই ভাগ্নে, বুদায়ুনের শাসক উমর খান এবং অবধের শাসক মঙ্গু খান, বিদ্রোহ করেছিলেন। আলাউদ্দীনের সৈন্যদল তাঁদের গ্রেপ্তার করে রণথম্ভোরে নিয়ে আসে এবং সেখানে তাঁদের চোখ উপড়ে ফেলা হয়। ১৩০১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে খোদ দিল্লীতেই হাজী মৌলা নামক এক জন প্রধান ব্যক্তি বিদ্রোহ করেন। তিনি কোতোয়ালকে হত্যা করেন, সরকারী কোষাগার লুণ্ঠন করেন এবং ইলতুৎমিশ-বংশীয় একজনকে সুলতান বলে ঘোষণা করেন। এই বিদ্রোহ দমন করা হয় এবং বিদ্রোহীদের হত্যা করা হয়।

এই সকল বিদ্রোহের চারটি কারণ আলাউদ্দীন অনুধাবন করেছিলেন—রাজার কর্তব্যকর্মে অমনোযোগ, সামাজিক সমাবেশে মদ্যপান, ক্ষমতাবান লোকেদের মধ্যে

বৈবাহিক সম্পর্কের ফলে গড়ে ওঠা আত্মীয়তা, এবং আর্থিক স্বাচ্ছল্য যা অলস মস্তিষ্ককে শয়তানের কারখানা করে তোলে। কলমের এক খোঁচায় আলাউদ্দীন পদস্থ ব্যক্তিদের আর্থিক সুযোগসুবিধা ও জমির উপর অধিকার বাজেয়াপ্ত করলেন। এইগুলি ছিল মিল্‌ক বা সম্পত্তি থেকে আয়, ইনাম বা পুরস্কার হিসাবে প্রাপ্ত অর্থ, ইদ্রারাৎ বা অবসরকালীন ভাতা এবং ওয়াকফ বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান থেকে অর্থাগম। প্রজার কাছ থেকে নানাভাবে অর্থ শোষণের জন্য তিনি বহু সরকারী কর্মচারী নিযুক্ত করেছিলেন। এ ছাড়া ছিল একটি বিরাট গুপ্তচরবাহিনী। তাঁর আদেশে মদ্যপান নিষিদ্ধ হয়েছিল। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের গৃহে সমাবেশ নিষিদ্ধ হয়েছিল এবং এই সকল পরিবারের পারস্পরিক বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন সুলতানের অনুমতি সাপেক্ষ ছিল। এ ছাড়া রাজস্ব সংগ্রাহকদেরও সকল সুযোগ সুবিধা বাতিল করা হয়েছিল। এরা খুৎ (পরবর্তীকালের জমিদার), চৌধুরী (পরগণার প্রধান) ও মুকাদ্দম (গ্রামের মোড়ল) প্রভৃতি উপাধির দ্বারা পরিচিত ছিল। আলাউদ্দীনই প্রথম উৎপন্ন ফসলের ভিত্তিতে ভূমি রাজস্ব নির্ধারণের নীতি গ্রহণ করেছিলেন। এ ভিন্ন তিনি পশু পিছু চারণ-কর ও গৃহ-কর প্রবর্তন করেছিলেন। এই ভাবে রাজকোষে অবশ্য প্রচুর অর্থাগম হয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু এই অর্থনীতি কতটা সার্থক হয়েছিল বলা শক্ত। এটাও সত্য যে এই সকল নীতির প্রয়োগক্ষেত্রও ছিল একান্ত সীমাবদ্ধ, মোটামুটি কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলগুলি।

আরও একটি অভিনব ব্যবস্থা আলাউদ্দীন গ্রহণ করেছিলেন যার পরিকল্পনার জন্য তিনি অভিনন্দনযোগ্য, যদিও ফলাফলের জন্য নয়। তা হচ্ছে রেশনিং ব্যবস্থা। আলাউদ্দীনকে একটি বিরাট সৈন্যবাহিনী স্বাভাবিক ভাবেই পুষতে হত। তারা যাতে খেতে পরতে পায় সেটা দেখা সুলতানের অবশ্য কর্তব্য ছিল, কেননা সুলতানের অস্তিত্ব তাদের উপরেই নির্ভরশীল। ফলে তাদের কম দামে আহার ও জীবন ধারণের উপকরণ যোগান দেবার তিনি বন্দোবস্ত করলেন। কৃষক ও বণিকদের তিনি বাধ্য করলেন নিয়ন্ত্রিত মূল্যে পণ্য সরবরাহ করতে। ফলে ব্যবস্থাটা এই দাঁড়িয়েছিল যে তাঁদের বাইরে থেকে বেশি দামে মাল কিনে দিল্লীতে শস্তায় বিক্রী করতে হত। এই ব্যবস্থায় দিল্লীবাসীরা হয়ত কিছু রিলিফ পেয়েছিল, কিন্তু স্বাভাবিক কারণেই এই নীতি সাফল্য লাভ করতে পারেনি।

মঙ্গোল আক্রমণ: ১২৯৮-৯৯-এর মঙ্গোল আক্রমণের কথা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। ১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে চিতোর অভিযান থেকে সদ্য প্রত্যাবর্তনের

পরই আলাউদ্দীনকে একটি বিরাট মঙ্গোল আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তর্‌গীর নেতৃত্বে এই বাহিনী দিল্লী শহর ঘিরে ফেলেছিল। এদের মুখোমুখি হবার সামর্থ সেই মুহূর্তে আলাউদ্দীনের ছিল না। তিনি সিরি দুর্গে পিছু হটে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হন। সৌভাগ্যক্রমে মঙ্গোলরা দুর্গ অবরোধের কৌশল জানত না। তারা মাস দুয়েক দিল্লীর আশেপাশে থেকে মাঝে মাঝে শহর টহল দিয়ে ও লুটপাট করে ফিরে যায়। এই ঘটনা আলাউদ্দীনের চোখ খুলে দেয় এবং তিনি সীমানা সুরক্ষার জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

১৩০৫ খ্রীষ্টাব্দে আলি বেগের নেতৃত্বে অপর একটি মঙ্গোল বাহিনী সিন্ধু অতিক্রম করে, দিল্লীর দিকে অগ্রসর না হয়ে, দোয়াব অঞ্চল ও অবধের দিকে অভিযান করে। আলাউদ্দীন তাদের বিরুদ্ধে মালিক নায়ককে প্রেরণ করেন। আমরোহা নামক স্থানে ১৩০৫-এর ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে মঙ্গোলবাহিনী পর্যুদস্ত হয়। পর বৎসর (১৩০৬) এই পরাজয়ের প্রতিশোধের জন্যই মঙ্গোলরা একটি দ্বিমুখী অভিযান চালায়। একটি বাহিনী কাবকের নেতৃত্বে সিন্ধু অতিক্রম করে মূলতানের মধ্য দিয়ে ইরাবতী অভিমুখে অগ্রসর হয়, অপরটি ইকবাল এবং তাইবুর নেতৃত্বে দক্ষিণমুখী হয়ে নাগপুরের দিকে অগ্রসর হয়। আলাউদ্দীন মালিক নায়েব কাফুরের উপর মঙ্গোলদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার দায়িত্ব দেন, এবং তাঁর সহকারী হন গাজী মালিক তুঘলক। মঙ্গোলদের উভয় বাহিনীই পরাজিত হয়। ১৩০৬-এর পর বেশ কিছুকাল মঙ্গোল আক্রমণ বন্ধ ছিল, কেননা ওই বৎসর মঙ্গোল খানের (দুওয়া খান ১২৭৪-১৩০৬, যাঁর শাসনকেন্দ্র ছিল ট্রান্স অক্সিয়ানা অঞ্চল) মৃত্যুর পর তাদের নিজেদের ব্যবস্থাই অগোছাল হয়ে ওঠে। এই সুযোগে আলাউদ্দীন নিযুক্ত দীপালপুরের শাসক গাজী মালিক মঙ্গোলদের উপর পাল্টা ছোট-খাট আক্রমণ চালিয়ে যান।

বরঙ্গল, চিতোর ও মালবে অভিযান: ১৩০২ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে আলাউদ্দীন ফকরুদ্দীন জৌনার নেতৃত্বে বরঙ্গলে একটি অভিযান প্রেরণ করেন। এই বাহিনী সোজা পথ দিয়ে না গিয়ে, কারা থেকে বঙ্গদেশের প্রান্ত ও উড়িষ্যার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়। সম্ভবত এটি ছিল দ্বিমুখী অভিযান, একটি বাংলার সুলতান সামসুদ্দীন ফিরুজের বিরুদ্ধে, যিনি ইতিমধ্যেই স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন, এবং অপরটি ছিল বরঙ্গলের বিরুদ্ধে। প্রথমটির ফলাফল জানা যায় না, কিন্তু বরঙ্গলে আলাউদ্দীনের বাহিনী পরাজিত হয়ে প্রত্যাবর্তন করে।

১৩০৩-এর ২০শে জানুয়ারী তারিখে আলাউদ্দীন চিতোর অভিযান করেন।

রাণা রতন সিংহের রক্ষণাধীন চিতোর দুর্গ তিনি সাতমাস অবরুদ্ধ করে রাখেন। ২৬শে অগস্ট তারিখে চিতোরের পতন হয়। আলাউদ্দীন তাঁর পুত্র খিজির খানকে চিতোর শাসনের ভার দেন। কিন্তু ক্রমাগত রাজপুত বিদ্রোহের সম্মুখীন হয়ে খিজির শেষ পর্যন্ত ১৩১১-১২ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর জালোরের রাজার ভাই মালদেব দিল্লীর সামন্ত হিসাবে চিতোরের শাসক হন। কিন্তু তাঁর পুত্রের আমলে শিশোদীয় রাণা হম্মীর চিতোর ও সমগ্র মেবার অধিকার করেন।

১৩০৫ খ্রীষ্টাব্দে আলাউদ্দীন মুলতানের শাসক আইন-উল-মুল্‌ককে মালব অভিযানে প্রেরণ করেন। রাজা মহ্‌লকদেব ও কোক (গোগ) প্রধানের নেতৃত্বাধীন মালব বাহিনী পরাস্ত হয়। আলাউদ্দীনের বাহিনী অতঃপর মাণ্ডুর দুর্গ অবরোধ করে। মাণ্ডুর পতন হয় ২৪শে নভেম্বর (১৩০৫)। অতঃপর উজ্জয়িনী, ধার ও চান্দেরী অধিকৃত হয়। আইন-উল-মুল্‌ক মালবের শাসক নিযুক্ত হন।

দেবগিরি অভিযান : জালালুদ্দীনের রাজত্বকালে তাঁর অনুমতি না নিয়েই আলাউদ্দীন দেবগিরি অভিযান করেছিলেন। দেবগিরির লুণ্ঠিত সম্পদই কার্যত আলাউদ্দীনকে দিল্লীর মসনদে বসতে সাহায্য করেছিল। দেবগিরির শাসক রামচন্দ্র-দেব চুক্তিমত আলাউদ্দীনকে করপ্রদান করতে অক্ষম হয়েছিলেন। মতান্তরে তাঁর পুত্র সিংঘন তাঁর পিতাকে করপ্রদান থেকে নিবৃত্ত করেছিলেন। ফলে আলাউদ্দীন দ্বিতীয়বার দেবগিরি অভিযান করেন। এই অভিযানের সময় কাল নিয়ে সংশয় আছে। এটা ১২৯৪ খ্রীষ্টাব্দেও হতে পারে। ১৩০৭ খ্রীষ্টাব্দেও হতে পারে। এই অভিযানের অধিনায়কত্ব করেন মালিক কাফুর, যিনি পরে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হয়ে উঠেছিলেন। রামচন্দ্র সহজেই পরাজিত হন এবং প্রচুর ধনরত্নসহ তিনি দিল্লীতে নীত হন। আলাউদ্দীন তাঁর সঙ্গে সদয় ব্যবহার করেন ও তাঁকে রাই-রায়ান উপাধি দেন। ছয়মাস দিল্লীবাসের পর রামচন্দ্র দেবগিরিতে প্রত্যাবর্তন করেন। দেবগিরি ছাড়াও নাসারির শাসনকর্তৃত্ব আলাউদ্দীন তাঁর উপর অর্পণ করেন। অতঃপর রামচন্দ্রও আলাউদ্দীনের অনুগত ছিলেন এবং মালিক কাফুরের দক্ষিণ ভারত অভিযানে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন।

রাজস্থান ও বরঙ্গলে দ্বিতীয় অভিযান : ১৩০৮ খ্রীষ্টাব্দে আলাউদ্দীন সিওয়ানের শীতলদেবের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেন এবং কামালুদ্দীন গুর্গকে সেখানকার শাসকপদে নিযুক্ত করেন। ওই একই সময়ে তিনি জালোর অধিকার করেন, যদিও

কাজটি খুব সহজ হয়নি। জালোরের শাসক কানূহরদেব প্রবল প্রতিরোধ করেছিলেন। এরপর রাজস্থানে আলাউদ্দীন আর কোন অভিযান প্রেরণ করেন নি।

বরঙ্গলে প্রথমবার ব্যর্থ হবার পর ১৩০৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয়বার অভিযান প্রেরিত হয় মালিক কাফুরের নেতৃত্বে। এই অভিযানে কাফুর দেবগিরির রামচন্দ্রের সহায়তা পেয়েছিলেন। কাফুর প্রথমে তেলেঙ্গনায় পৌঁছে সিরবর (সিরপুর) দুর্গ দখল করেন। এবং তারপর তিনি বরঙ্গলের নিকটস্থ হনুমানকোণ্ডায় ঘাঁটি স্থাপন করেন। ১৩১০ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে জানুয়ারী তারিখে বরঙ্গলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত বরঙ্গলের কাকতীয় বংশীয় রাজা প্রতাপ-রুদ্র বশ্যতা স্বীকার করেন প্রচুর ধনরত্ন উপঢৌকন দিয়ে। ১১ই জুন তারিখে কাফুর বিজয়গর্বে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেন।

সুদূর দক্ষিণে অভিযান: দক্ষিণ ভারতের সুদূরতম প্রান্ত মা'বার বা পাণ্ড্যরাজ্যের ধনৈশ্বর্যের প্রলোভনে আকৃষ্ট হয়ে কাফুর ১৩১১ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী পুনরায় দেবগিরিতে উপস্থিত হন। তাঁর মিত্র দেবগিরির রামচন্দ্রের সঙ্গে দ্বারসমুদ্রের হোয়সল বংশীয় রাজা তৃতীয় বল্লালের সদ্ভাব ছিল না। কাজেই তিনি দ্বারসমুদ্র অভি-যানে কাফুরকে উৎসাহিত করলেন। হোয়সলরাজ তৃতীয় বল্লাল তখন পাণ্ড্যদেশে ব্যস্ত, কেননা সেখানে দুই ভাই বীরপাণ্ড্য এবং সুন্দর পাণ্ড্যের মধ্যে গৃহবিবাদ চলছিল, যে সুযোগে তিনি একটু নিজের এলাকা সম্প্রসারণের মতলব করেছিলেন। ইতিমধ্যে কাফুর দ্বারসমুদ্রে হাজির হলে (২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৩১১), বল্লাল তাড়াতাড়ি রাজধানী ফিরে আসেন, এবং বুদ্ধিমানের মত রামচন্দ্র ও প্রতাপ-রুদ্রের পদাঙ্ক অনুসরণ করে দিল্লীতে বার্ষিক করপ্রদানের বিনিময়ে সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত করেন।

অতঃপর কাফুর মা'বার বা পাণ্ড্যরাজ্যে উপস্থিত হন (১১ই মার্চ ১৩১১)। গৃহবিবাদ মত্ত দুই ভাই বীর পাণ্ড্য ও সুন্দর পাণ্ড্য কিন্তু বিচক্ষণতার কাজ করেন। অন্যান্য রাজাদের মত দুর্গে আবরুদ্ধ না থেকে তাঁরা চোরাগোপ্তা আক্রমণ চালিয়ে কাফুরের বাহিনীকে ব্যতিবস্ত করে তোলেন। তাঁদের খুঁজে বার করার সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়। উল্টে মাদুরায় তিনি এই দুই ভাই-এর পিতৃব্য বিক্রম পাণ্ড্যের হাতে পরাজিত হন। যুদ্ধে সাফল্যলাভ না করলেও পাণ্ড্যরাজ্য থেকে কাফুর প্রভূত ধনরত্ন লুণ্ঠন করতে সক্ষম হন। ১৩১১ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে অক্টোবর কাফুর দিল্লীতে ফিরে আলাউদ্দীন কর্তৃক রাজকীয়ভাবে অভ্যর্থিত হন। কাফুর হোয়সলরাজ তৃতীয়

বল্লালের পুত্রকে সঙ্গে এনেছিলেন। আলাউদ্দীন তাঁকে সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করেন, এবং কিছুকাল দিল্লীতে রেখে স্বদেশে পাঠিয়ে দেন।

রাজত্বকালের শেষ পর্যায়ঃ আলাউদ্দীনের রাজত্বকালের শেষ পর্যায়টি বিদ্রোহ, চক্রান্ত ও বিশ্বাসহীনতার দ্বারা চিত্রিত। আলাউদ্দীন স্বহস্তে তাঁর বিরুদ্ধে যে সর্বশেষ বিদ্রোহ দমন করেছিলেন তা ছিল নব-মুসলিমদের বিদ্রোহ। যে সকল মঙ্গোল ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেছিল এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল তারা নব-মুসলিম নামে পরিচিত ছিল। তাদের মধ্যে বহু অসন্তোষ ছিল। কোন সরকারী পদে তাদের গ্রহণ করা হত না, তাদের প্রচুর কর প্রদান করতে হত এবং নানা ধরনের উৎপীড়ন ভোগ করতে হত। ফলে একদল নব-মুসলমান আলাউদ্দীনকে হত্যার চক্রান্ত করে। এই চক্রান্তের বিষয় ফাঁস হয়ে যেতে আলাউদ্দীন ব্যাপক ভাবে নব-মুসলমান হত্যার আদেশ দেন। কুড়ি থেকে তিরিশ হাজার নব-মুসলমানকে হত্যা করা হয়, যদিও তাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল নির্দোষ।

এদিকে দেবগিরিতে ১৩১১ খ্রীষ্টাব্দে রামচন্দ্রের মৃত্যু ঘটলে তাঁর পুত্র সিংঘন বা শঙ্কর স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১৩১৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কাফুরের নিকট পরাজিত হন এবং দেবগিরি প্রত্যক্ষভাবেই দিল্লীর অধীনে আসে। কাফুর পাণ্ড্যরাজ্যেও একটি অভিযান করেন যার লক্ষ্য ছিল সুন্দর পাণ্ড্যকে সিংহাসনে বসানো, কেননা বীর পাণ্ড্য কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে সুন্দর পাণ্ড্য আলাউদ্দীনের সাহায্য প্রার্থনা করে-ছিলেন। ১৩১৫ খ্রীষ্টাব্দে আলাউদ্দীন অসুস্থ অবস্থায় জরুরী বার্তা পাঠিয়ে কাফুরকে দিল্লীতে ডেকে পাঠান।

আলাউদ্দীনের উত্তরাধিকার নিয়েও অন্তঃপুরে গভীর চক্রান্ত চলছিল। আলা-উদ্দীনের পুত্র খিজির খান ও তাঁর মা মালিকা-ই-জাহানের সঙ্গে কাফুরের বনিবনা ছিল না। মালিকা-ই-জাহানের ভাই গুজরাতের শাসনকর্তা আলপ খানের কন্যার সঙ্গে খিজিরের বিবাহ হয়, এবং এই বৈবাহিক সম্বন্ধের ফলে একটি শক্তিজোটের সৃষ্টি হয়। সুলতান আলাউদ্দীন তখন সম্পূর্ণ অশক্ত। কাফুর আলপ খানকে হত্যা করে এই সুযোগে নিজেই সর্বেসর্বা হয়ে বসেন। খিজির খানকে প্রথমে আমরোহা ও পরে গোয়ালিয়রে বন্দী করে রাখা হয়, তাঁর মাও দিল্লী দুর্গে বন্দিনী হন। এদিকে আলপ খানের হত্যার সংবাদে গুজরাতে বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং তা দমন করতে গিয়ে কাফুরের সহযোগী কামালুদ্দীন নিহত হন। চিতোরেও গণ্ডোগোল শুরু হয়।

দেবগিরি রামচন্দ্রের জামাতা হরপালদেবের নেতৃত্বে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এই সকল অবস্থার মধ্যে ১৩১৬ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারী তারিখে আলাউদ্দীন শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

৩॥ **মুবারক শাহ** (১৩১৬-১৩২০)

আলাউদ্দীনের মৃত্যুর পর কাফুর শিহাবুদ্দীন উমর নামক তাঁর এক নাবালক পুত্রকে সিংহাসনে বসিয়ে নিজে রাজপ্রতিনিধি হিসাবে কাজ চালাতে শুরু করেন। আলাউদ্দীনের অপর দুই পুত্র খিজির খান এবং সাদি খানকে কাফুর ইতিমধ্যে বন্দী ও অন্ধ করে রেখেছিলেন। আলাউদ্দীনের তৃতীয় পুত্র মুবারক খানকেও তিনি বন্দী করে রেখেছিলেন এবং তাঁকেও অন্ধ করার জন্য লোক পাঠিয়েছিলেন। মুবারক এই লোকগুলিকে তাঁর রত্নখচিত অলঙ্কারসমূহ উপহার দেন এবং আলাউদ্দীনের বংশের প্রতি তাদের কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে তাদের মধ্যে ভাবাবেগের সৃষ্টি করেন। ফলে তারা মুবারককে অন্ধ না করে ফিরে যায়, এবং তাদের মধ্যে চারজন মালিক কাফুরের ঘরে প্রবেশ করে তাঁকে হত্যা করে।

মুক্ত মুবারক দু-মাস নাবালক সুলতানের প্রতিনিধি হয়ে কাজ করেন, এবং তারপরই তাঁকে বন্দী ও অন্ধ করে ১৩১৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে এপ্রিল সিংহাসনে আরোহন করেন। শাসনভার গ্রহণের পর তিনি আলাউদ্দীনের আমলের কঠোরতা তুলে দেন, অসংখ্য বন্দী মুক্ত হয়, যারা সম্পত্তি হারিয়েছিল তারা তা ফেরত পায়। কিছুকাল একটা মুক্ত বায়ু বইতে শুরু করে। কিন্তু মুবারক ছিলেন একান্তই দুর্বল চরিত্রের, তদুপরি এক নম্বরের লম্পট। কার্যত তিনি দরবারকে একটি গণিকালয়ে পরিণত করেছিলেন।

১৩১৮ খ্রীষ্টাব্দে মুবারক দেবগিরি অভিযান করেন। রাজা হরপালদেব পরাজিত ও নিহত হন। মুবারক অতঃপর তাঁর অনুচর খুসরব খানকে (আসলে এই ব্যক্তিটি ছিল একজন গুজরাতী ক্রীতদাস, নাম হাসান, যাকে মুবারক ওয়াজির বা প্রধানমন্ত্রীর পদ দিয়েছিলেন) দেবগিরিতে বসিয়ে আসেন দক্ষিণে আরও অভিযান চালাবার জন্য। খুসরব বরঙ্গলের প্রতাপরুদ্রকে পরাজিত করে অপমানজনক শর্তে সন্ধি করতে বাধ্য করেন। পাণ্ড্যরাজ্যে তিনি অভিযান করেছিলেন। কিন্তু বিশেষ সুবিধা করতে পারেন নি।

এদিকে মুবারকের কুশাসন ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতার জন্য কয়েকটি চক্রান্ত হয়। ফলে মুবারক কয়েকজন বিশিষ্ট পদাধিকারী এবং অন্ধ অবস্থায় বন্দী আলাউদ্দীনের তিন

পুত্রকে হত্যা করেন। ইতিমধ্যে খুসরব দিল্লীতে ফিরে আসেন। তাঁর মতলব ভাল ছিল না। শুভার্থীরা মুবারককে সাবধান করে দিলেও, তিনি তাদের কথায় কান না দিয়ে খুসরবেরই ক্রীড়নক হয়ে পড়েন। সুযোগ বুঝে খুসবর একদিন রাত্রে রাজান্তঃপুরে গোপন অভিযান চালিয়ে মুবারককে হত্যা করেন (১৫ই এপ্রিল ১৩২০) এবং নাসিরুদ্দীন খুসরব শাহ নাম নিয়ে সিংহাসনে আরোহন করেন। মুবারকের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে খলজী বংশের অবসান ঘটে।

8॥ নাসিরুদ্দিন খুসরব

নূতন সুলতান পূর্বে হিন্দু ছিলেন, পরে ইসলামধর্ম অবলম্বন করেছিলেন। সিংহাসন লাভ করার পর তিনি পুরাতন পদাধিকারীদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করেন নি, এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক শাসনকর্তার আনুগত্যও লাভ করেছিলেন। কিন্তু একটি ক্ষুদ্র অথচ শক্তিশালী গোষ্ঠী, তাঁকে অপসারিত করতে বদ্ধ পরিকর হয়েছিল যেহেতু তিনি খানদানী ছিলেন না। এই গোষ্ঠীর নেতা ছিলেন দীপালপুরের শাসক গাজী মালিক তুঘলক। তিনি উচ, মুলতান, সেহওযান, সামান, এবং জালোরের শাসনকর্তাদের ও দিল্লির-আইনুল-মুল্‌ককে নিয়ে খুসরব-বিরোধী একটি জোট গঠন করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু একমাত্র উচের শাসক বহরাম অইবা ছাড়া আর কারো সমর্থন পান নি।

মুলতানের শাসক গাজী মালিকের সঙ্গে সহযোগিতা করতে অস্বীকার করলে গাজী মালিক কৌশলে তাঁর সৈন্যদলকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে তাঁকে হত্যা করান। খুসরবের প্রতি অনুগত সামানের শাসক ইয়াকলাখী গাজী মালিকের বিরুদ্ধে অগ্রসর হলে তাঁর নিজের লোকেরাই তাঁকে হত্যা করে। এই সকল ঘটনা প্রমাণ করে যে গাজী মালিক অপরাপর প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের দপ্তরে নিজের অনুগত লোক রেখেছিলেন। যাইহোক গাজী মালিক দিল্লীর দিকে অগ্রসর হলে খুসরব পাল্টা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হন। ইন্দ্রপত নামক স্থানে ১৩২০-র ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে খুসরব পরাজিত হন ও তাঁকে নিহত করা হয়। দুই দিন পরে ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে গাজী মালিক গিয়াসুদ্দীন তুঘলক নাম নিয়ে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহন করেন।

চতুর্থ অধ্যায়

ব্যাপ্তি ও বিশৃংখলা

১॥ তুঘলক বংশ : গিয়াসুদ্দীন (১৩২০-২৫)

নাসিরুদ্দীন খুসরবকে হত্যা করে গিয়াসুদ্দীন তুঘলক ১৩২০ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সুলতানীতে অধিষ্ঠিত হন। প্রথমেই তিনি দাক্ষিণাত্যে দিল্লী সুলতানীর হৃত অধিকার পুনরুদ্ধারে যত্নবান হন।

দিল্লীর বিশৃংখলার সুযোগে বরঙ্গলের কাকতীয় বংশীয় শাসক প্রতাপরুদ্র স্বাধীনতা ঘোষণা করেন, এবং নিজ রাজত্বের সীমাবর্ধনের জন্য কয়েকটি যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হন। দিল্লীর শক্তি সম্পর্কে তাঁর উদাসীনতার মূল্য তাঁকে দিতে হয়। ১৩২১-২২ খ্রীষ্টাব্দে গিয়াসুদ্দীন তাঁর পুত্র জৌনা খানকে (অপর নাম উলুঘ খান) তাঁর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। যথারীতি প্রতাপ রুদ্র পরাজিত হয়ে সন্ধির জন্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু জৌনা খান এই প্রার্থনায় কর্ণপাত না করে বরঙ্গলের দুর্গ অবরোধ আরও জোরদার করেন। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক জৌনা খানের বাহিনীতে ভাঙন ধরে এবং নানা অন্তর্বিরোধ দেখা যায়। ফলে বাধ্য হয়ে জৌনা খানকে রীতিমত ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে প্রত্যাবর্তন করতে হয়। দেবগিরিতে নিজেকে কিছুটা গুছিয়ে নিয়ে জৌনা খান পুনরায় বরঙ্গল আক্রমণ করেন। সম্ভবত এই যুদ্ধে প্রতাপরুদ্র পরাজিত হয়েছিলেন। তবে গুণ্টুরে প্রাপ্ত ১৩২৬ খ্রীষ্টাব্দের একটি লেখে প্রতাপরুদ্র রাজা হিসাবে উল্লিখিত হয়েছেন, যা থেকে অনুমান করা যায় যে, হয় তিনি দিল্লীর সামন্ত-রাজা হিসাবে শাসনকার্য চালাচ্ছিলেন, না হয় স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন।

সম্ভবত বরঙ্গলে এই দ্বিতীয় অভিযানে সাফল্য লাভের পর জৌনা খান পাণ্ড্যদেশ বা মা'বার অধিকার করেছিলেন, কেননা সেখানকার স্থানীয় সূত্র থেকে জানা যায় যে ১৩২৩ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর একটি বাহিনী ওই অঞ্চল দখল করেছিল। জৌনা খান দক্ষিণ ভারতের পূর্ব উপকূলেও অভিযান করেছিলেন। রাজমন্দ্রীতে প্রাপ্ত একটি লেখ থেকে যায় যে ওই স্থানটি ১৩২৪ খ্রীষ্টাব্দে উলুঘ খানের (জৌনার অপর নাম) অধীনে ছিল। সম্ভবত এখান থেকেই জৌনা খান উড়িষ্যার দিকে অগ্রসর হন। রাজা দ্বিতীয় ভানুদেব তাঁর আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে পরাস্ত হন, একথা বলেছেন

ঐতিহাসিক ইসামি। কিন্তু চতুর্থ নরসিংহের পুরী শাসনসমূহে দ্বিতীয় ভানুদেব সম্পর্কে বলা হয়েছে যে তিনি গিয়াসুদ্দীন তুঘলকের উপর বিজয়লাভ করেছিলেন। এই পরস্পর বিরোধী দাবি থেকে মনে হয় যে উড়িষ্যায় তুঘলকদের প্রত্যাশিত সাফল্য ঘটেনি।

জৌনা খান ১৩২৪ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে দিল্লী ফিরে যাবার পরই উত্তর-পশ্চিমের সামান প্রদেশে মঙ্গোল আক্রমণ ঘটে। কিন্তু দিল্লীর সেনাবাহিনী তাদের বিরুদ্ধে দু'বার জয়লাভ করলে তারা হটে যায়। এর কিছু পূর্বে গুজরাতে পারওয়ারী-দের একটি বিদ্রোহ দমিত হয়। ১৩২৪ এর গোড়াতেই গিয়াসুদ্দীন বাংলাদেশকে শায়েস্তা করার একটি পরিকল্পনা করেন, কেননা বাংলাদেশ দিল্লীর অধিকার অস্বীকার করেছিল। জৌনা খানের উপর দিল্লীর দায়িত্ব অর্পণ করে গিয়াসুদ্দীন স্বয়ং বাংলা-দেশে অভিযান করেন। বাংলার সুলতান (তাঁর নাম গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর) পরাজিত ও বন্দী হন। তিনি জনৈক নাসিরুদ্দীনকে উত্তরবঙ্গের লখনাওতির শাসক নিযুক্ত করেন। পূর্ববঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ (রাজধানী যথাক্রমে সোনারগাঁও এবং সাতগাঁও) তাঁর পালিত পুত্র বহরাম খানের উপর অর্পিত হয়। বাংলাদেশ থেকে প্রত্যাবর্তন কালে তিনি উত্তর বিহারের তিরহুতের রাজা হরিসিংহকে পরাজিত করেন, কিন্তু তিরহুত বশীভূত হবার আগেই যে কোন কারণেই হোক তিনি দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করেন।

দিল্লী প্রত্যাবর্তনের পথে আফগানপুর নামক স্থানে একটি অভ্যর্থনা সভায় ভারী কাঠের ছাদ চাপা পড়ে গিয়াসুদ্দীন ১৩২৫ খ্রীষ্টাব্দে নিহত হন। এটি দুর্ঘটনা না পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড বলা শক্ত। সে যাই হোক, অত্যল্পকাল রাজত্ব করা সত্ত্বেও গিয়াসুদ্দীন নিজেকে যোগ্য শাসক হিসাবে প্রমাণিত করেছিলেন। ভূমি রাজস্ব প্রথার তিনি কিছুটা সংস্কার করেছিলেন। খরা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক কারণে উৎপাদন বিঘ্নিত হলে কর-আদায়ে যাতে নির্মমতা অবলম্বন না করা হয় সে বিষয়ে সরকারী কর্মচারী ও জায়গীরদারদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। পূর্ববর্তী আমলে পদা-ধিকারী ও সামন্তদের অর্জিত বে-আইনী অর্থ ও জমি তিনি ফেরৎ দিয়েছিলেন। লোক নিয়োগের ক্ষেত্রে তিনি যোগ্যতাকেই একমাত্র গুরুত্ব দিয়েছিলেন, যার ফলে তাঁর প্রশাসন অনেকটা দুর্নীতিমুক্ত ছিল। শাসন ও সামাজিক অপরাধের ক্ষেত্রে তিনি শরিয়তী বিধানবলী মেনে চলতেন।

২ ॥ মহম্মদ বিন তুঘলক (১৩২৫-৫১)

গিয়াসুদ্দীনের মৃত্যুর তিন দিন পরে তাঁর পুত্র জৌনা খান দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর সিংহাসনারোহণের ব্যাপারে কোন অশান্তি ঘটে নি। এই সুলতান সম্পর্কে তৎকালীন ঐতিহাসিকগণ পরস্পরবিরোধী নানা কথা বলেছেন, এবং এটা খুবই বিস্ময়ের যে এই সকল রচনায় তাঁর আমলের অনেক ঘটনা উল্লিখিত হলেও সেগুলির কার্যকারণ সম্পর্ক বা তারিখ সম্পর্কে কিছু জানা যায় না।

দাক্ষিণাত্য বিজয়: গিয়াসুদ্দীন তুঘলকের ভাগ্নে বহারুদ্দীন গুরশাস্প দাক্ষিণাত্যের গুলবর্গার নিকটবর্তী সাগরের শাসক ছিলেন। ১৩২৬-২৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিদ্রোহী হন। দিল্লীর রাজকীয় বাহিনী তাঁকে দেবগিরিতে পরাস্ত করলে তিনি কম্পিলীর হিন্দু রাজার আশ্রয় নেন। এই রাজ্যটি গঠিত ছিল বেলারী, রায়-চুর এবং ধারওয়ার জেলাত্রয় নিয়ে। গোড়ায় যাদবদের অধিকারে থাকলেও, পরে কম্পিলীর শাসক স্বাধীনতা ঘোষণা করেন, এবং মালিক কাফুরের আক্রমণ সাফল্যের সঙ্গে প্রতিহত করেন। মুহম্মদ বিন তুঘলক কম্পিলীতে অভিযান করলে কম্পিলীদেব (এই নামেই ওখানকার শাসক মুসলিম ঐতিহাসিকদের রচনায় উল্লিখিত) দু'বার রাজকীয় বাহিনীকে পরাস্ত করেন। তৃতীয় বারের যুদ্ধে তিনি অবশ্য পরাজিত ও নিহত হন। কম্পিলী দিল্লী সুলতানীর অঙ্গীভূত হয়, এবং মালিক মুহম্মদের অধীনে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশরূপে গণ্য হয়। কম্পিলী থেকে যাঁদের বন্দী করে দিল্লী নিয়ে যাওয়া হয় তাঁদের মধ্যে হরিহর ও বুক্ক নামে দুই ভাই ছিলেন, পরবর্তীকালে যাঁরা বিজয়নগর রাজ্যের পত্তন করেছিলেন।

কম্পিলীদেব মৃত্যুর পূর্বে বহারুদ্দীন গুরশাস্পকে হোয়সলরাজ তৃতীয় বল্লালের নিকট পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে দিল্লীর রাজকীয় বাহিনীর সঙ্গে বল্লালের সংঘর্ষ হয়েছিল। ঐতিহাসিক ফিরিশ্‌তার মতে তৃতীয় বল্লাল গুরুশাস্পকে পূর্বেই দিল্লীর হাতে সমর্পণ করে দিয়ে সংঘর্ষ এড়িয়ে ছিলেন, আবার কারো কারো মতে ১৩২৭ খ্রীষ্টাব্দের যুদ্ধে দ্বারসমুদ্র বিধ্বস্ত হয়েছিল। তবে ১৩২৮ খ্রীষ্টাব্দের একটি লেখে বল্লালকে স্বাধীন রাজা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মনে হয় একটা প্রাথমিক সংঘর্ষের পর বল্লাল গুরশাস্পকে সমর্পণ করে দিল্লীর সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসেন। গুরশাস্পকে অত্যন্ত নৃশংসতার সঙ্গে হত্যা করা হয়। তাঁর মাংস রান্না করে তাঁর স্ত্রীপুত্রের নিকট পাঠানো হয়।

মুহম্মদ বিন তুঘলকের আমলে বরঙ্গল এবং মাদুরা, হোয়সলদের বৃহৎ রাজ্যাংশ ও ও তৎসহ কম্পিলী দিল্লী সুলতানীর অধীনে আসে। বস্তুত কাশ্মীর, উড়িষ্যা, রাজস্থান ও মালাবার অঞ্চলের কিছুটা অংশ ছাড়া সারা ভারতেই দিল্লী সুলতানীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ব্যাপ্তির পাশাপাশি একটা মস্তবড় ব্যর্থতাও ছিল, যা দিল্লীর সুলতানীকে ক্রমশ একটি ক্ষয়িষ্ণু প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছিল, যা আমরা শীঘ্রই দেখব।

করবৃদ্ধি, রাজধানী পরিবর্তন ও নূতন মুদ্রা ব্যবস্থা: ১৩২৫ থেকে ১৩২৭ এর মধ্যে সুলতান দোয়াব অঞ্চলের (গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী স্থান) ভূমিরাজস্ব বিপুলভাবে বাড়িয়ে দেন। ফলে কৃষকদের মধ্যে বিদ্রোহ ও বিক্ষোভ দেখা দেয়, এবং একই সময় প্রচণ্ড খরার কারণে খাদ্যোৎপাদন পর্যাপ্ত না হওয়ায় দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হয়। সমসাময়িক ঐতিহাসিকগণ বিষয়টিকে একটু অতিরঞ্জিত করে দেখালেও একথা ঠিক যে সুলতান দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িতদের জন্য কোন বন্দোবস্তই করেন নি, করভারও লাঘব করেন নি, এবং পলাতক বিদ্রোহী কৃষকদের ধরে এনে নির্মমভাবে শাস্তি দিতে কুণ্ঠিত হন নি।

১৩২৬-২৭ খ্রীষ্টাব্দে মুহম্মদ বিন তুঘলক দিল্লী থেকে রাজধানী দেবগিরিতে স্থানান্তরিত করেন। এই পরিবর্তনের পিছনে একটা বড় যুক্তি ছিল যে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতকে একসঙ্গে সামলাতে গেলে রাজধানী দিল্লীতে রাখা সমীচীন নয়। কিন্তু সেই উদ্দেশ্যে সাধনের জন্য যে ধরনের দীর্ঘকালীন ও পরিকল্পিত প্রস্তুতির প্রয়োজন তা না করে তিনি দিল্লীবাসীদের দেবগিরি (নূতন নাম দৌলতাবাদ) যাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন, যার ফলে একটা অবর্ণনীয় বিশৃংখল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল, এবং জনজীবনে দারুন বিপর্যয় নেমে এসেছিল। তৎকালীন ঐতিহাসিকেরা, যেমন জিয়াউদ্দীন বরণী, ইবন বতুতা প্রভৃতিরা, বলেছেন যে দিল্লী শহর থেকে সকল অধিবাসীকে সরানো হয়েছিল এবং শহরটিকে ধ্বংস করা হয়েছিল। একথা ঠিক নয়। কার্যত দিল্লী গৌণ-রাজধানী হিসাবে বর্তমান ছিল, সুলতানী মুদ্রারও প্রচলন ঘটত এখান থেকে।

মুহম্মদ বিন তুঘলকের আর একটি কীর্তি বা অপকীর্তি মুদ্রা ব্যবস্থার সংস্কার, অর্থনীতির ভাষায় স্ট্যাণ্ডার্ড-মানির (মানানুগ মুদ্রা) বদলে টোকেন-মানির (প্রতীকী মুদ্রা) ব্যবহার। এ প্রথা পারস্য ও চীনে বর্তমান ছিল, এবং যুক্তির দিক থেকে এই প্রথা প্রচলনের বিরুদ্ধে আপত্তির কোন কারণই ছিল না। ১৩২৯-৩০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ

সুলতান এক শ্রেণীর তাম্রমুদ্রার প্রচলন ঘটিয়েছিলেন যে মুদ্রাগুলি ১৪০ গ্রেন ওজনের রূপার টঙ্কা বা মুদ্রার প্রতীকী-মুদ্রা হিসাবে ঘোষিত হয়েছিল। কিন্তু এই বিকল্প-মুদ্রাব্যবস্থা কার্যকর করতে গেলে দেশজোড়া যে রকম সংগঠন ও উচ্চমানের দক্ষতা ও কলাকৌশল প্রয়োজন, তার প্রচুর ঘাটতি ছিল। ফলে জাল তাম্রমুদ্রায় দেশ ভরে গিয়েছিল, এবং প্রতিটি তাম্রমুদ্রার বিনিময়ে সুলতানকে রাজকোষ থেকে নগদ রৌপ্যমুদ্রা দিতে হয়েছিল। বিদেশী বণিকরা সরকারকে তাদের প্রদেয় তাম্রমুদ্রায় দিত,তাদের স্থানীয় খরচপত্রও নির্বাহ হত তাম্রমুদ্রায়, কিন্তু তারা তাদের জিনিসের দাম গ্রহণ করত রৌপ্যমুদ্রায়। এই ব্যবস্থার অত্যন্ত বিরূপ প্রতিক্রিয়া রাজকোষের উপর হয়েছিল।

উত্তরপশ্চিমে ও বঙ্গদেশে বিদ্রোহ: ১৩২৭-২৮ খ্রীষ্টাব্দে মুহম্মদ বিন তুঘলক পুনার নিকটবর্তী কোন্দন দুর্গ অধিকার করেন। পরবর্তীকালে এই দুর্গটি সিংহগড় নামে পরিচিত হয়েছিল। এটি ছিল কোলি উপজাতিদের অধীনে।

কিন্তু ওই বছরেই সুলতানকে কিশলুখানের বিদ্রোহের মোকাবিলা করতে হয়। এই কিশলু খান ছিলেন গিয়াসুদ্দীন তুঘলকের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং উচ, সিন্ধু ও মুলতানের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক। তাঁর বিদ্রোহের কারণ স্পষ্ট জানা যায় না, সম্ভবত সুলতানের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে তাঁর বনিবনা হয়নি। মুহম্মদ বিন তুঘলক অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে এই বিদ্রোহ দমন করেন। কিসলু খানকে হত্যা করা হয়।

বঙ্গদেশকে সুলতান তিনটি শাসনকেন্দ্রে বিভক্ত করেছিলেন—লখ্‌নাওতি, সোনার-গাঁও এবং সাতগাঁও। পূর্ববর্তী সুলতান গিয়াসুদ্দীন, নাসিরুদ্দীন নামক এক ব্যক্তিকে লখ্‌নাওতির শাসক হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন। মুহম্মদ বিন তুঘলক তাঁর ঘাড়ে কদর খান নামক এক ব্যক্তিকে যুগ্ম-শাসক হিসাবে চাপিয়ে দেন। অনুরূপভাবে সোনারগাঁও-এর শাসক বহ্‌রামের ঘাড়ে তিনি চাপান গিয়াসুদ্দীন বাহাদুরকে। এই লোকটিকে পূর্ববর্তী সুলতান বিদ্রোহের দায়ে বন্দী করে দিল্লীতে রেখে দিয়েছিলেন। যাইহোক, গিয়াসুদ্দীন আবার বিদ্রোহ করেন (১৩২৭-২৮)। বহরাম খানের নিকট তিনি পরাজিত হন। তিনি তাঁর গায়ের চামড়া খুলে নিয়ে তা সুলতানের নিকট পাঠিয়ে দেন।

রাজস্থানে বিপর্যয়: যখন মুহম্মদ বিন তুঘলক তাঁর নানাবিধ পরিকল্পনা ও যুদ্ধবিগ্রহে ব্যস্ত সেই অবসরে ১৩২৬ খ্রীষ্টাব্দে রাণা হমীর চিতোর দখল করেন এবং ক্রমশ সমগ্র মেবার অধিকার করে মহারাণা উপাধি গ্রহণ করেন। চৌহান (চাহমান)

বংশীয় মালদেবের পুত্র জৈজা যিনি সুলতানের সামন্ত হিসাবে মেবার শাসন করছিলেন, মুহম্মদ বিন তুঘলকের কাছে দরবার করেন। সুলতানী বাহিনী সিঙ্গোলি নামক স্থানে পরাজিত হয়। মেবারের এই স্বাধীন প্রতিষ্ঠার পর অপরাপর রাজপুত রাজ্যগুলিও তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে।

মঙ্গোল আক্রমণ: ১৩২৭ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ মঙ্গোলদের চাঘতাই গোষ্ঠির নেতা তর্মাশিরীন বিরাট বাহিনী নিয়ে ভারতে অভিযান করেন। ঐতিহাসিক ফিরিশ্‌তার মতে তিনি লমঘান ও মুলতান জয় করে দিল্লীর উপকণ্ঠে উপস্থিত হন। সুলতান অনন্যোপায় হয়ে তর্মাশিরীনকে বহু অর্থ দিয়ে বিদায় করেন। ফিরতি পথে তর্মাশিরীন গুজরাত ও সিন্ধু লুণ্ঠন করেন। ভিন্নমতে, মঙ্গোলবাহিনীর প্রত্যাবর্তন কালে সুলতান নিজস্ব বাহিনী নিয়ে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেছিলেন কলনোর পর্যন্ত কিন্তু কোন প্রত্যক্ষ সংগ্রাম হয় নি। তৈমুরের আত্মজীবনীতেও এই মঙ্গোল অভিযানের উল্লেখ আছে।

বহির্ভারতে অভিযান পরিকল্পনা ও হিমালয় অঞ্চলে অভিযান: মঙ্গোল আক্রমণের অব্যবহিত পরেই মুহম্মদ বিন তুঘলক ট্রান্স-অক্সিয়ানা, খুরাসান ও ইরাক জয়ের পরিকল্পনা করেন এবং এই উদ্দেশ্যে একটি বিপুল সেনাবাহিনী গঠন করেন। এক বছর ধরে ওই সেনাবাহিনী পোষার পর তিনি এই পরিকল্পনা বাতিল করেন যার ফলে তাঁর প্রচুর আর্থিক ক্ষতি হয়। ১৩৩৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কাংড়া জেলার নগরকোট জয় করেন। তারপর তিনি হিমালয় অঞ্চলে একটি অভিযান করেন। ঐতিহাসিক ফিরিশ্‌তার মতে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল চীনদেশ জয় করা, কিন্তু এই উদ্দেশ্যের কথা অন্য কোন সমকালীন ঐতিহাসিক বলেন নি। বরনী এবং বতুতার মতে তাঁর এই অভিযানের লক্ষ্য ছিল কারাচল অঞ্চল, যা সম্ভবত বর্তমান কুমায়ুন এলাকা। সম্ভবত এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল, হিমালয় অঞ্চলের উপজাতীয় শক্তিগুলিকে বশে আনা, কেননা এই সকল দুর্গম স্থানে বিদ্রোহীরা পলায়ন করত এবং আশ্রয় পেত। সম্ভবত মোরাদাবাদ জেলার মধ্য দিয়ে এই অভিযান শুরু হয়েছিল এবং রাজকীয় বাহিনী হিমালয়ের সানুদেশে অবস্থিত জিদ্যা শহরটি সহজেই দখল করে। তারপর এই বাহিনী একটি সঙ্কীর্ণ গিরিপথ অবলম্বন করে উপরে উঠতে শুরু করে এবং একটি পার্বত্য শহর দখল করে। এই সবটাই ঘটে প্রায় বিনা প্রতিরোধে। অতঃপর বর্ষা-শুরু হলে প্রতিপক্ষ বিভিন্ন গোপন স্থান থেকে পাল্টা আঘাত হানতে আরম্ভ করে যার ফলে সুলতানের বাহিনী সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়। তথাপি এই বিরাট লোকক্ষয়ের বিনিময়ে

সুলতানের কিছু লাভ হয়। পাহাড়ীরা নিম্নভূমিতে চাষের অধিকার পাবে এই শর্তে তারা সুলতানের আনুগত্য মেনে নেয়।

দক্ষিণে বিদ্রোহ, নূতন শক্তিজোটের উদ্ভব ও বিজয়নগরের প্রতিষ্ঠা : ১৩৩৪-৩৫ খ্রীষ্টাব্দে মা'বার বা পাণ্ড্যদেশের শাসনকর্তা আহ্‌শন খান স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তাঁর রাজধানী ছিল মাদুরা। তাঁর বিরুদ্ধে প্রেরিত রাজকীয় সৈন্যবাহিনী পরাজিত হয়। সুলতান স্বয়ং তাঁকে শায়েস্তা করার জন্য দৌলতাবাদ ও বরঙ্গল হয়ে অগ্রসর হন। কিন্তু সৈন্যবাহিনীতে কলেরার আক্রমণে ব্যাপক মড়ক দেখা যায়। স্বয়ং সুলতান রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। এদিকে সংবাদ আসে দিল্লী ও মালবে দুর্ভিক্ষ লেগেছে ও লাহোরে বিদ্রোহ শুরু হয়ে গেছে। সুলতান বাধ্য হয়েই আহ্‌শন খানকে শাস্তি দেওয়া স্থগিত রেখে দিল্লী অভিমুখে রওনা হন। মা'বার অতঃপর স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়।

এদিকে তেলেঙ্গনা, অন্ধ্র ও কৃষ্ণ-তুঙ্গভদ্রা নদীর দক্ষিণে একটি নূতন শক্তিজোটের উদ্ভব হয়। এই শক্তিজোট হিন্দু প্রধানদের নিয়ে গঠিত ছিল। প্রোলয়-নায়ক নামক দক্ষিণ অন্ধ্র অঞ্চলের এক ব্যক্তি এর উদ্গাতা। এর সঙ্গে দু জন হাত মিলিয়েছিলেন। একজনের নাম প্রোলয়-বেম যিনি অদ্দাঙ্কি এবং কোণ্ডবিড়ুর রেড্‌ডি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা, অপর জন ছিলেন এরুবের তেলুগু-চোড় বংশীয় এক রাজ-কুমার। এঁরা অন্ধ্রের উপকূল অঞ্চল থেকে সুলতানী সৈন্যদের বিতাড়িত করেন। প্রোলয়-নায়ক পূর্ব-গোদাবরী জেলার ভদ্রাচলম তালুকের একপল্লী অঞ্চলে নিজের শক্তিকেন্দ্র গড়ে তোলেন। ১৩৩০ থেকে ১৩৩৫ এর মধ্যে কোন সময়ে প্রোলয় নায়কের মৃত্যু ঘটলে তাঁর ভাইপো কাপয় বা কনায় (কৃষ্ণ) নায়ক হোয়সলরাজ তৃতীয় বীরবল্লালের সহযোগিতায় বরঙ্গলের শাসক মালিক মকবুলকে বিতাড়িত করেন, এবং সমগ্র অন্ধ্র অঞ্চলটি সুলতানের হাতের বাইরে চলে যায়। অতঃপর কাপয় এবং বল্লাল মা'বার বা পাণ্ড্যদেশে অভিযান করেন এবং আহ্‌শন খানকে তোণ্ডইমণ্ডলম অঞ্চল থেকে বিতাড়িত করে সেখানে বেন্‌রুমনকোণ্ডান শাম্বুবরায়কে প্রতিষ্ঠিত করেন যাঁর রাজধানী হয় কাঞ্চী।

কৃষ্ণা নদী অববাহিকায় চালুক্য সোমেশ্বরদেব প্রোলয়-বেম এবং অপরাপর নেতৃ-বর্গের সমর্থনে শক্তি সঞ্চয় করেন এবং কম্পিলীর শাসক মালিক মুহম্মদকে পরাজিত করেন। মুহম্মদ বিন তুঘলক তখন হরিহর ও বুক্ককে, যাঁরা সুলতানের প্রথম কম্পিলী অধিকারের সময় ধৃত ও বন্দী হয়েছিলেন এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন,

কম্পিলীর শাসক ও উপশাসক করে পাঠান। তাঁরা তৃতীয় বল্লালের নিকট পরাজিত হন যিনি সোমদেবকে সাহায্য করতে এসেছিলেন। ভাগ্যবিপর্যয় সত্বেও হরিহর ও বুক তুঙ্গভদ্রার উত্তর তীরে আনেগুণ্ডি নামক স্থানে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। বিদ্যারণ্য নামক এক সাধকের প্রভাবে তাঁরা হিন্দুধর্মে পুনরায় দীক্ষিত হন। এবং এঁদের প্রচেষ্টায় ১৩৩৬ খ্রীষ্টাব্দে সুদূর দক্ষিণে বিজয়নগর রাজ্যের পত্তন হয়।

অপরাপর বিদ্রোহ : সুলতান মুহম্মদ বিন তুঘলকের অবশিষ্ট জীবন নানা স্থানে বিদ্রোহ দমন করতে ব্যয়িত হয়। ১৩৩৫ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান বরন্দল থেকে দিল্লী যাত্রা করেন। ওই বছরেই লাহোর, দৌলতাবাদ, সরস্বতি ও হান্‌সীতে বিদ্রোহ হয়, এবং সেগুলি দমন করাও সম্ভব হয়। ১৩৩৬-এ দিল্লীতে প্রবলাকারে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, এবং অবস্থা এমনই হয় যে স্বয়ং সুলতান তাঁর পরিবার পরিজনকে দিল্লী থেকে নবসৃষ্ট স্বর্গদ্বারীতে (বর্তমান শমসাবাদ) স্থানান্তরিত করেন। ওই বছরেই বিদর, কারা, গুলবর্গা ও অবধে বিদ্রোহ ঘটে। এই বিদ্রোহগুলিও দমিত হয়। ১৩৩৮এ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশে ফকরুদ্দীন মুবারক শাহ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বঙ্গদেশ দিল্লি সুলতানীর হাতছাড়া হয়।

১৩৪৫ খ্রীষ্টাব্দে সনাম, সামান, কইথল ও কুহ্‌রনে বিদ্রোহ হয়। জাঠ এবং রাজপুতরাও গোলমাল শুরু করে। দোয়াব অঞ্চলেও বিক্ষোভ দেখা দেয়। বিদ্রোহগুলি দমন করা হলেও সুলতান বুঝতে পেরেছিলেন যে গায়ের জোরে মূল ব্যাধির আরোগ্য করা যায় না। ফলে তিনি নূতন একটি শাসনতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন, করভার লাঘব করেন ও জনহিতকর নানা কর্মে ব্রতী হন। কিন্তু এক্ষেত্রেও তাঁর পরিকল্পনায় ভেজাল না থাকলেও তা রূপায়ণের ক্ষেত্রে বহু গলদ ছিল। তিনি পুরাতন পদাধিকারীদের বাতিল করে তাঁদের স্থলে নূতন লোক নিযুক্ত করেন। এই লোকগুলি ছিল আরও এককাঠি সরেশ। দৌলতাবাদের (দেবগিরি) শাসক কুতলুঘ খানকে সরিয়ে অন্ত লোককে বসানোর ফলে সেখানে বিদ্রোহ দেখা দেয়। আজিজ হিমারকে মালবের শাসকপদে নিয়োগ করে সুলতান বিদ্রোহ ডেকে আনেন। নিছক কল্পিত সন্দেহের ভিত্তির উপর নির্ভর করে এই আজিজ খার্-এর বহু বিদেশাগত আমীরকে হত্যা করে। এই ঘটনায় সম্ভ্রান্তশ্রেণীও সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। ১৩৪৫-এ গুজরাতে আমীররা বিদ্রোহ করে এবং সুলতান তাদের দমন করার জন্ত পাটন এবং আবুপাহাড়ের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হন। যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে বিদ্রোহীরা দৌলতাবাদ

অভিমুখে পলায়ন করে। সুলতান ব্রোচে ঘাঁটি করেন, এবং দৌলতাবাদ থেকে টাটকা সৈন্য বাহিনী এবং বিদেশাগত প্রধান প্রধান আমীরদের ডেকে পাঠান। এই আমীররা বিপদের আশংকায় বিদ্রোহ করে এবং তাদের সঙ্গে অন্যান্য স্থানের আমীররাও যোগ দেয়।

তখন সুলতান দৌলতাবাদে এসে এই বিদ্রোহ দমন করেন। এদিকে গুজরাত থেকে তঘীর নেতৃত্বে টাটকা বিদ্রোহের সংবাদ আসে। অগত্যা তাঁকে আবার গুজরাত ছুটতে হয়। তাঁর অবশিষ্ট জীবন গুজরাতে তঘীর বিদ্রোহ দমন করতেই কেটে যায়। দাক্ষিণাত্যের দিকে আর নজর দেওয়া সম্ভব হয় না। বাংলাদেশ আগেই হাতছাড়া হয়ে গেছে। সুদূর দক্ষিণে বিজয়নগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। দেবগিরি ও সন্নিহিত অঞ্চল, যেখানে দিল্লী সুলতানীর বৃহত্তর শক্তিকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, মুহম্মদ বিন তুঘলকের হাতছাড়া হয়ে যায়, এবং সেখানে বহমনী রাজ্য গড়ে ওঠে।

তঘী গুজরাতে আমীর ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ সহ জনসাধারণের বৃহত্তর অংশের সহায়তা পেয়েছিলেন। তিনি গুজরাতের উপশাসককে হত্যা করেন, ক্যাম্বে লুণ্ঠন করেন ও ব্রোচের দুর্গ অবরোধ করেন। সুলতান তাঁর বাহিনী নিয়ে উপস্থিত হলে তঘী আক্রমণ এড়িয়ে গেরিলা ধরনের যুদ্ধ চালিয়ে যান। কিন্তু তকালপুরে তিনি পরাস্ত হয়ে তট্টা নামক স্থানে পলায়ন করেন। তাঁকে অনুসরণকালে সুলতান মুহম্মদ বিন তুঘলক পথে রোগাক্রান্ত হয়ে ১৩৫১ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে মার্চ তারিখে মৃত্যু মুখে পতিত হন।

ব্যক্তিগত মুল্যায়ণ: মুহম্মদ বিন তুঘলককে খামখেয়ালী অথবা উন্মাদ প্রমাণ করতে এবং তাঁর কার্যকলাপের জন্য সুলতানীর পতন ত্বরান্বিত হয়েছিল এটা প্রতিপাদন করার জন্য যেমন একশ্রেণীর ঐতিহাসিকদের চেষ্টার অভাব নেই, অনুরূপভাবে আর এক শ্রেণীর ঐতিহাসিক এটা দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে তিনি মোটেই অপ্রকৃতিস্থ ছিলেন না, এবং তাঁর প্রতিটি কাজকর্মের পিছনেই একটা যুক্তির ভিত্তি ছিল। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর ঐতিহাসিকদের বক্তব্যের একটা ভিত্তি হচ্ছে যে মুহম্মদ বিন তুঘলক পূর্ববর্তী সুলতানদের মত আকাট ছিলেন না, তাঁর কিছুটা বিদ্যাবুদ্ধি ছিল। তিনি ব্যক্তিগত ভাবে কি ছিলেন বা কি ছিলেন না সে প্রশ্ন সম্পূর্ণই নিরর্থক। পক্ষান্তরে তাঁর নীতির জন্য দিল্লী সুলতানীর পতন ঘটেছিল, একথা বলাও হাস্যকর।

যদি দেবগিরিতে রাজধানী পরিবর্তন, বা প্রতীকী তাম্রমুদ্রার প্রচলন পাগলামি বলে গৃহীত হয়, তাহলে তাঁর পূর্বতন বিখ্যাত আলাউদ্দীন খলজীর গৃহীত মাদক বর্জন, রেশনিং-প্রথার প্রবর্তন এবং আরও বহু নীতি পাগলামির পর্যায়ে পড়ে কারণ সেগুলিও সফল হয় নি। মুহম্মদ বিন তুঘলকের বিদ্যাবুদ্ধি তাঁর নিষ্ঠুর প্রকৃতিকে বিন্দুমাত্র প্রভাবিত করতে পারে নি, এবং নিষ্ঠুরতায় তিনি আলাউদ্দীনের চেয়ে এককাঠি বেশী বই কম ছিলেন না। সমরনায়ক হিসাবে তাঁর সাফল্য আলাউদ্দীনের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। তিনি আরও বেশী যুদ্ধ করেছেন। আলাউদ্দীন খলজীর মৃত্যুকালে দেশের অবস্থা মুহম্মদ বিন তুঘলকের মৃত্যুকালে দেশের অবস্থার সঙ্গে গুণগত ভাবে পৃথক ছিল না। আসলে উভয়েই ইতিহাসের অচেতন অস্ত্র হিসাবে কাজ করে গেছেন, উভয়ই ছিলেন পরিস্থিতির দাস। আসলে দিল্লী সুলতানীর চরিত্রটাই এমন ছিল যেখানে কোন সুগঠিত রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব ছিল না। একমাত্র সামরিক শক্তিই ছিল দিল্লী সুলতানীর ভিত্তি, এবং তা সর্বদাই প্রতিদ্বন্দ্বী সামরিক শক্তিগুলির চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি ছিল। কেন্দ্রীয় শক্তির বিন্দুমাত্র শিথিলতা বা দুর্বলতার অর্থই ছিল তার নিজের সর্বনাশ ডেকে আনা। প্রতিটি রাজবংশেরই সৃষ্টি হয়েছিল ব্যক্তিগত ভাগ্যান্বেষণ প্রচেষ্টায়, যাঁরাই অসফল হয়েছেন তাঁরাই দিল্লী সুলতানীর বিরোধী শক্তিতে পরিণত হয়েছেন, সেটা খোদ রাজদরবারেই হোক বা দূরতম প্রদেশেই হোক। ফলে কেন্দ্রীয় শক্তিকে বরাবরই যুদ্ধের জন্য সজাগ থাকতে হত, যুদ্ধের দ্বারাই অস্তিত্ব রক্ষা করতে হত। এছাড়া ভারত ভূখণ্ডের ভৌগোলিক অবস্থান, বিশেষ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, নানা জাতি ও সংস্কৃতির সমাবেশ, একটি সুশৃংখল কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রতিকূল ছিল। মনে রাখতে হবে, মুহম্মদ তুঘলক যে পথে গিয়েছিলেন, তাঁর উত্তরাধিকারীরাও সেই একই পথের পথিক হয়েছিলেন। বিদ্রোহ দমন ও আক্রমণ ঠেকাতেই তাঁদের জীবন কেটেছে। বিষয়টি আমরা পরে বিস্তৃতভাবে সমালোচনা করব।

॥ ফিরুজ শাহ তুঘলক (১৩৫১-১৩৮৮)

মুহম্মদ বিন তুঘলকের মৃত্যুর পর সামন্ত ও পদাধিকারীদের অনুরোধে ফিরুজ শাহ ১৩৫১ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে মার্চ তারিখে দিল্লীর সুলতান হন। তিনি ছিলেন গিয়াসুদ্দীন তুঘলকের ভাই রজবের পুত্র। অবশ্য মুহম্মদ বিন তুঘলকের ভগিনী খুদাবন্দজাদার তরফ থেকে তাঁর পুত্রের জন্য সিংহাসনের দাবি তোলা হয়েছিল, কিন্তু ফিরুজের

পিছনে সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর দৃঢ় সমর্থনের জন্য এ নিয়ে বিশেষ গোলমাল হয় নি। সমকালীন ঐতিহাসিকদের মতে মুহম্মদ ফিরুজকেই উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন। মুহম্মদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দিল্লীস্থ মন্ত্রী খাজা জহান একজন শিশুকে মুহম্মদের পুত্র বলে ঘোষণা করে তাকে দিল্লীর সিংহাসনে বসাবার চেষ্টা করেছিলেন। শিশুটি মুহম্মদ বিন তুঘলকের আসল বা জাল সন্তান যাইহোক না কেন, আমীর-ওমরাহদের কোন পক্ষই তার অধিকারকে স্বীকার করে নি। ফিরুজ প্রথমে খাজা জাহানকে মার্জনা করেছিলেন, পরে মত বদল করে তার প্রাণদণ্ড দেন।

সিন্ধু থেকে দিল্লী অভিমুখে রওনা হয়ে পথে সিরসুতি নামক স্থানে ফিরুজ খবর পান যে বিদ্রোহী তঘী মারা গেছেন, যার সন্ধানে মুহম্মদ বিন তুঘলকের জীবনের শেষের দিনগুলি ব্যয়িত হয়েছিল। রাজ্যলাভের পর ফিরুজ মুহম্মদ তুঘলক অনুসৃত কয়েকটি পীড়নমূলক রীতি প্রত্যাহার করেন, এবং নিজ সমর্থকদের পুরস্কৃত করেন।

১৩৫৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে ফিরুজ বঙ্গদেশে অভিযান করেন কারণ, সেখানকার শাসনকর্তা হাজী ইলিয়াস শাহ স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। সুলতানের আগমন-বার্তা পেয়ে ইলিয়াস একডালিয়া দুর্গে আশ্রয় নেন। কিছুকাল অবরোধ করে থাকার পর ফিরুজ প্রত্যাগমনের ভাণ করেন। ইলিয়াসের বাহিনী তখন তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করে কিন্তু এই কৌশলগত যুদ্ধে জয়ী হলেও ফিরুজ বুঝতে পেরেছিলেন যে বর্ষার মুখে দিল্লী থেকে এত দূরে বেজায়গায় যুদ্ধ করতে গেলে ব্যাপারটা তাঁর প্রতি-কূলেই যাবে। তাই তিনি দ্রুত ইলিয়াস শাহের সঙ্গে সন্ধি করে নেন, কার্যত বাংলা-দেশের স্বাধীনতার স্বীকৃতি দিয়েই। ১৩৫৪-য় তিনি দিল্লী ফিরে আসেন এবং ওই বছরেই তিনি যমুনার তীরে ফিরুজাবাদ নগরীর পত্তন করেন।

কিন্তু ফিরুজকে দ্বিতীয়বার বঙ্গদেশে অভিযান করতে হয়। ১৩৫৭ খ্রীষ্টাব্দে হাজী (সামসুদ্দীন) ইলিয়াস মারা গেলে তাঁর পুত্র সিকন্দর সুলতান হন। ইতিমধ্যে সামসুদ্দীন ইলিয়াসের পূর্ববর্তী সুলতান ফকরুদ্দীনের জামাতা জাফর খান দিল্লীতে এসে ফিরুজকে বঙ্গদেশ পুনরভিযানে উৎসাহিত করেন। সুলতান বিষয়টি কতটা গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করেছিলেন বলা শক্ত, তবে অভিযানকালে কনৌজ ও অবধের মধ্যবর্তী স্থানে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করেন এবং গোমতী নদীর তীরে মুহম্মদ বিন তুঘলকের নামানুসারে জৌনপুর নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন। ১৩৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বঙ্গদেশে উপস্থিত হন। বাংলার সুলতান সিকন্দর ইলিয়াস তাঁর পিতার পথ অনুসরণ করে একডালা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং ফিরুজ দীর্ঘদিন ওই দুর্গ অবরোধ করে

থাকেন। শেষ পর্যন্ত উভয় তরফের যুদ্ধে কি ফল হয়েছিল তা সুস্পষ্টভাবে জানা যায় না। সিকন্দর ফিরুজকে বার্ষিক কর হিসাবে কয়েকটি হাতী পাঠাতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। বিনিময়ে ফিরুজ তাঁকে রাজকীয় উপাধি, আশী হাজার তঙ্কা মূল্যের একটি রত্ন খচিত মুকুট এবং পাঁচশো আরবী ঘোড়া উপহার দেন। কার্যত তিনি বাংলার স্বাধীনতা স্বীকার করেই ফিরে আসেন।

প্রত্যাবর্তনের পথে জৌনপুরে উপস্থিত হয়ে তিনি হঠাৎ উড়িষ্যা অভিযানের সিদ্ধান্ত করেন, এবং তদনুযায়ী ১৩৬০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি বিহারে উপস্থিত হন। মানভূম জেলার বর্তমান পাচেং ও শিখরের মধ্য দিয়ে তিনি অগ্রসর হন, এবং সেখানকার স্থানীয় শাসকের সঙ্গে তাঁর প্রবল সংঘর্ষ হয়। তাঁকে পরাস্ত করে তিনি দক্ষিণমুখী যাত্রা করেন এবং উড়িষ্যার সীমান্ত তিরগরে প্রতিহত হন। এখানকার যুদ্ধে জয়লাভ করে তিনি খিচিং-এ উপস্থিত হন, এবং সেখান থেকে কেওনঝরের মধ্য দিয়ে কটক। এত দ্রুত তিনি কটকে পৌঁছেছিলেন যে উড়িষ্যার রাজা তৃতীয় ভানুদেব সরংখরের দুর্গে পলায়ন করতে বাধ্য হন, তাঁর সৈন্যবাহিনী অবশ্য বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে পরাজিত হয়েছিল। ফিরুজ অতঃপর পুরী অভিমুখে যাত্রা করেন এবং সেখানকার জগন্নাথ মন্দির ধ্বংস করেন। এর পর তিনি চিল্কা অঞ্চলে কিছুদিন অবস্থান করেন এবং পদমতল বা বরম্বার জঙ্গলে হাতী শিকার করেন। উড়িষ্যার রাজা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন এবং বার্ষিক কর হিসাবে প্রতিবছর কতিপয় হাতী পাঠাতে রাজি হন। সুলতান তাঁকে মূল্যবান পরিচ্ছদ ও রাজকীয় উপাধি প্রদান করেন। উড়িষ্যা থেকে প্রত্যাবর্তনকালে ভুল পথ অবলম্বনের দরুন ফিরুজের ভয়ঙ্কর ক্ষতি হয়।

১৩৬১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সিরহিন্দ অভিমুখে অগ্রসর হন, উদ্দেশ্য নগরকোট বা কাংড়া দখল, মুহম্মদ বিন তুঘলকের আমলে যা হাতছাড়া হয়েছিল। সেখানকার শাসক বশ্যতা স্বীকার করে স্বপদে বহাল রাখেন। পর বৎসর ১৩৬২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিপুল বাহিনী নিয়ে সিন্ধু আক্রমণ করেন, কারণ এখানেই মুহম্মদ বিন তুঘলকের চূড়ান্ত বেইজ্জৎ ঘটেছিল। তিনি তট্টা অবরোধ করেন, কিন্তু সেখানকার শাসক জাম বনবিনা সাফল্যের সঙ্গে নগর রক্ষা করেন। এদিকে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে ফিরুজের অর্ধেক সৈন্য সাবাড় হয়ে যায়। তাঁর নৌবাহিনীও শত্রুপক্ষের হাতে পড়ে। তখন তিনি গুজরাতে প্রত্যাবর্তনের মনস্থ করেন। বিশ্বাসঘাতক পথপ্রদর্শকেরা তাঁর বাহিনীকে কচ্ছের রণ অঞ্চলে নিয়ে আসে যেখানে জলাভাবে ও রোদে ফিরুজের আরও এক-

বহু সৈন্যক্ষয় হয়। অতি কষ্টে তিনি গুজরাতে পৌঁছান।

১৩৬৩ খ্রীষ্টাব্দের অধিকাংশভাগই ফিরুজ গুজরাতে শক্তি সংহত করার কাজে ব্যয় করেন। পূর্বতন শাসক নিজাম-উল মুল্ককে বরখাস্ত করে তার জায়গায় জাফর খানকে অধিষ্ঠিত করেন। এই সময় দাক্ষিণাত্যের বহ্‌মনী রাজবংশের একজন বিদ্রোহী রাজপুত্র তাঁকে বহ্‌মনী রাজ্য আক্রমণ করতে উৎসাহিত করেন। কিন্তু ফিরুজ তা প্রত্যাখ্যান করেন। গুজরাত থেকে তিনি সিন্ধুতে পুনরায় একটি অভিযান করেন এবং তট্টা অবরোধ করেন। এবার তিনি সফল হন, এবং সিন্ধুর শাসক বশ্যতা স্বীকার করে করপ্রদানে স্বীকৃত হন।

১৩৭৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র ফথ খানের মৃত্যুতে ফিরুজ ভেঙে পড়েন। এদিকে গুজরাতের শাসক জাফর খানের কাজকর্মে অসন্তুষ্ট হয়ে তিনি দামঘানিকে ওখানকার শাসক নিযুক্ত করেন, কারণ তিনি অধিকতর করপ্রদানে স্বীকৃত হয়েছিলেন। কিন্তু ক্ষমতা লাভ করেই দামঘানি বিদ্রোহ করেন, কিন্তু তিনি ব্যর্থ ও নিহত হন। অতঃপর ফিরুজ জনৈক মালিক মুফরহ্‌কে (অন্যনাম ফরহাৎ-উল-মুল্ক) গুজরাতের শাসনভার অর্পণ করেন (১৩৭৭)। ওই বছরেই (১৩৭৭) এটাওয়ার জমিদারেরা বিদ্রোহী হয় এবং এই বিদ্রোহ ফিরুজ দমন করেন। ওই একই সময়ে কাতেহর (রোহিলখণ্ড) অঞ্চলের রাজা খর্কু বুদায়ুনের শাসক সঈদ মুহম্মদ ও তাঁর দুই ভাইকে হত্যা করেন। ১৩৮০ খ্রীষ্টাব্দে ফিরুজ এখানে অভিযান করেন। খর্কু কুমায়ুন অঞ্চলে পালিয়ে যান, কিন্তু ফিরুজ অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার সঙ্গে সমগ্র কাতেহ্‌রকে শ্মশানে পরিণত করেন।

১৩৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ফিরুজ ফিরুজপুর-ইখ্‌লেরি বা আখিরিন্‌পুর নামক একটি নূতন নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন। ১৩৮৭র ২২শে অগষ্ট তারিখে তিনি নিজপুত্র মুহম্মদ খান বা নাসিরুদ্দীন মুহম্মদ শাহকে সহযোগী সুলতান হিসাবে ঘোষণা করেন। এই সময় ফিরুজ ও তাঁর সহযোগীকে অপসারণের একটি অন্তঃপুরীয় চক্রান্ত হয় যার মূলে ছিলেন ফিরুজের মন্ত্রী খান জাহান। এই চক্রান্ত ফাঁস হয়ে গেলে খান জাহান প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। ফিরুজের সহযোগী নাসিরুদ্দীন মুহম্মদ শাহ নিজেকে অত্যন্ত অপদার্থ হিসাবে প্রতিপন্ন করেন, ফলে ফিরুজের জীবিতকালেই নাসিরুদ্দীন মুহম্মদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা যায়। অথর্ব সুলতান তখন নিজেই শাসনভার গ্রহণ করেন, এবং তাঁর পৌত্র (জ্যেষ্ঠপুত্র ফথ খানের পুত্র) গিয়াসুদ্দীনকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। ১৩৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ফিরুজ মারা যান।

৪ ॥ ফিরুজের উত্তরাধিকারীবর্গ

স্বাভাবিকভাবে ফিরুজের মৃত্যুর পর তাঁরই মনোনীত পৌত্র দ্বিতীয় গিয়াসুদ্দীন তুঘলক নাম নিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ফিরুজের পুত্র মুহম্মদ যিনি নাসিরুদ্দীন মুহম্মদ শাহ উপাধি নিয়ে ফিরুজের সহযোগী হয়েছিলেন তখন সিরমুরে বাস করছিলেন। তিনিও সিংহাসনের জন্য লড়তে প্রস্তুত হলেন, কিন্তু রাজকীয় বাহিনীর হস্তে পরাজিত হয়ে নগরকোট বা কাংড়ার দুর্গে আশ্রয় নিলেন। রাজকীয় বাহিনী ওই দুর্গ অবরোধ করে দিল্লীতে ফিরে আসে।

গিয়াসুদ্দীন সুলতান হিসাবে, অপদার্থ, লম্পট ও কাণ্ডজ্ঞানহীন ছিলেন। তিনি তাঁর নিজ ভ্রাতা সালোরকে বন্দী করেন। তাঁর অপর একজন সম্পর্কিত ভাই আবু বক্র ওই একই ভাগ্যের আশঙ্কা করে গিয়াসুদ্দীনের বিরুদ্ধে একটি চক্রান্ত করেন এবং এই কাজে তিনি প্রাক্তন সুলতান ফিরুজ শাহের নিজস্ব দাস বাহিনীর প্রধান রুক্নুদ্দীনের সহায়তা পান। ফলে গিয়াসুদ্দীন ১৩৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৮-ই ফেব্রুয়ারী তারিখে পলায়নকালে নিহত হন। অতঃপর আবুবক্র সুলতান হন এবং রুক্নুদ্দীন হন তাঁর ওয়াজির।

কিন্তু আবুবক্র বেশিদিন রাজত্ব করতে পারেননি। সামান প্রদেশের শাসক তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হন এবং নগরকোটে প্রায়-নির্বাসিত ফিরুজের পুত্র নাসিরুদ্দীন মুহম্মদ শাহকে সুলতান বলে ঘোষণা করেন (এপ্রিল ১৩৮৯)। উভয়ের সম্মিলিত বাহিনী দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হয় এবং পথে তাঁরা বহু আমীরের সহায়তা পান। দিল্লী গৃহযুদ্ধের ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। আবুবকর মেওয়াটের বাহাদুর নাহিরের সাহায্যে মুহম্মদের বাহিনীকে পরাস্ত করলে তিনি দোয়াব অঞ্চলে পালিয়ে গিয়ে জালেসরে ঘাঁটি করেন। সেখানে কয়েকজন আমীরের সহায়তা পেয়ে পুনর্বার দিল্লী আক্রমণ করেন, কিন্তু এবারেও তিনি পরাস্ত হন। কিন্তু তৎসত্বেও তিনি লাহোর, মুলতান, সামান, হিসার, ও হানসির শাসকদের সহায়তা পান। হিন্দু প্রধানরাও সুলতানের বিরোধী হয়ে ওঠে। আবুবক্র মুহম্মদের পুত্র হুমায়ুনকে পাণিপথের যুদ্ধে পরাজিত করেন এবং উৎসাহিত হয়ে মুহম্মদের শক্তিকেন্দ্র জালেসর আক্রমণ করেন। এদিকে তাঁর দিল্লীতে অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে মুহম্মদ দিল্লীস্থ একশ্রেণীর আমীরদের সহায়তায় সিংহাসন দখল করেন (আগষ্ট ১৩৯০)। শেষ পর্যন্ত আবুবক্র পরাজিত হন এবং মীরাটের দুর্গে বন্দী অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

নাসিরুদ্দীন মুহম্মদ সুলতান হবার পর ১৩৯০ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাতের শাসক ফরহাৎ-

উল-মুল্ক স্বাধীনতা ঘোষণা করেন, এবং গুজরাত দিল্লীর হাতছাড়া হয়ে যায়। ১৩৯১ থেকে রাঠোর রাজপুতরা বিদ্রোহ শুরু করে। কয়েকটি যুদ্ধে রাজকীয় পক্ষ জয়ী হলেও তা থেকে কোন দূরপ্রসারী ফল হয়নি। ১৩৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মেওয়াটের বাহাদুর নাহির দিল্লীর উপকণ্ঠ পর্যন্ত লুণ্ঠন করেন। তাঁকে সুলতান কোটলা নামক স্থানে পরাজিত করেন। অতঃপর তিনি মুহম্মদাবাদে (জালেসর) ফিরে আসেন। এদিকে খোকরদের নেতা সাইখা বিদ্রোহী হয়ে লাহোর অধিকার করেন। সুলতান পুত্র হুমায়ুনকে প্রেরণ করেন। কিন্তু হুমায়ুন দিল্লী ছাড়ার আগেই সুলতান নাসিরুদ্দীন মুহম্মদ পরলোকগমন করেন (জানুয়ারী ১৩৯৪)। অতঃপর তাঁর পুত্র হুমায়ুন আলাউদ্দীন সিকন্দর শাহ নাম নিয়ে সিংহাসনে বসেন কিন্তু মাত্র ছয় সপ্তাহ রাজত্ব করে তিনি মারা যান।

হুমায়ুনের মৃত্যুর পর একদল আমীরের সহায়তায় তাঁর ভাই নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ সুলতানী লাভ করেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষক আমীরদের নেতা ছিলেন মুকর্‌রব খান। এই আমলে দিল্লী সুলতানীর ভাঙন আরও ব্যাপক হয়। তাঁর সময়কার ওয়াজির মালিক সর্বর খাজা জাহান ১৩৯৪ খ্রীষ্টাব্দে কোইল, এটাওয়া ও কনৌজের বিদ্রোহ দমন করেন, কিন্তু তিনি নিজেই জৌনপুরে একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। ওই বছরেই সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ স্বয়ং গোয়ালিয়র অভিযান করেন। সেখানে তাঁর প্রিয়পাত্র সাদাৎ খানের বিরুদ্ধে মল্লু নামক একজন আমীর একটি চক্রান্ত করেন, কিন্তু তা ফাঁস হয়ে যাওয়ায় মল্লু দিল্লীতে পালিয়ে এসে মুকর্‌রব খানের আশ্রয় লাভ করেন, কারণ মুকর্‌রবের সঙ্গে সাদতের শত্রুতা ছিল। এদিকে সুলতান সাদৎ সহ দিল্লীতে প্রত্যাগমন করলে মুকর্‌রবের নির্দেশে দিল্লীর ফটক বন্ধ করে দেওয়া হয়। তিন মাস ব্যর্থ অবরোধ করে শেষ পর্যন্ত সুলতান সাদৎকে বিসর্জন দিয়ে মুকর্‌রবের সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসেন এবং দিল্লীতে প্রবেশাধিকার পান। সাদৎ তখন ফিরুজাবাদে চলে যান এবং ফিরুজ তুঘলকের জনৈক পৌত্র (ফথ খানের পুত্র) নুসরৎ শাহকে দিল্লীর সুলতান বলে ঘোষণা করেন।

এই দুই সুলতানকে কেন্দ্র করে গৃহযুদ্ধ বেঁধে ওঠে। দিল্লীর আমীরগণ মাহমুদ শাহের পক্ষ নেন এবং ফিরুজাবাদ, দোয়াব, সম্বল, পানিপথ, ঝঝর ও রোটকের আমীরগণ নুসরৎ শাহের পক্ষ নেন। তিন বছর ধরে ক্রমাগত দলবদল ও যুদ্ধ বিগ্রহ চলে, এবং ঘটনাচক্রে পূর্বোক্ত মল্লু সুলতান মাহমুদ শাহকে কুক্ষিগত করে ফেলেন। নুসরৎ-পক্ষীয়দের কয়েকটি যুদ্ধে পরাজিত করে মল্লু ১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবরে

দিল্লীতে প্রবেশ করেন, কিন্তু সেখানে গুছিয়ে বসার আগেই তৈমুরলঙ্গের আক্রমণে সবকিছু ওলোটপালোট হয়ে যায়। তৈমুর দিল্লীতে প্রবেশ করেন ১৩৯৯-এর ১লা জানুয়ারী, এবং ব্যাপক লুণ্ঠন ও ধ্বংসকার্য চালিয়ে ভারত ত্যাগ করেন ১৯শে মার্চ ১৩৯৯। তাঁর হাতে পরাজিত হয়ে সুলতান মাহ্‌মুদ শাহ এবং মল্লু পলায়ন করেন।

তৈমুর চলে গেলে মাহমুদ শাহের অনুপস্থিতির সুযোগে নুসরৎ শাহ দিল্লীর তখতে বসে পড়েন। কিন্তু মল্লু তাঁকে এবারেও উৎখাত করে নিজেই কার্যত সর্বেসর্বা হয়ে যান। পরাজিত নুসরৎ মেওয়াটে পলায়ন করেন এবং সেখানেই মারা যান। ১৪০১ খ্রীষ্টাব্দে মল্লু সুলতান মাহমুদ শাহকে দিল্লীতে নিয়ে আসেন। কার্যত সুলতান মল্লুরই বৃত্তিভোগী ও আজ্ঞাবহ হয়ে থাকেন। এই অবস্থা দুঃসহ বোধ হওয়ায় তিনি কনৌজে পলায়ন করেন। মুলতানে একটি অভিযানে মল্লু সেখানকার শাসক খিজির খানের হাতে পরাজিত ও নিহত হন।

মল্লুর মৃত্যুর পর সুলতান মাহমুদ শাহ দিল্লী প্রত্যাগমন করেন। দৌলত খান লোদী নামক একজন আফগান আমীর তাঁর আমলে সামরিক প্রশাসক হিসাবে নিযুক্ত হন। সুলতানীর এলাকা তখন ছোট হতে হতে দিল্লী ও সংলগ্ন কিছু অঞ্চলে এসে ঠেকেছিল। দৌলত খান আশে পাশে কিছুটা দিল্লীর প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড় প্রতিপক্ষ ছিলেন খিজির খান যিনি মল্লুকে নিহত করেছিলেন এবং তৈমুরের আদেশে মুলতান, লাহোর ও দীপালপুরের শাসক নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি সামান, সিরহিন্দ, সুনাম ও হিসার জয় করে নিজের শক্তি রীতিমত বৃদ্ধি করেছিলেন। ১৪১০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি একবার দিল্লী অবরোধও করেছিলেন, কিন্তু পর্যাপ্ত রসদের অভাবে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

১৪১২ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান মাহমুদ শাহ মারা গেলে তুঘলক বংশের অবসান হয়। ১৪১৩ খ্রীষ্টাব্দে দৌলতখান লোদী দিল্লীর সুলতানরূপে ঘোষিত হন। কিন্তু আমীরদের একাংশের সহযোগিতায় খিজির খান দিল্লী অধিকার করেন, এবং একটি নূতন রাজবংশের পত্তন করেন যা সৈয়দ বংশ নামে পরিচিত। এটা ১৪১৪ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা। পরাজিত দৌলত খান হিসার দুর্গে বন্দী হন।

৫ ॥ তৈমুরের আক্রমণ

আভ্যন্তরীণ বিবাদে দীর্ণবিদীর্ণ দিল্লী সুলতানীর পতন তৈমুরের অভিযানের

দ্বারা ত্বরান্বিত হয়েছিল। তৈমুর ১৩৩৬ খ্রীষ্টাব্দে সমরকন্দের দক্ষিণে শহ্‌র-ই-সব্‌জ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। সামান্য অবস্থা থেকে তিনি কিভাবে বিরাট সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হয়েছিলেন সে চিত্তাকর্ষক ইতিহাস আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। তাঁর আত্মজীবনী গ্রন্থে তিনি ভারত অভিযানের দুটি কারণ উল্লেখ করেছেন: (১) বিধর্মীদের নিশ্চিহ্ন করে গাজী হওয়া এবং (২) বিধর্মীদের ধন-সম্পত্তি ইসলামের সৈনিকদের সেবায় ব্যবহার করা।

১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ কি এপ্রিলে তৈমুর বিপুল বাহিনী সহ আফগানিস্তানে উপস্থিত হন। তিনি প্রথম যে স্থানে অভিযান করেন তার নাম কাতোর, কাবুল ও কাশ্মীরের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। এই অঞ্চলটি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করা হয় এবং নিহতদের মুণ্ড দিয়ে কয়েকটি স্তম্ভ বানানো হয়। অতঃপর কয়েকটি বিদ্রোহী আফগান ট্রাইবকে উচ্ছেদ করে ১৩৯৮-এর সেপ্টেম্বরে তিনি সিন্ধু অতিক্রম করেন। চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা নদীর সংযোগস্থল অতিক্রম করে তিনি তুলম্ব নামক স্থানে হাজির হন, এবং সেখানে খবর পান যে তাঁর পৌত্র পীর মহম্মদ ইতিমধ্যেই মুলতান অধিকার করেছেন। অতঃপর তিনি তাঁর বাহিনীকে দু'ভাগ করে এক অংশকে দীপালপুর এবং সামানের মধ্য দিয়ে প্রেরণ করেন, এবং তিনি নিজে ভাটনির নামক স্থানে উপস্থিত হন যেখানকার হিন্দু শাসক দুল চাঁদ পরাজিত হন। এখানে ব্যাপক ধ্বংস ও লুণ্ঠনকার্য চলে। অতঃপর তিনি সরস্বতি শহরটি দখল করেন এবং এখানেও নারকীয় হত্যালীলার পুনরাবৃত্তি হয়। তিনি জাঠদের একটি বাহিনীকে ধ্বংস করেন। তাঁর দ্বিতীয় বাহিনী তাঁর সঙ্গে সামান অঞ্চলে মিলিত হয়। সেখানে থেকে পানিপথ হয়ে এই বাহিনী দিল্লীর উপকণ্ঠে উপস্থিত হয়। একটি অগ্রবর্তী বাহিনীকে তিনি দিল্লী লুণ্ঠন করতে আগেই পাঠিয়ে দেন, এবং অবশিষ্ট বাহিনী নিয়ে তিনি পরে যমুনা অতিক্রম করেন। সুলতান মাহমুদ শাহ ও তাঁর অভিভাবক মল্লু তাঁকে বাধা দেবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে পালিয়ে যান। দিল্লী নগর লুণ্ঠন করা হয়। এক লক্ষ হিন্দু বন্দীকে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করা হয়। এই ঘটনাগুলি ঘটে ১৩৯৮-এর ১২ই থেকে ১৮ই ডিসেম্বরের মধ্যে। ১লা জানুয়ারী ১৩৯৯ তারিখে তিনি দিল্লী থেকে পলায়নরত বিধর্মীদের হত্যা ও তাদের স্ত্রীপুত্রসহ সর্বস্ব লুণ্ঠনের নির্দেশ দেন, এবং এই নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয়। অতঃপর তিনি পশ্চিমে অভিযান চালান এবং নগরকোট ও জম্মু লুণ্ঠন করেন। ৬ই মার্চ একটি বিশেষ দরবারে তিনি খিজির খানকে মুলতান, লাহোর ও দীপালপুরের শাসক নিযুক্ত করেন। ১৯শে মার্চ তারিখে তিনি সিন্ধু পুনরতিক্রম করে ফিরে যান।

পঞ্চম অধ্যায়

অবক্ষয় ও পতন

১ ॥ সৈয়দবংশ : খিজির খান (১৪১৪-২১)

৬ই জুন ১৪১৪ তারিখে খিজির খান যখন দিল্লী অধিকার করেন, তখন দিল্লী সুলতানীর এলাকা অনেক ক্ষুদ্র হয়ে গিয়েছিল। চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি থেকেই বঙ্গদেশ ও দাক্ষিণাত্য দিল্লীর হাতছাড়া। জৌনপুর, মালব, গুজরাত ও খান্দেশে স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত হয়েছে। বাকি অঞ্চলগুলিও হাতছাড়া হবার মুখে। সুলতানের সামর্থও ছিল ঘটনাচক্রে সীমীত। তাঁর পক্ষে হস্তচ্যুত এলাকাগুলি পুনর্দখল করার জন্য বৃহৎ সামরিক অভিযান চালানো অসম্ভব ছিল। এ ছাড়া ষড়যন্ত্রমূলক আবহাওয়ার মধ্যে তাঁর নিজের অস্তিত্ব রক্ষারও সমস্যা ছিল। কাজেই খিজির খানের লক্ষ্য ছিল যেটুকু আছে তা রক্ষা করা, এবং কিছুটা আর্থিক সমৃদ্ধি অর্জন করা। ব্যক্তিগত জীবনেও এই সুলতান ছিলেন মিতাচারী ও মিতব্যয়ী।

কিছু অধিকতর কর সংগ্রহের উদ্দেশ্যে খিজির খান তাঁর মন্ত্রী তাজউল মুল্কের পরামর্শে কাতেহ্‌র, এটাওয়া, খোর, কম্পিল, পাওয়ানি, জলেসর, গোয়ালিয়র ও বয়ান অঞ্চলগুলিতে হানা দেন। এই সকল স্থানের শাসকদের কাছ থেকে তিনি কিছুটা বর্ধিত কর সংগ্রহে সফল হন, যদিও তারা কেউই পাকাপাকি বশ্যতা স্বীকার করেনি।

এছাড়া বিদ্রোহের সমস্যাও ছিল। ১৪১৬ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কবাচ্ছা নামক একটি গোষ্ঠী সিরহিন্দে বিদ্রোহ করে এবং সেখানকার শাসক রাজকুমার মুবারকের প্রতিনিধি মালিক সধু নাদিরকে হত্যা করে। রাজকীয় বাহিনী তাদের পরাজিত করলেও, তাদের শায়েস্তা করা সম্ভব হয়নি। তাদের নেতা তুগান রইস সরযুর ওপারে বিদ্রোহী খোকরদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে মহা উপদ্রব করেছিলেন।

বুদাউনের আমীর মহাবৎ খানও ১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহী হয়েছিলেন। খিজির বেশ কিছুকাল বুদাউনের দুর্গ অবরোধ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর নিজের লোকদের মধ্যেই কয়েকজন বিশ্বাসঘাতকের সন্ধান পেয়ে বিরক্ত হয়ে অবরোধ উঠিয়ে চলে আসেন, এবং কোয়াম খান ও ইখ্‌তিয়ার খান নামক দুজন বিশ্বাসঘাতকের প্রাণদণ্ড দেন।

১৪১৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজওয়ারা পর্বত অঞ্চলে একজন জাল সারঙ্গ খান বিদ্রোহ করে। আসল সারঙ্গ খান ছিল পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বর্ণিত মল্লু র (মল্লু ইকবাল খান) ভাই যে ১৩৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তৈমুরের হাতে বন্দী ও পরে নিহত হয়েছিল। খিজির খানের সেনাপতি সুলতান শাহ লোদী এই জাল সারঙ্গ খানকে পরাস্ত করেন। এই ব্যক্তি অতঃপর পর্বতাঞ্চলে পালিয়ে যায়, কিন্তু ১৪২০ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কবাচ্ছাদের নেতা তুঘান রইস তাকে হত্যা করে তার সর্বস্ব হাতিয়ে নেয়।

খিজির খান একটি মাত্রই দূরবর্তী সামরিক অভিযান করেছিলেন নাগপুরে। ১৪১৬ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাতের আহমদ শাহ নাগপুর আক্রমণ করলে সেখানকার শাসক খিজিরের সাহায্য চান। রাজকীয় বাহিনীর খবর পেয়েই আহমদ শাহ পলায়ন করেন। দু'বছর নাগপুর দিল্লীর অধীনতা মেনেছিল, কিন্তু পরে মালব থেকে আক্রমণের আশঙ্কায় গুজরাতেরই বশ্যতা স্বীকার করে। নাগপুর থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে খিজির খান গোয়ালিয়র এবং বয়ানে উপস্থিত হয়ে কর আদায় করেন।

তাঁর রাজত্বের শেষ বছরে খিজির মেওয়াট অভিযান করেন ও কোট্‌লা দুর্গ ধ্বংস করেন। অতঃপর তিনি গোয়ালিয়র অভিযান করেন এবং সেখান থেকে কর আদায় করে এটাওয়ায় আসেন যেখানকার রাজা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন। দিল্লী প্রত্যাগমনের পর ১৪২১ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে মে তারিখে তিনি মারা যান।

২ ॥ মুবারক শাহ (১৪২১-৩৪)

খিজির খানের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মুবারক শাহ্‌ যখন ১৪২১ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সুলতানীতে অধিষ্ঠিত হলেন তখন উত্তর-পশ্চিমে খোকর, তুর্কবাচ্ছা ও মঙ্গোলদের হামলা দিল্লীর পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে, মালব ও জৌনপুরের শাসকরা নিজেদের প্রাধান্য বিস্তারে ব্যস্ত। অন্যান্য অঞ্চলেও বিদ্রোহের ধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

খোকররা পাঞ্জাবের বিতস্তা ও চন্দ্রভাগা নদীদ্বয়ের মধ্যাঞ্চলে বাস করত, এবং দিল্লী ও তার আশেপাশের অঞ্চলে প্রায়শই হানা দিত। এদের নেতা জসরথ কাশ্মীরের সুলতান জৈন-উল আবেদিনের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং তুর্কবাচ্ছা সর্দার তুঘান রইসের সহায়তায় মুবারকের রাজত্বের গোড়ার দিকে জলন্ধরে ব্যাপক আক্রমণ চালান। জসরথ অতঃপর সিরহিন্দে অগ্রসর হন, কিন্তু মুবারকের সেনাপতি ইসলাম খান লোদী কর্তৃক প্রতিহত হন। সুলতান স্বয়ং তাঁর বিরুদ্ধে অভিযান করলে তিনি

চন্দ্রভাগার উত্তর-পশ্চিমে তেথর নামক দুর্গম পর্বতাঞ্চলে আত্মগোপন করেন। ১৪২২ খ্রীষ্টাব্দে জসরথ দুবার লাহোরে হামলা করেন। এরপর পাঁচ বছর তিনি চুপ-চাপ থাকেন, কিন্তু ১৪২৮ খ্রীষ্টাব্দে অকস্মাৎ কলানৌর ও জলন্ধরে হামলা করেন। দিল্লীর অনুগত স্থানীয় শাসক সিকন্দর তুহ্‌ফা তাঁকে প্রতিহত করলে তিনি তেথরে পালিয়ে যান। ওই বছরেই একটি মঙ্গোল অভিযানের সময় জসরথ পুনরায় জলন্ধর আক্রমণ করেন এবং মালিক তুহ্‌ফাকে বন্দী করেন। তারপর তিনি লাহোরে অভিযান করেন। কিন্তু সর্বর-উল-মুল্কের নেতৃত্বে দিল্লী সৈন্যবাহিনীর আসার সংবাদ পেয়ে তিনি পুনরায় পর্বতাঞ্চলে আত্মগোপন করেন। ১৪২৮-এর শেষের দিকে অথবা ১৪২৯-এর গোড়ার দিকে তিনি আর একটি ব্যর্থ লাহোর অভিযান করেন। পরবর্তী সুলতানের আমলে তিনি আবার সক্রিয় হয়েছিলেন।

তুর্কবাচ্ছাদের বিদ্রোহ সুলতানকে যথেষ্ট বিব্রত করেছিল। এদের নেতা পুলাদ ১৪৩০ নাগাদ বর্তমান ভাতিন্দার নিকট তবরহিন্দ দুর্গ অধিকার করে সেখানে ঘাঁটি স্থাপন করেন। সুলতানী ফৌজ মুলতানের শাসক ইমাদুল মুল্কের সহায়তায় তাঁকে কাবু করে ফেলেছিল, কিন্তু মুবারক শাহ হঠাৎ শৈথিল্য প্রদর্শন করায় সেই সুযোগে পুলাদ কাবুলের মঙ্গোল শাসক শেখ আলির সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁকে ভারত অভিযানে প্রলুব্ধ করেন। ১৪৩১-এর ফেব্রুয়ারী মার্চ নাগাদ শেখ আলি পাঞ্জাব অতিক্রম করেন, এবং সেই সঙ্গে পুলাদ যদৃচ্ছা লুণ্ঠনাদি চালান এবং দিল্লীর সুলতানের অনুগত রাই ফিরুজকে নিহত করেন। মুবারক শাহ মঙ্গোল আক্রমণের ব্যাপারে ব্যস্ত থাকায় পুলাদকে দমন করার জন্য তবরহিন্দে সৈন্য পাঠিয়েও পরে তা ফিরিয়ে আনেন। ১৪৩৩ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে সুলতান মুবারক তবরহিন্দে অভিযান চালিয়ে পুলাদকে পরাজিত ও নিহত করেন।

মঙ্গোল আক্রমণ প্রতিহত করার কাজেও মুবারক শাহ কিছুটা সাফল্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। ১৪৩১ খ্রীষ্টাব্দে পূর্বোক্ত মঙ্গোল শেখ আলি, পুলাদের প্ররোচনায় বা অন্য কারণে, জলন্ধর, ফিরুজপুর এবং লাহোরে ব্যাপক লুণ্ঠনকার্য চালান। দীপাল-পুরের মধ্য দিয়ে তিনি মুলতানে আসেন, কিন্তু সেখানে মুবারকের সেনাপতি ইমাদ-উল-মুল্কের হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। পরাজিত মঙ্গোল বাহিনীকে রাজকীয় বাহিনী সেওর পর্যন্ত তাড়া করে, কিন্তু তারপর হঠাৎ প্রত্যাবর্তন করে। মুবারক আরও একটি ভুল করেছিলেন ইমাদ-উল-মুল্ককে মুলতান থেকে সরিয়ে নিয়ে। ফলে চার মাস পরে শেখ আলি পুনরায় মুলতান আক্রমণ করেন এবং খোসলপুর ও তুলাম্বা

লুণ্ঠন করেন। মুবারক খুবই সংকটে পড়েন কেননা তখন তাঁকে জসরথ ও পুলাদের বিদ্রোহ খুবই বেগ দিচ্ছিল। এর কয়েক মাস পরে শেখ আলি পুনরায় লাহোরে হাঙ্গামা করেন। তাঁকে প্রতিহত করার জন্য মুবারক ইমাদ-উল-মুল্ক ও ইসলাম খানকে প্রেরণ করেন। উভয়ের সম্মিলিত বাহিনী দীপালপুর অভিমুখে রওনা হলে শেখ আলি ভীত হয়ে সর্বস্ব ফেলে পলায়ন করেন। তাঁর ভাইপো সেওরের আমীর মুজফ্‌ফর মুবারকের সঙ্গে সন্ধি করেন এবং মুবারকের পালিত পুত্র মুহম্মদ শাহ্‌র সঙ্গে নিজ কন্যার বিবাহ দেন। এরপর দীর্ঘকাল ভারতে মঙ্গোল আক্রমণ হয়নি।

মুবারকের সঙ্গে জৌনপুরের শার্কি বংশীয় শাসক ইব্রাহিমের সম্পর্ক ভাল ছিল না। বয়ানের শাসক আমীর খান ঔইদী ১৪২৩ খ্রীষ্টাব্দে মুবারকের নিকট পরাজিত হয়ে বশ্যতা স্বীকার করেন। তাঁর উত্তরাধিকারী মুহম্মদ খান বিদ্রোহ করেন এবং জৌন-পুরের ইব্রাহিম শার্কির সহায়তা পান। উভয়ের মিলিত বাহিনী কাল্পি অধিকার করলে সেখানকার শাসক মুবারকের সাহায্য চান। এই উপলক্ষে মুবারককে ১৪২৮ খ্রীষ্টাব্দে দুটি যুদ্ধ করতে হয়েছিল। মুবারক বয়ান অধিকার করেন। ইব্রাহিম শার্কি জৌনপুরে পলায়ন করেন।

দিল্লীর নিকটবর্তী অঞ্চলের মেওয়াটিরা মুবারকের আমলে বার বার বিদ্রোহী হয়েছিল। ১৪২৪ ও ১৪২৫ খ্রীষ্টাব্দে দুবার তাদের বিদ্রোহ মুবারক দমন করেন। মেওয়াটিদের শেষ বিদ্রোহ ঘটেছিল ১৪৩২ খ্রীষ্টাব্দে, কিন্তু মুবারক এই বিদ্রোহ দমন করেন এবং বিদ্রোহীদের নেতা জল্লু বা জালাল খান বশ্যতা স্বীকার করেন। ১৪২৩ খ্রীষ্টাব্দে গোয়ালিয়র মালবের শাসক হুসঙ্গ শাহ কর্তৃক আক্রান্ত হলে সেখানকার রাজার অনুরোধে মুবারক হুসঙ্গের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে তাঁকে গোয়ালিয়র থেকে তাড়িয়ে দেন।

মুবারক ছিলেন সৈয়দবংশের সর্বোৎকৃষ্ট সুলতান যিনি তৎকালীন শাসকবর্গের আচরিত সর্বপ্রকার কলুষতা থেকে মুক্ত ছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে ১৪৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে ফেব্রুয়ারি তারিখে প্রার্থনাকালীন অবস্থায় তিনি তাঁর মন্ত্রী সর্বর-উল-মুল্কের নিযুক্ত ঘাতকদের দ্বারা নিহত হন। এই ঘটনা ঘটে সুলতানের নিজের প্রতিষ্ঠিত মুবারকাবাদ শহরের একটি মসজিদে।

৩॥ মুহম্মদ শাহ (১৪৩৪-৪৫)

মুবারকের মৃত্যুর পর তাঁর ভাইপো মুহম্মদ খান বিন ফরিদ খান সুলতান মুহম্মদ

শাহ নাম নিয়ে সিংহাসনে আরোহন করলেও কার্যত তিনি ছিলেন মুবারকের ঘাতক সর্বর-উল-মুল্কের নজরবন্দী। প্রাক্তন সুলতানের অনুগত আমীর ওমরাহ ও পদাধিকারিরা অবশ্য হাত গুটিয়ে বসে ছিলেন না। তাঁরা কামাল-উল-মুল্কের নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হয়ে সর্বরকে এবং তার অনুচরবর্গকে নিহত করেন। এর পর প্রকৃত ক্ষমতা মুহম্মদের হাতে আসে। এবং তিনি সকলেরই আনুগত্য ও শুভেচ্ছা লাভ করেন।

কিন্তু এই সুলতান ছিলেন অপদার্থ, ভোগী ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ। তাঁর অকর্মণ্যতার সুযোগ নিয়ে মেওয়াটি সর্দার জালাল খান দিল্লীর কিছু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির প্ররোচনায় মালবের শাসক মাহমুদ খলজীকে দিল্লী আক্রমণের জন্য আহ্বান জানান। এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে মাহমুদ খলজী একটি বিরাট বাহিনী নিয়ে দিল্লীর অনতিদূরে তলপৎ নামক স্থানে শিবির স্থাপন করেন। আত্মরক্ষায় অসমর্থ সুলতান মুহম্মদ শাহ সিরহিন্দের শাসক বুহ্‌লুল লোদীর সাহায্য চান, এবং তাঁর হয়ে বুহ্‌লুলই শেষ পর্যন্ত মাহ্‌মুদ খলজীকে পরাজিত, বিধ্বস্ত এবং পলায়ন করতে বাধ্য করেন। স্বাভাবিক ভাবেই দিল্লীর দরবারে বুহ্‌লুলের প্রতিপত্তি বেড়ে যায়। এরপর সুলতান তাঁকে তখনও পর্যন্ত অপরাজিত খোকরদের দমন করতে অনুরোধ করেন। কিন্তু খোকরদের নেতা ধুরন্ধর জসরথ আগে থেকেই বুহ্‌লুলের সঙ্গে একটি বোঝাপড়ায় এসেছিলেন। তিনি উল্টে বুহ্‌লুলকে দিল্লীর সিংহাসন দখল করতে পরামর্শ দেন। বুহ্‌লুল ১৪৪৩ খ্রীষ্টাব্দে একবার দিল্লী আক্রমণ করেছিলেন, কিন্তু সফল হননি।

১৪৪৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন মুহম্মদ শাহ মারা যান, দিল্লী সুলতানীর খাস এলাকা খুব সামান্যই ছিল। অধীন দেশগুলি একের পর এক স্বাধীনতা ঘোষণা করছিল। মুলতান ও জৌনপুর বিশেষ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল।

৪॥ আলাউদ্দীন আলম শাহ (১৪৪৫-৫১)

পরবর্তী সুলতান মুহম্মদ শাহের পুত্র আলাউদ্দীন আলম শাহ তাঁর পিতার চেয়েও বেশি অপদার্থ ছিলেন। দিল্লীতে বসবাস করা নিরাপদ হবে না ভেবে তিনি বুদাউনে গিয়ে বাস করতে থাকেন। এদিকে ১৪৪৭ খ্রীষ্টাব্দে বুহ্‌লুল লোদী দ্বিতীয়বার দিল্লী অভিযান করেন। কিন্তু এবারেও তাঁর অভিযান অসার্থক হয়। কিন্তু তারপর সুযোগ নিজে থেকেই তাঁর কাছে আসে। দিল্লীতে সুলতানের অনুপস্থিতির ফলে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল তা পূরণ করার জন্য অনেকেই একজন শক্তিমান লোক খুঁজছিলেন। সুলতানের সঙ্গী হামিদ খান বুহ্‌লুল লোদীকে ক্ষমতা দখলের জন্য

আহ্বান করেন। তাঁর অবশ্য মতলব ছিল যে সুলতান বুহ্‌লুল তাঁর ক্রীড়নক হয়ে থাকবেন এবং তিনি ইচ্ছামত উজিরী করবেন। কিন্তু বুহ্‌লুল নিজেকেই সুলতান বলে ঘোষণা করেন, এবং সুবিধামত হামিদ খানকে সরিয়ে দেন। প্রাক্তন সুলতান আলম শাহ তাঁর অবশিষ্ট জীবন জৌনপুরেই অতিবাহিত করেন।

৫ ॥ লোদীবংশ : বুহ্‌লুল লোদী (১৪৫১-৮৯)

বুহ্‌লুল লোদী, যিনি আলম শাহকে অপসারিত করে দিল্লীর তখৎ দখল করেছিলেন, ছিলেন আফগান বংশীয়। সিংহাসনে আরোহন করার পর তাঁর প্রথম কীর্তি জৌনপুর দখল। আমরা আগে দেখেছি গোটা সৈয়দ আমলে জৌনপুরের শার্কি বংশীয় শাসকেরা বেশ শক্তিমান হয়ে উঠেছিল এবং সর্বদাই তারা দিল্লীর ত্রাসের কারণ ছিল। বুহ্‌লুলের সুলতানী লাভের পরই তাঁকে হটিয়ে দিল্লী দখলের অভিপ্রায় জৌনপুরের মাহমুদ শাহ দিল্লী আক্রমণ করেন। তখন বুহ্‌লুল মুলতানে ছিলেন, কিন্তু এই আক্রমণের খবর পেয়েই তিনি তদ্দণ্ডে প্রত্যাবর্তন করেন এবং দিল্লীর নিকটে নারেলা নামক স্থানে মাহমুদকে পরাস্ত করেন। মাহ্‌মুদ পরে দুবার বুহ্‌লুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন এটাওয়া এবং শামসাবাদে। কিন্তু ১৪৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। মাহ্‌মুদের মৃত্যুর পরেও তাঁর পুত্র মুহম্মদ শাহ যুদ্ধ চালিয়ে যান। কিন্তু ইতিমধ্যে খোদ জৌনপুরেই গৃহযুদ্ধ শুরু হয়, এবং মুহম্মদ শাহ তাঁর ভাই হুসেনের হাতে নিহত হন। হুসেনও বুহ্‌লুলের সঙ্গে দীর্ঘকাল যুদ্ধ চালিয়ে যান। কিন্তু পরিশেষে চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়ে বিহারে পলায়ন করেন। জৌনপুর অতঃপর দিল্লীর অধীনে আসে।

মেওয়াট, সম্ভল, কোল, সাকিৎ, এটাওয়া, রাপ্রি, ভোলগাঁও, গোয়ালিয়র প্রভৃতি স্থানের শাসকগণ জৌনপুরের শার্কিদের প্রতিই আনুগত্যসম্পন্ন ছিলেন, কিন্তু শার্কিদের পতনের পর তাঁরা আনুগত্য পরিবর্তন করেন বুহ্‌লুলের অনুকূলে। বুহ্‌লুলের আমলে মুলতানে লংকাহ্‌দের বিদ্রোহ ঘটেছিল যা তিনি দমন করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তৎকালীন মালবের অধিকারাধীন অনহনপুর দখল করতেও তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন।

বুহ্‌লুল দিল্লী সুলতানীকে কিছুটা চাঙ্গা করেছিলেন সন্দেহ নেই। তিনি যথেষ্ট বিচক্ষণ ও পরধর্ম সহিষ্ণু ছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর রাজ্য, আত্মীয় স্বজন ও অনুগত আফগান আমীরদের মধ্যে ভাগ করে দেন। পুত্র বারবককে তিনি জৌন-

পুরের শাসক নিযুক্ত করেন। অপর পুত্র আলম খান পান মানিকপুর, ভাগ্নে কালা-পাহার পান ভরইচ, নাতি আজম হুমায়ুন পান লক্ষ্ণৌ এবং কাম্পি এবং খান জাহান লোদী পান বুদাউন। তাঁর পুত্র নিজাম খানকে তিনি নিজের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন এবং তাঁর হাতে পাঞ্জাব, দিল্লী ও দোয়াব অঞ্চলের অধিকার প্রদান করেন।

৬ ॥ সিকন্দর লোদী (১৪৮৯—১৫১৭)

১৪৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বুহলুল লোদীর মৃত্যু হলে তাঁর মনোনীত উত্তরাধিকারী সুলতানী লাভ করে সিকন্দর শাহ উপাধি গ্রহণ করেন। সিংহাসনের আরও দাবিদার ছিল, কিন্তু সিকন্দরকে প্রত্যক্ষভাবে লড়তে হয়েছিল তাঁর ভাই বারবকের সঙ্গে। কনৌজের নিকট একটি যুদ্ধে বারবক পরাজিত হলেও সিকন্দর তাঁকে ক্ষমা করেছিলেন ও জৌন-পুরের শাসক হিসাবে বহাল রেখেছিলেন।

কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই জৌনপুরের জমিদাররা এবং সেই সঙ্গে বাচগোই উপজাতির লোকেরা বিদ্রোহী হয়। বারবক বিদ্রোহ দমন না করে পালিয়ে যান। সিকন্দর এই বিদ্রোহ দমন করেন। বাচগোই উপজাতির নেতা জুগা জৌন্দ দুর্গে নির্বাসিত জৌনপুরের প্রাক্তন সুলতান হুসেন শার্কির নিকট আশ্রয় নেন। সিকন্দর তাঁর অনুসরণে জৌন্দ পর্যন্ত ধাওয়া করেন, এবং হুসেন শার্কিকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেন। নির্দেশ না মেনে হুসেন যুদ্ধ করেন, এবং পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন। ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দে শক্তি সঞ্চয় করে তিনি পুনরায় বারানসীর নিকট সিকন্দরের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। এবারেও পরাজিত হয়ে তিনি বঙ্গদেশে পালিয়ে যান এবং কোলগঙ্গ নামক স্থানে বাংলার সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহের বৃত্তিভোগী হয়ে বাস করতে থাকেন। ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে সিকন্দর বঙ্গদেশে একটি অভিযান প্রেরণ করেন, যার উদ্দেশ্য ছিল বঙ্গদেশের সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহ্‌র সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসা। এই উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল কোন যুদ্ধ না করেই। হুসেন শাহ সিকন্দরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তাঁর কোন শত্রুকে তিনি আশ্রয় দেবেন না।

১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে মালবের সুলতান নাসিরুদ্দীনের পুত্র শিহাবুদ্দীন পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন, কিন্তু নাসিরুদ্দীন তাঁকে চান্দেরী নামক স্থানে পরাজিত করে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র দ্বিতীয় মাহমুদকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। কিন্তু

তাঁর অপর পুত্র সাহিব খান এই মনোনয়নে খুশি না হয়ে সিকন্দরের সাহায্য চান। সিকন্দর তাঁর সাহায্যে একটি বাহিনী পাঠান, কিন্তু তাদের কাছ থেকে কোন সাহায্য পাবার আগেই সাহিব খান তাঁর নিজের লোকদের সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে সিকন্দরের আশ্রয় প্রার্থী হন। তাঁকে চান্দেরীতে ফেরত পাঠানো হয় যেখানে তিনি কার্যত অন্তরীণ থাকেন এবং ওই অঞ্চলের শাসনকার্য সিকন্দরের আমীরগণ কর্তৃকই পরিচালিত হয়।

গোয়ালিয়রের রাজা বুহ্‌লুলের বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন এবং সিকন্দরের আমলে তা বজায় রেখেছিলেন। ধোলপুরের বিদ্রোহী রাজাকে আশ্রয় দিলে অসন্তুষ্ট সুলতান ১৫০২ খ্রীষ্টাব্দে গোয়ালিয়র আক্রমণ করেন। রাজা তদণ্ডে বশ্যতা স্বীকার করলেও, কিছুকাল পরে ধোলপুর থেকে প্রত্যাবর্তনরত সুলতানের সৈন্য-বাহিনীর উপর আক্রমণ করেন। তিনি পরাজিত হলেও, আসন্ন বর্ষার আশংকায় সুলতান তাঁর প্রতি ধাওয়া না করে স্বস্থানে প্রস্থান করেন, ফলে গোয়ালিয়র সে যাত্রায় বেঁচে যায়। ১৫০৫ খ্রীষ্টাব্দে মান্দরাইল এবং ১৫০৭ খ্রীষ্টাব্দে উৎগীর সিকন্দরের বশ্যতা স্বীকার করে। এর পর তিনি নারওয়ার জয় করেন এবং সেখানে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন।

১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে সিকন্দর রেওয়ার বাঘেলবংশীয় রাজা রাই ভইদচন্দ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন, কিন্তু রাজা পলায়ন কালে মারা গেলে সিকন্দর জৌনপুরে প্রত্যাবর্তন করেন। ভইদচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র লক্ষ্মীচন্দ্র পূর্বোক্ত জৌনপুরের প্রাক্তন শাসক হুসেনের সঙ্গে সিকন্দর বিরোধী চক্রান্ত করেন। কিন্তু ভইদচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র শালিবাহন সিকন্দরের পক্ষে থাকেন এবং হুসেন শার্কির বিরুদ্ধে তাঁকে সাহায্য করেন। কিন্তু উভয়ের সুসম্পর্ক বেশিদিন থাকেনি। শালিবাহনকে শায়েস্তা করার জন্য সিকন্দর বান্দুগড় পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন, কিন্তু ওখানকার দুর্গ অধিকার করতে না পেরে জৌনপুরে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। নাগোরের শাসক মুহম্মদ খান সিকন্দরের বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন।

১৫০৪ খ্রীষ্টাব্দে সিকন্দর আগ্রায় তাঁর রাজধানী স্থানান্তরিত করেছিলেন। তিনি মারা গিয়েছিলেন ১৫:৭ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে নভেম্বর তারিখে।

৭॥ ইব্রাহিম লোদী (১৫১৭-২৬)

সিকন্দরের পুত্র ইব্রাহিম লোদী বিনা বাধায় সিংহাসনে আরোহণ করে তাঁর ভাই জালাল খানকে জৌনপুরের স্বাধীন শাসক হিসাবে নিযুক্ত করেন। কিন্তু কয়েকজন আমীরের পরামর্শে যখন তিনি বুঝলেন যে কাজটা বুদ্ধিমানের মত হয়নি, তখন তিনি জালালকে জৌনপুরের সিংহাসন গ্রহণ থেকে প্রতিনিবৃত্ত হতে নির্দেশ দিলে জালাল তা মানতে অস্বীকার করেন। জালাল রাজি না হওয়ায় তিনি জৌনপুরের রাজকর্মচারী ও পদাধিকারীদের নির্দেশ দেন যাতে তাঁরা জালালকে রাজা হিসাবে না মানেন। ফলে জালাল জৌনপুর ত্যাগ করে নিজ জমিদারী কাল্পিতে ফিরে আসেন। তারপর কয়েকজন আমীরের সহায়তায় তিনি অবধ দখল করেন। শেষ পর্যন্ত ইব্রাহিমের সেনাপতি মালিক আদমের মধ্যস্থতায় স্থির হয় যে কাল্পির জমিদারীর পাকা বন্দোবস্তের বিনিময়ে জালাল দিল্লীর সিংহাসনের দাবি ত্যাগ করবেন। কিন্তু ইব্রাহিম পুরোপুরি জালালের হাত থেকে রেহাই পেতে চেয়েছিলেন, এবং বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক তাঁকে হত্যা করান।

রাজত্বের সূচনায় ইব্রাহিম দুটি যুদ্ধ করেছিলেন। প্রথম যুদ্ধের দ্বারা তিনি গোয়ালিয়র অধিকার করেছিলেন। দ্বিতীয় যুদ্ধে তিনি মেবারের রাণা সাঙ্গার নিকট শোচনীয় ভাবে পরাজিত হয়েছিলেন।

জালাল খানের বিদ্রোহের ফলে ইব্রাহিম নিজ অনুগতদের প্রতি সংশয়াপন্ন হয়েছিলেন। আফগান আমীরদের সমর্থনের উপরই তদানীন্তন দিল্লী সুলতানী নির্ভরশীল ছিল। ইব্রাহিম তাদেরই শত্রু করে তুলেছিলেন। আজম হুমায়ুন সারওয়ানি, যাঁর প্রচেষ্টায় গোয়ালিয়র দখল হয়েছিল, এবং মিয়াঁ ভুওয়া যিনি সিকন্দরের সময় থেকে ওয়াজির ছিলেন, উভয়কেই ইব্রাহিম কারারুদ্ধ ও নিহত করেন। সারওয়ানির পুত্র ইসলাম খান বিদ্রোহ করলে তাঁকে পরাজিত ও নিহত করা হয়।

এই সকল ঘটনায় আমীরকুল বিচলিত হয়ে ওঠে। বিস্ফোরনের সূত্রপাত হয় পূর্বাঞ্চল থেকে। বাহার খান লোহানীর নেতৃত্বে বিদ্রোহী আমীররা সংঘবদ্ধ হয়, এবং তাঁকে সমর্থন করেন গাজীপুরের শাসক নাসির খান লোহানী, নিহত আজম হুমায়ুন সারওয়ানীর পুত্র ফথ্ খান এবং শের খান শূর (পরবর্তীকালের বিখ্যাত শের শাহ)।

যখন ইব্রাহিমের বাহিনী পূর্বাঞ্চলীয় এই বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিরত, তখন

পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খান কাবুলের অধিপতি বাবুরের নিকট ইব্রাহিম লোদীর বিরুদ্ধে সহায়তা প্রার্থনা করেন। ইব্রাহিমের পিতৃব্য গুজরাতের শাসক আলম খানও ইব্রাহিমের অপসারণের ব্যাপারে বাবুরের সাহায্য চান। বাবুর ১৫২৪ খ্রীষ্টাব্দে ইব্রাহিম প্রেরিত বাহিনীকে পরাজিত করে লাহোর অধিকার করেন, এবং নিজ লোকদের হাতেই পাঞ্জাবের শাসনভার ন্যস্ত করেন, দৌলতখানকে কোন আমল না দিয়ে। বঞ্চিত ও ক্ষুব্ধ দৌলতখান অতঃপর আলম খানের সহায়তায় দিল্লী সুলতানী দখলের অভিপ্রায়ে ১৫২৫ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লী আক্রমণ করেন, কিন্তু ইব্রাহিমের হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। অনুকূল পরিস্থিতি বুঝে বাবুর সরাসরি তখন দিল্লী অভিযান করেন। ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দের ২০ শে এপ্রিল তারিখে পাণিপথ নামক স্থানে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেও ইব্রাহিম পরাজিত ও নিহত হন। দিল্লী অতঃপর মুঘল অধিকারে আসে।

ইব্রাহিম যোদ্ধা হিসাবে দুর্ধর্ষ, সুশাসক, উদার ও ব্যক্তিগত জীবনে কলঙ্কশূন্য ছিলেন। কিন্তু কিছুটা নির্বোধের মত কূটনীতির অপপ্রয়োগ করে চারদিকে অসংখ্য ব্যক্তিগত শত্রু সৃষ্টি করেছিলেন, আর সেটাই ছিল তাঁর পতনের প্রত্যক্ষ কারণ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আঞ্চলিক ইতিহাস

(পশ্চিম, উত্তর ও মধ্যভারত)

১ ॥ ভূমিকা

কার্যত দিল্লী-সুলতানীর মূল এলাকা ছিল দিল্লী ও তার সন্নিহিত অঞ্চল। ভারতের অপরাপর অঞ্চলগুলি মোটামুটি স্বাধীন রাজ্য হিসাবেই বর্তমান ছিল, যদিও সেগুলির মধ্যে অনেকগুলি কাগজে কলমে দিল্লীর অধীনতা মানত এবং দিল্লী সুলতানীকে বার্ষিক কর প্রদান করত। এই রাজ্যগুলি ছিল গুজরাত, খান্দেশ, মালব, জৌনপুর, সিন্ধু ও মুলতান। দিল্লী-সুলতানীর দুর্বলতার সুযোগে এই সব রাজ্যগুলি প্রায়ই দিল্লীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে পুরোপুরি স্বাধীন হয়েছে, আবার কেন্দ্রে শক্তিমান শাসন এলে, পরাজিত হয়ে দিল্লীর বশ্যতা স্বীকার করেছে।

এ ছাড়া আরও কয়েকটি রাজ্য ছিল যাদের সঙ্গে দিল্লী সুলতানীর সম্পর্ক থাকলেও সেটা ঠিক অধীনতার সম্পর্ক ছিল না। এরা হয়ত দিল্লী সুলতানীর একটা সার্বভৌমত্ব স্বীকার করত, কিন্তু দিল্লী সুলতানীর প্রতি এদের কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। এই শ্রেণীর রাজ্যগুলির মধ্যে ছিল সুদূর দক্ষিণের পাণ্ড্যদেশ বা মা'বার এবং বঙ্গদেশ। যে সকল রাজ্য পুরোপুরি স্বাধীন ছিল সেগুলির মধ্যে দক্ষিণের বহমনীরাজ্য ও বিজয়নগর, রাজস্থানে মেবার ও মারওয়ার, ওড়িষ্যা, কাশ্মীর, আসাম প্রভৃতি। আমরা একে একে রাজ্যগুলি ধরে আলোচনা করছি।

২ ॥ সিন্ধু

৮৭২ থেকে ৯০৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সিন্ধু সাফারীদের অধীনে ছিল, এবং তাদের পতনের পর বৃহত্তর সিন্ধু অঞ্চল দুটি রাজ্যে ভাগ হয়ে যায়, মনসুরা এবং মুলতান। দশম শতকের শেষ পর্যন্ত দুটি রাজ্যই সামানীদের অধিকারে ছিল। এই দুটিই ছিল মূলত উপজাতীয় শক্তি। ১০১০ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান মাহমুদ মুলতান অধিকার করেন, এবং মনসুরাতেও তাঁর অধিকার বিস্তৃত হয়। তাঁর পুত্র মাসুদের আমলে সুমরা

উপজাতি বিদ্রোহ করে ক্ষমতা দখল করে। এই সুমরারা ছিল কিছুটা হিন্দু, কিছুটা মুসলমান। এদের প্রথম শাসকের নামও সুমরা। শেষ শাসকের নাম হমীর। মধ্যবর্তী কয়েকজন শাসকের নামও পাওয়া গেছে যেমন সুমরার পুত্র ভূদা যিনি মসরপুর জয় করেছিলেন (মৃত্যু ১০৯২ খ্রী:); তাঁর পুত্র সিংঘার যাঁর পনের বছর রাজত্বকালে কচ্ছের কিয়দংশ অধিকৃত হয়েছিল, তাঁর পত্নী হাসুন; ভূদার বংশধর পিথু যিনি দ্বাদশ শতকের শেষের দিকে বর্তমান ছিলেন; খইরা; খফিফ; উমর; দ্বিতীয় ভূদা; প্রভৃতি। মুহম্মদ বিন তুঘলকের অভিযানের ফলে সুমরাদের ক্ষমতা চূর্ণ হয়ে যায়।

চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি সুমরাদের পতনের পর সম্মা নামক একটি রাজবংশ সিন্ধুতে অধিষ্ঠিত হয়। এই বংশের রাজারা জাম উপাধি গ্রহণ করেছিলেন এবং নিজেদের পৌরাণিক জামশিদের বংশধর বলে পরিচয় দিতেন। এই বংশের ষোল জন রাজার পরিচয় পাওয়া গেছে, উনর থেকে ফিরুজ পর্যন্ত, যাঁরা ১৩৩৫ থেকে ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। এই বংশের দ্বিতীয় রাজা জুনান (১৩৩৯-১৩৫২) দিল্লীর সুলতান ফিরুজ শাহ তুঘলকের অনুগত থাকলেও তৃতীয় রাজা বনবিনা ফিরুজের বিরোধী ছিলেন। তিনি মঙ্গোলদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিলেন এবং কয়েকবার গুজরাত ও পাঞ্জাবে আক্রমণ চালিয়েছিলেন।

প্রথমে সুলতান ফিরুজ বনবিনার বিরুদ্ধে প্রাক্তন এবং স্থানীয় ভাবে টিঁকে থাকা শেষ সুমরা শাসক হমিরকে শক্তিমান করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাতে কোন কাজ না হওয়ায় তিনি ১৩৬৩ থেকে ১৩৬৭ পর্যন্ত সিন্ধু অভিযান করেন এবং জুনান ও বনবিনা উভয়কেই বন্দী করে দিল্লীতে নিয়ে যান। সিন্ধুর শাসনভার ন্যস্ত হয় জুনানের পুত্র এবং বনবিনার ভাই তমাচীর উপর। কিন্তু তমাচী বিদ্রোহী হলে ফিরুজ জুনানকে সিন্ধুর দায়িত্ব দিয়ে ফেরৎ পাঠিয়ে দেন, কেননা জুনান ফিরুজের অনুগত ছিলেন। জুনান তাঁর পুত্র তমাচীকে জামিনস্বরূপ দিল্লীতে পাঠিয়ে দেন এবং ১৩৮০ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ১৩৮৮ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান ফিরুজ শাহ্‌র মৃত্যু ঘটলে তাঁর উত্তরাধিকারী গিয়াসুদ্দীন বনবিনাকে সিন্ধুতে ফেরৎ পাঠিয়ে দেন। কিন্তু পথে তটদ্বায় বনবিনার মৃত্যু হয়।

এদিকে দিল্লী সুলতানীর দুর্বলতার সুযোগে সিন্ধুর সম্মা শাসকরা পুরোপুরি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। পরবর্তী রাজাদের নাম পাওয়া গেলেও তাঁদের রাজ্যকালের কোন খবর পাওয়া যায় না। পঞ্চদশ জাম নন্দার আমলে ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কান্দাহারের শাহ্ বেগ আরঘুন সিন্ধু আক্রমণ করেন এবং সেউই-এর দুর্গ অধিকার

করেন। নন্দা সেউই-এর দুর্গ পুনরুদ্ধার করলেও, শাহ বেগ পুনরায় অভিযান চালিয়ে সেউই সহ ভক্কর ও সেহ্ওয়ানের দুর্গও অধিকার করেন। নন্দা এগুলি পুনর্দখল করতে ব্যর্থ হন। ১৫০৮ খ্রীষ্টাব্দে নন্দা মারা গেলে তাঁর পুত্র ফিরুজ জ্ঞাতি সলাউদ্দীন ও ওয়াজির দরিয়া খানের চক্রান্তে দুবার সিংহাসন হারান এবং শেষ পর্যন্ত কান্দাহারের শাহ বেগ আরঘুনের সাহায্যে শত্রুদের নির্মূল করে সিংহাসন দখল করেন। কিন্তু এবারেও তিনি সিংহাসন বজায় রাখতে পারেন নি। শাহ্ বেগ আরঘুন কান্দাহার থেকে বাবুর কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে সিন্ধুদেশ দখল করে ফিরুজকে হটিয়ে সেখানেই গেড়ে বসেন।

৩॥ মুলতান

১০০৫-০৬ এবং ১০১০ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান মাহ্মুদ দুবার আক্রমণ চালিয়ে মুলতানের অধিপতি আবুল ফথ দাউদকে পরাজিত করে মুলতান অধিকার করেন। ইয়ামিনিদের পতনের পর মুলতান স্বাধীন হয়ে যায় কিন্তু মুহম্মদ ঘুরী কর্তৃক তা পুনরাধিকৃত হয়। মুহম্মদ ঘুরীর মৃত্যুর পর মুলতান তাঁর অনুচর নাসিরুদ্দীন কুবাচার ভাগে পড়ে। কুবাচা ১২২৭ খ্রীষ্টাব্দে মঙ্গোল আক্রমণের হাত থেকে মুলতানকে রক্ষা করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইলতুৎমিশ মুলতান দখল করে নেন। দিল্লী সুলতানীর পশ্চিম সীমান্ত হিসাবে মুলতানকে বারবার মঙ্গোল আক্রমণের ধাক্কা সামলাতে হয়েছিল। তাছাড়া কার্যত মুলতানের মালিক ছিলেন হাসান কারলুঘ, যাঁর সঙ্গে দিল্লী সুলতানীর তুর্কীগোষ্ঠীর কোন সম্পর্ক ছিল না। এই লোকটি ছিলেন মঙ্গোলদের দ্বারা বিতাড়িত খওয়ারিজম্ তুর্ক বংশীয় খিবার রাজকুমার জালালুদ্দীন মঙ্গবরনীর অনুচর।

দিল্লী সুলতানীতে যখন মাসুদ অধিষ্ঠিত (১২৪৩ খ্রীঃ), তখন মুলতানের দিল্লী মনোনীত শাসক কবীর খান বিদ্রোহ করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন, এবং উচ দখল করেন। তাঁকে বা তাঁর পুত্র আবুবক্রকে সরানো দিল্লী সুলতানীর পক্ষে সম্ভব হয় নি। তবে আবুবক্র মারা গেলে হাসান কারলুঘ ১২৪৫ খ্রীষ্টাব্দে মুলতান পুনরুদ্ধার করেন এবং নিজ প্রভু জালালুদ্দীন মঙ্গবরণীর নামে মুদ্রা প্রচলন করেন। কিন্তু পর বৎসরই অর্থাৎ ১২৪৬ খ্রীষ্টাব্দে মঙ্গোল আক্রমণের ধাক্কায় হাসান কারলুঘ দক্ষিণ সিন্ধুতে পালিয়ে যান। এই শূন্যতার সুযোগে গিয়াসুদ্দীন বলবন মুলতান ও উচ বিনা বাধায় দখল করেন, এবং মঙ্গোল আক্রমণ থেকে মুলতানকে রক্ষা করার জন্য নিজপুত্র মুহম্মদকে মুলতানের শাসক নিযুক্ত করেন। একটি মঙ্গোল আক্রমণ

প্রতিহত করার সময় ১২৮৫ খ্রীষ্টাব্দে মুহম্মদ মারা গেলেও মুলতান দীর্ঘকাল দিল্লী সুলতানের অধীনে ছিল।

তৈমুর ভারতবর্ষ আক্রমণ করার পর খিজির খানকে মুলতানের শাসক নিযুক্ত করেন। এই খিজির খানই পরে দিল্লীতে সৈয়দ বংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর উত্তরাধিকারী মুবারকের আমলে কাবুলের আমীর শেখ আলির মুলতান আক্রমণ দু'বার প্রতিহত হয়। ১৪৩৭-৩৮ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ মুলতান লংকাহ্ উপ-জাতির হামলায় বিপদগ্রস্ত হয়। ১৪৪৩-৪৪ খ্রীষ্টাব্দে মুলতান দিল্লী সুলতানীর অধীনে থাকলেও সেখানে কোন নিয়মিত শাসক ছিলেন না। ফলে সেখানকার জনসাধারণ বিখ্যাত সাধক বহাউদ্দীন জাকরিয়ার সমাধিরক্ষক শেখ ইউসুফ জাকারিয়া কুরেশিকে শাসক হিসাবে নির্বাচিত করে।

দু'বছর শাসনের পর শেখ ইউসুফ লংকাহ্ উপজাতির সর্দার এবং সেউই-এর শাসক রায় সহ্‌রাহ্‌র কৌশলে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে দিল্লী পালিয়ে যান। সহ্‌রাহ্ কুতবুদ্দীন উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেন এবং সুশাসক হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। ১৪৬০ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ বছর রাজত্ব করার পর তিনি মারা গেলে তাঁর পুত্র হুসেন মুলতানের সিংহাসন লাভ করেন। তিনিও জবরদস্ত শাসক ছিলেন। তিনি শোর (বর্তমান সাঙ্গ জেলার শোরকোট) এবং কোট-কারোর দখল করেন এবং নিজ অধিকারকে ধানকোট দুর্গ পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। নির্বাসিত মুলতানের প্রাক্তন শাসক শেখ ইউসুফের প্ররোচনায় বুহ্‌লুল লোদী মুলতানে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। কিন্তু সেই বাহিনী পরাজিত হয়ে পালিয়ে আসে। ১৪৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বুহ্‌লুল মারা গেলে হুসেন তাঁর পুত্র সিকন্দরের সঙ্গে একটি সন্ধি করেন যার শর্ত ছিল কোন পক্ষই কারো সীমানায় হস্তক্ষেপ করবে না। তিনি গুজরাতের সুলতান মুজফ্‌ফ্‌রের সঙ্গেও সৌহার্দ বজায় রেখেছিলেন।

বৃদ্ধ বয়সে হুসেন তাঁর পুত্র ফিরুজকে সিংহাসনে বসিয়ে রাজকার্য থেকে অবসর নেন। ফিরুজ তাঁর ওয়াজির তওয়ালকের পুত্রের বিশ্বস্ততায় সন্দেহ করে তাঁকে হত্যা করান। প্রতিশোধ হিসাবে তওয়ালকও ফিরুজকে বিষপ্রয়োগে নিহত করেন। বৃদ্ধ হুসেন পুনরায় সিংহাসনে আরোহন করে সিন্ধুর জাম বায়জিদের (যিনি স্বদেশ থেকে পালিয়ে এসে হুসেনের অনুগ্রহে শোরাপথের জমিদার হয়েছিলেন) সহায়তায় তওয়ালককে গ্রেপ্তার ও নিহত করেন। অতঃপর বায়জিদ ওয়াজির হন এবং হুসেনের পৌত্র, ফিরুজের পুত্র, মাহমুদের, অভিভাবক পদে নিযুক্ত হন।

১৫০২ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ শে অগষ্ট তারিখে হুসেন মারা গেলে মাহমুদ রাজা হন। তাঁর দুর্বলতার সুযোগে পাঞ্জাবের শাসক দৌলত খান লোদীর সহায়তায় বায়জিদ শোরকোট থেকে ইরাবতী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় নিজস্ব রাজ্যের পত্তন করেন। কয়েক বছর পরই সিন্ধুর শাহ্ হুসেন বেগ আরঘুন মুলতান আক্রমণ করেন। আক্রমণকারীদের সহায়তা করেছিলেন লঙ্গর খান নামক একজন কর্মচারী যিনি সম্ভবত মাহমুদকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেন। কিন্তু মুলতানের আমীর ওমরাহরা মাহ্মুদের শিশুপুত্র দ্বিতীয় হুসেনকে সিংহাসনে বসিয়ে আরঘুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন। ওয়াজির পদে নিযুক্ত হন মাহ্মুদের জামাতা সুজা-উল-মুল্ক বুখারি, যিনি কার্যত মুলতানের শাসক হয়ে দাঁড়ান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়েও আরঘুনের দখল থেকে মুলতানকে রক্ষা করা যায় নি। ১৫২৫ খ্রীষ্টাব্দে মুলতান দখল করে আরঘুন ব্যাপক হত্যা ও ধ্বংসকার্য চালান, এবং পরে জনৈক খাজা শামসুদ্দীনকে মুলতানের ভার দিয়ে তিনি সিন্ধুতে প্রস্থান করেন। লঙ্গরখান তাঁর সহযোগী হয়ে থাকেন, কিন্তু সুযোগমত তাঁকে হটিয়ে নিজেই মুলতানের অধিপতি হন এবং কিছুটা শান্তিশৃংখলা ফিরিয়ে আনেন।

বাবুরের মৃত্যুর পর সমগ্র পাঞ্জাব অঞ্চল তাঁর পুত্র কামরানের ভাগে পড়লে, কামরান লঙ্গরকে লাহোরে ডাকিয়ে তাঁকে বাবল নামক একটি স্থানের অধিকার দিয়ে মুলতান দখল করে নেন। পরবর্তীকালে মুলতান শেরশাহের এবং তার পর মুঘলদের পাকাপাকি অধিকারে আসে।

৪ ॥ গুজরাত

ফিরুজ শাহ তুঘলকের আমলে মালিক মুফর্রহ্, যিনি ফরহাত-উল্-মুল্ক নামেও পরিচিত ছিলেন ১৩৭৭ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাতের শাসক নিযুক্ত হন। তাঁর স্বাধীনতা ঘোষণার অভিপ্রায় দেখে দিল্লীর তরফ থেকে মুজফ্ফর খান নামক এক ব্যক্তিকে গুজরাতের শাসক নিযুক্ত করে পাঠানো হয়, এবং মুজফ্ফর ১৩৯২ খ্রীষ্টাব্দে অনহিলওয়াড়ার নিকটবর্তী কম্বোই নামক স্থানে ফরহাতকে পরাজিত ও নিহত করেন।

১৩৯৪ খ্রীষ্টাব্দে মুজফ্ফরকে অনেকগুলি বিদ্রোহের সম্মুখীন হতে হয়, যেগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল ঈদারের রাজার বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহ দমিত হয়েছিল কিনা বলা যায় না কেননা ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দের চিতোরের রাণা ক্ষেত্রসিংহের কুম্ভলগড় লেখে ইদারের রাজা রণমল্লকে এই যুদ্ধে বিজয়ী হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

ওই বছরই খান্দেশের রাজা নাসির নন্দুরবার অঞ্চলটি লুণ্ঠন করেন। এই সকল ধাক্কা সামলে মুজফ্‌ফর ১৩৯৫ খ্রীষ্টাব্দে সোমনাথ মন্দির ধ্বংস করেন। ওই অঞ্চলে তিনি দ্বিতীয়বার অভিযান করেন ১৪০১ খ্রীষ্টাব্দে। তৈমুরের আক্রমণের সময় দিল্লীর সুলতান মাহ্‌মুদ মুজফ্‌ফরের আশ্রয় প্রার্থী হন, কিন্তু সেখানে যথাযোগ্য সমাদর না পাওয়ায় মালবে চলে যান।

১৪০৩ খ্রীষ্টাব্দে মুজফ্‌ফর খানকে বন্দী করে তাঁর পুত্র তাতার খান ক্ষমতা দখল করেন। তাতার খান পূর্বে দিল্লী সুলতানের ওয়াজির ছিলেন, কিন্তু তুঘলক আমলের শেষের দিকের গণ্ডগোলের সময়ে তিনি মল্লু ইকবাল কর্তৃক বিতাড়িত হন। ক্ষমতা দখল করে তাতার দিল্লী অভিযান করেন, কিন্তু পথে সিনোর নামক স্থানে তিনি তাঁর পিতৃব্য শামস খান কর্তৃক বিষপ্রযুক্ত হয়ে নিহত হন। শামস খান মুজফ্‌ফরকে কারামুক্ত করেন এবং আমীরদের অনুরোধে ১৪০৭ খ্রীষ্টাব্দে মুজফ্‌ফর নিজেকে স্বাধীন সুলতান হিসাবে ঘোষণা করেন। সেই বছরই তিনি মালব আক্রমণ করে রাজধানী ধার দখল করেন এবং সেখানকার রাজা হুসঙ্গকে বন্দী করেন। পরে তিনি হুসঙ্গকে মুক্ত করে তাঁকে আবার মালব ফিরিয়ে দেন।

১৪১০-১১ খ্রীষ্টাব্দে মুজফ্‌ফর মারা গেলে তাঁর পৌত্র, তাতার খানের পুত্র, আহমদ শাহ সুলতান হন। সিংহাসন লাভের পরই তাঁকে তাঁর পিতৃব্যদের বিদ্রোহ দমন করতে হয়। এই সুযোগে মালবের রাজা হুসঙ্গ গুজরাত আক্রমণ করেছিলেন, কিন্তু বিশেষ সুবিধা করতে পারেন নি। শের মালিক নামক একজন বিদ্রোহী গুজরাতী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে আশ্রয় দেবার জন্য আহমদ শাহ গির্নার আক্রমণ করে-ছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত গির্নারের দুর্গ অবরোধ করে রাখতে ব্যর্থ হয়ে তিনি একটা বার্ষিক করপ্রদানে সেখানকার রাজাকে স্বীকৃত করে ১৪১৫ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ ফিরে আসেন।

১৪১৭ খ্রীষ্টাব্দে খান্দেশের একার্ধের শাসক নাসির মালবের হুসঙ্গের সহায়তায় খান্দেশের অপরার্ধের শাসক নাসিরের ভ্রাতা ইফতিখারকে বন্দী করেন। তারপর উভয়ের যুক্ত বাহিনী গুজরাতের সুলতানপুর আক্রমণ করে কিন্তু আহমদ প্রেরিত বাহিনী কর্তৃক তা প্রতিহত হয়। আহমদ নাসিরকে বন্দী করতে সমর্থ হন, কিন্তু নাসির বশ্যতা স্বীকার করলে গোটা খান্দেশের উপরই তাঁর দাবি আহমদ মেনে নেন। ইফতিখার গুজরাতে আশ্রয় প্রাপ্ত হন।

১৪১৬ খ্রীষ্টাব্দে চাম্পানের, মণ্ডলগড় ও ঈদারের হিন্দু শাসকগণ আহমদের বিরুদ্ধে

একটি শক্তি জোট গঠন করেন, এবং এই শক্তিজোটকে সমর্থন করেন মালবের সুলতান হুসঙ্গ। ফলে আহমদ ১৪১৯, ১৪২০ এবং ১৪২২ খ্রীষ্টাব্দে তিনবার মালব আক্রমণ করেছিলেন। কিন্তু তা কোন ফল প্রসব করেনি। অনেক পরে ১৪৩৮ খ্রীষ্টাব্দে মালবের সিংহাসন নিয়ে গণ্ডগোল বাধলে আহমদ সেই সুযোগে মালবের ব্যাপারে সশস্ত্র হস্তক্ষেপ করেন। কিন্তু বহুকাল নিষ্ফল যুদ্ধ করা ভিন্ন তাঁর কোন লাভ হয়নি।

১৪২৯ খ্রীষ্টাব্দে ঝালাওয়ারের রাজা কৃষ্ণের অনুরোধে দাক্ষিণাত্যের বহমনী রাজের আহমদ শাহ বহমনী দুবার গুজরাত আক্রমণ করে পরাজিত হন এবং তার ফলে থানা ও মাহিম এই দুটি অঞ্চল গুজরাতের অধিকারে আসে। ১৪৩২ খ্রীষ্টাব্দে আহমদ পানাগড়ের শাসককে পরাজিত করেন, নন্দোদ শহর ধ্বংস করেন এবং দুঙ্গর পুর, কোটা ও বুন্দীর শাসকদের কাছ থেকে কর আদায় করেন। কিন্তু বিভিন্ন লেখমালার সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে এই সব অঞ্চলে তিনি বিশেষ সাফল্যলাভ করেননি।

১৪৪৩ খ্রীষ্টাব্দে আহমদ শাহ মারা গেলে তাঁর পুত্র দ্বিতীয় মুহম্মদ শাহ গুজরাতের সুলতান হন। তিনি ঈদারের রাজা হরি রায় ও দুঙ্গরপুরের রাজা গণেশকে পরাজিত করেছিলেন। ১৪৪৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চাম্পানের আক্রমণ করেন। কিন্তু সেখানকার রাজা কনক দাস মালবের সুলতানের সহায়তায় তাঁকে প্রতিহত করেন।

১৪৫১ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় মুহম্মদ শাহ মারা গেলে তাঁর পুত্র কুতবুদ্দীন আহমদ শাহ রাজা হন। মালবের সুলতান মাহমুদ খলজী ওই বছরেই গুজরাত আক্রমণ করে ব্রোচ পর্যন্ত অগ্রসর হন কিন্তু কুতবুদ্দীনের হাতে পরাজিত হয়ে তিনি পলায়ন করতে বাধ্য হন। ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে মহারাণা কুম্ভ গুজরাতের অধিকার থেকে নাগৌর অঞ্চলটি দখল করেন। কুতবুদ্দীনের প্রেরিত বাহিনী ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ফলে ১৪৫৬ খ্রীষ্টাব্দে কুতবুদ্দীন কুম্ভকে দমন করার জন্য কুম্ভলগড় অভিযান করেন। এবারে কুম্ভ পরাজিত হয়ে প্রচুর কর প্রদানে বাধ্য হন। কিন্তু সেই অবসরে মালবের সুলতান মাহমুদ খলজীর পুত্র গিয়াসুদ্দীন গুজরাত আক্রমণ করেন এবং সুরাট পর্যন্ত অগ্রসর হন, কিন্তু কুতবুদ্দীনের প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পেয়ে প্রত্যাগমন করেন। অতঃপর তাঁর সঙ্গে মালবের একটা সন্ধিচুক্তি হয়। ১৪৫৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে কুতবুদ্দীন কয়েকবার কুম্ভলগড় আক্রমণ করেন এবং শেষবার আক্রমণ করেন মালবের সুলতানের সঙ্গে একযোগে। মধ্যযুগীয় ঐতিহাসিক নিজামুদ্দীনের মতে কুম্ভ পরাজিত হয়ে কুতবুদ্দীনের

সঙ্গে সন্ধি করেন। পক্ষান্তরে রাজপুত লেখমালা থেকে (চিতোর কীর্তিস্তম্ভ লেখ) জানা যায় যে কুম্ভ গুজরাত ও মালবের যুগ্মবাহিনীকে পরাজিত করেছিলেন।

১৪৫৮ খ্রীষ্টাব্দে কুতবুদ্দীন মারা গেলে গুজরাতের আমীরগণ তাঁর পিতৃব্য দাউদ খানকে সিংহাসনে বসান। কিন্তু মাত্র কয়েক দিন পর তাঁকে অপসারণ করে দ্বিতীয় মুহম্মদ শাহের অপর এক পুত্র ফথ খানকে সিংহাসন দেওয়া হয়। ফথ খান, মাহমুদ বেগরহ্ নাম গ্রহণ করেন। ১৪৬১ খ্রীষ্টাব্দে মালবের মাহমুদ খলজী বহমনী রাজ্য আক্রমণ করলে বেগরহ্ খান্দেশে হাজির হয়ে মালববাহিনীর প্রত্যাবর্তনের পথ রুদ্ধ করে দেন। এরপর তিনি মাহ্মুদ খলজীকে এই বলে শাসান যে পুনর্বার যদি মালব বহমনী রাজ্য আক্রমণ করে তিনিও পাল্টা মালব আক্রমণ করবেন। ১৪৬৬ ও ১৪৬৭ খ্রীষ্টাব্দে বেগরহ্ গির্ণারে হানা দেন এবং সেখানকার রাজা মণ্ডলিককে কর প্রদানে বাধ্য করেন। কিন্তু ১৪৬৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সরাসরি গির্ণার দখল করে নেন। ১৪৭২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সিন্ধু দেশে তাঁর মাতামহ জাম নন্দাকে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সাহায্যের জন্য একটি বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন। ১৪৮২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চাম্পানের অধিকার করেন, এবং তারপর পারাগড় দুর্গ অবরোধ করেন যা অধিকৃত হয় ১৪৮৪ খ্রীষ্টাব্দে। চাম্পানেরের তিনি নূতন নাম দেন মুহম্মদাবাদ। ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বাহাদুর গিলানীকে পরাজিত করে সমগ্র কোঙ্কন অঞ্চল দখল করেন। নিজ এলাকার আশে পাশে মাহমুদ নিজেকে দুর্ধর্ষ যোদ্ধা হিসাবে প্রতিপন্ন করলেও পোর্তুগীজদের বিরুদ্ধে তিনি দৃঢ়তা দেখাতে পারেননি। ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে পোর্তুগীজদের বিরুদ্ধে মিশরের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা একটি শক্তিজোটের তিনি শরিক ছিলেন। ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে সেই শক্তিজোট পরাজিত হয়। ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে পোর্তুগীজরা বিজাপুরের আদিল শাহী সুলতানদের নিকট থেকে গোয়া দখল করে নিলে বেগরহ তা মেনে নেন, এবং পোর্তুগীজদের খুশি করার অভিপ্রায়ে তিনি মিশরের সঙ্গে মিত্রতাবন্ধন ছিন্ন করেন।

বেগরহের পর ১৫১১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর পুত্র খলিল খান দ্বিতীয় মুজফ্ফর শাহ নাম নিয়ে গুজরাতের সিংহাসনে আসীন হন। ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দের কিছু আগে তিনি ঈদারের রাজা ভীমসিংহকে পরাজিত করে তাঁকে কর প্রদানে বাধ্য করেন। ভীমসিংহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ভর্মল এবং ভ্রাতুষ্পুত্র রাইমলের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে বিরোধ হলে মুজফ্ফর ভর্মলের পক্ষ সমর্থন করেন। রাইমলের পক্ষে আসেন মেবারের মহারাণা সাঙ্গা। শেষ পর্যন্ত অবশ্য গদীতে রাইমলই থাকেন। মুজফ্ফর বাগাড়, ডুঙ্গরপুর এবং বান্সওয়ারাতে উল্লেখযোগ্য বিজয়লাভ করেছিলেন। ১৫১৯-এর কিছু আগে

মেদিনী রায় মালবের সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদকে হটিয়ে ক্ষমতা দখল করলে মুজফ্‌ফর মাণ্ডু দখল করে শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় মাহ্‌মুদকে মালব পুনরুদ্ধার করে দেন। কিন্তু ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে মেবারের মহারাণা সাঙ্গা পুনরায় মালব দখল করেন। সংবাদ পেয়ে মুজফ্‌ফর মালবে সৈন্য পাঠান। কিন্তু তার আগেই সাঙ্গার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে দ্বিতীয় মাহমুদ হৃত সিংহাসন ফিরে পান। মহারাণা সাঙ্গার সঙ্গে মুজফ্‌ফরের কয়েকটি ছোটখাট যুদ্ধ হয়েছিল। সেগুলির ফলাফল সম্পর্কে কিছু স্পষ্ট জানা যায় না। সাঙ্গা পরে বাবুরের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন, এবং মুজফ্‌ফরের পুত্র বাহাদুর সাঙ্গার আশ্রয় নিয়েছিলেন, যা থেকে প্রমাণিত হয় যে সাঙ্গা রীতিমত শক্তিশালী রাজা ছিলেন। ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে মুজফ্‌ফরের মৃত্যু হলে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র সিকন্দর গুজরাতের সিংহাসনে আসীন হন।

৫ ॥ মালব

মালবের সুলতানী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন দিলাবার খান ঘুরী যিনি ১৩৯০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সুলতান ফিরুজ শাহ তুঘলক বা তাঁর উত্তরাধিকারীর দ্বারা মনোনীত হয়েছিলেন। তৈমুরের আক্রমণের সময় তিনি তুঘলক সুলতান মাহমুদকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। ১৪০১ খ্রীষ্টাব্দে মাহ্‌মুদ দিল্লী ফিরে গেলে দিলাবার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

১৪০৫ খ্রীষ্টাব্দে দিলাবার মারা গেলে তাঁর পুত্র অল্‌প খান হুসঙ্গ শাহ নাম নিয়ে সিংহাসনারোহণ করেন। তাঁকে প্রথমেই গুজরাতের মুজফ্‌ফর শাহের আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয় এবং তিনি পরাজিত ও বন্দী হন। মুজফ্‌ফর হুসঙ্গের ভাই নুসরৎকে মালবের গদীতে বসিয়ে দেন। কিন্তু তাঁর শাসন এতই কদর্য ছিল যে বিদ্রোহের ফলে তিনি মালব পরিত্যাগ করেন। তখন হুসঙ্গ মুজফ্‌ফরের কাছে আবেদন করেন যে তাঁকে যেন মুজফ্‌ফরের অধীন হিসাবেই মালবের সিংহাসন দেওয়া হয়। এই আবেদন রক্ষিত হয়।

১৪১০-১১ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাতের সুলতান মুজফ্‌ফর শাহের মৃত্যু ঘটলে তাঁর পৌত্র আহমদ শাহ সিংহাসনে আসীন হয়ে নিজ পিতৃব্যদের বিদ্রোহের সম্মুখীন হন। হুসঙ্গ এই পিতৃব্যদের পক্ষ অবলম্বন করেন এবং তাঁদের সাহায্যার্থে একটি বাহিনী পাঠিয়ে দেন। কিন্তু তার আগেই আহমদ শাহ পিতৃব্যদের ঠাণ্ডা করে দেন, এবং হুসঙ্গ প্রেরিত বাহিনী তড়িঘড়ি ফিরে আসে।

কিন্তু হুসঙ্গ এতে নিরস্ত হন না। তিনি চাম্পানের, নান্দোদ ও ঈদারের হিন্দু রাজাদের নিয়ে একটি শক্তিজোট গঠন করেন। কিন্তু এই পরিকল্পনাও আহমদের তৎপরতায় ব্যর্থ হয়ে যায়। ১৪১৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁর শ্যালক খান্দেশের নাসির খানের সহযোগিতায় গুজরাতে একটি অভিযান করেন। ১৪২১ খ্রীষ্টাব্দে হুসঙ্গ আকস্মিক ভাবে উড়িষ্যায় হানা দিয়ে চতুর্থ ভানুদেবের কাছ থেকে ৭৫টি হাতি নিয়ে আসেন, কিন্তু প্রত্যাবর্তনের পথে রাজমহেন্দ্রীর রেড্ডি বংশীয় রাজা অল্লাড়ের হাতে সর্বস্বান্ত হন। তাঁর অনুপস্থিতির সময়ে ১৪২২ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাতের আহমদ শাহ মালবে অভিযান করেন এবং মাণ্ডু অবরোধ করেন। কিন্তু বর্ষার জন্য তিনি অবরোধ তুলে সারঙ্গপুরে উপস্থিত হন। হুসঙ্গ সেখানে তাঁকে তাড়া করেন। শেষ পর্যন্ত আহমদ শাহ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ওই বছরেই (১৪২২) হুসঙ্গ গাগরাউন শহর দখল করেন এবং গোয়ালিয়র দুর্গ অবরোধ করেন। এই সংবাদ পেয়ে দিল্লীর সৈয়দ বংশীয় সুলতান মুবারক শাহ গোয়ালিয়রের রাজার স্বপক্ষে সৈন্য পাঠান, এবং হুসঙ্গ অবরোধ তুলে নিয়ে দিল্লী সুলতানকে কর প্রদানে স্বীকৃত হন। ১৪২৮ খ্রীষ্টাব্দে আহমদ শাহ বহমনী খেরল্ আক্রমণ করলে সেখানকার রাজার অনুরোধে হুসঙ্গ তাঁকে সাহায্য করেন। কিন্তু প্রত্যাবর্তনকারী বহমনী সৈন্যদের অনাবশ্যক তাড়া করতে গিয়ে তিনি পরাজিত হন এবং কোনক্রমে পালিয়ে আসেন। ১৪৩১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কাল্পি জয় করেন।

১৪৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জুলাই হুসঙ্গ মারা গেলে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র গজনী খান মুহম্মদ শাহ নাম নিয়ে সিংহাসনে বসেন। তিনি হুসঙ্গের আমলের মন্ত্রী মালিক মুখিস ও তাঁর পুত্র মাহমুদ খানের অতিরিক্ত বশবর্তী ছিলেন। তাঁর নির্বুদ্ধিতা এবং আনুসঙ্গিক নানা অপগুণের সুযোগে শেষ পর্যন্ত মাহমুদ খানই মালবের সুলতানী দখল করেন ১৪৩৬ খ্রীষ্টাব্দে। এই নূতন রাজবংশ খলজী বংশ নামে পরিচিত। পূর্ববর্তী রাজ-বংশের পক্ষপাতী কয়েকজন আমীরের বিদ্রোহ করার প্রচেষ্টাকে তিনি ব্যর্থ করে দেন। পূর্বতন রাজবংশের পলাতক মাসুদের পক্ষ নিয়ে গুজরাতের সুলতান আহমদ মালব আক্রমণ করেছিলেন, কিন্তু সৈন্যবাহিনীর মধ্যে মড়ক লাগায় তিনি ফিরে যান। চান্দেরীতে একজন বিদ্রোহী আমীরকে দমন করার পর তিনি সংবাদ পান যে গোয়ালিয়রের রাজা ডুঙ্গর সেন নারওয়ার শহর অবরোধ করেছেন। মাহমুদ তখন গোয়ালিয়র পাল্টা আক্রমণ চালান। ফলে ডুঙ্গর সেন তাড়াতাড়ি নিজ রাজ-ধানীতে ফিরে আসেন, মাহমুদও লুঠপাট করে সরে পড়েন।

১৪৪০ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির প্ররোচনায় মাহমুদ দিল্লী অভিযান করেন। কিন্তু সম্ভবত গুজরাতের আহমদ শাহের মালব আক্রমণের সংবাদ পেয়ে দিল্লী অভিযানের মতলব পরিত্যাগ করে ফিরে আসেন। ওই বছরেই তিনি চিতোরের মহারাণা কুম্ভের বিরুদ্ধে একটি অসফল যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন। ১৪৪৪ খ্রীষ্টাব্দে জৌনপুরের সুলতান মাহমুদ শার্কি কাল্পি আক্রমণ করেন। ফলে তাঁর সঙ্গে মাহমুদের যুদ্ধ হয় ইরিজ নামক স্থানে। দুই মাহমুদের যুদ্ধে কোন পক্ষেরই জয় পরাজয় হয়নি, তবে জৌনপুরের সঙ্গে মালবের একটা সন্ধি হয়েছিল। ১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দে চাম্পানেরের রাজা গঙ্গাদাস গুজরাতের সুলতান মুহম্মদের আক্রমণের বিরুদ্ধে মাহমুদের সাহায্য চান। মাহমুদ দ্রুত সাহায্য করেন। যদিও তা ফলদায়ক হয়নি। পর বৎসর মাহমুদ গুজরাত অভিযান করেন এবং ব্রোচ পর্যন্ত অগ্রসর হন। তারপরই পরাজিত হয়ে পলায়ন করতে বাধ্য হন।

১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে মাহ্‌মুদ রাজস্থান অভিযানের পরিকল্পনা করেন, এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি গুজরাতের সুলতান কুতবুদ্দীনের সঙ্গে একটি বোঝাপড়ায় আসেন। মাহ্‌মুদ প্রথমে হারাবতী বা বর্তমান বুন্দি দখল করেন। ইত্যবসরে দাক্ষিণাত্যের কিছু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির অনুরোধে তিনি বহমনী রাজ্য আক্রমণ করে বসেন, এবং মাহুর নামক একটি দুর্গ অবরোধ করতে গিয়ে বিপন্ন হয়ে তিনি পালিয়ে আসেন। এদিকে বাগ্‌লানের রাজা, যিনি মাহ্‌মুদের সামন্ত ছিলেন, খান্দেশের মুবারকের আক্রমণের বিরুদ্ধে তাঁর সাহায্য চান। পরাজিত হয়ে মুবারক পালিয়ে যান। মুবারকের দ্বিতীয় চেষ্টাও মাহমুদ ব্যর্থ করে দেন। এর পর মাহমুদ চিতোর আক্রমণ করেন, কিন্তু বিশেষ সুবিধা করতে না পেরে ফিরে আসেন। ১৪৫৬ এবং ১৪৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দুবার চিতোর অভিযান করেছিলেন, কিন্তু সেগুলিও ফলপ্রসূ হয় নি।

১৪৬১ খ্রীষ্টাব্দে মাহ্‌মুদ বহমনী রাজ্য আক্রমণ করেন এবং প্রাথমিক বিজয়-লাভের পর গুজরাতের সুলতান বেগরহের সশস্ত্র হস্তক্ষেপে তিনি সব কিছু ফেলে পলায়ন করতে বাধ্য হন। পর বৎসর তিনি আবার বহমনী রাজ্যে অভিযান করেন কিন্তু যখন জানতে পারেন যে সেই অবকাশে গুজরাতের সুলতান বেগরহ্‌ মালব আক্রমণের মনস্থ করেছেন, তখন তিনি মালবে প্রত্যাবর্তন করেন। চার বছর পরে ১৪৬৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বহমনী রাজ্যের বিরুদ্ধে কতকটা সফল হয়েছিলেন এবং বেরার অঞ্চলটি গ্রাস করতে পেরেছিলেন। ১৪৬৯ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সুলতান বুহ্‌লুল লোদী তাঁর রাজসভায় দূত পাঠিয়েছিলেন।

১৪৬৯ খ্রীষ্টাব্দে মাহ্‌মুদ গত হলে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র গিয়াসুদ্দীন মালবের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তাঁর হারেমে ষোল হাজার রমণী ছিল যাদের দেখাশোনা করতেই তাঁর সময় অতিবাহিত হত। তাঁর আমলে গুজরাতের মাহমুদ বেগরহ চাম্পানের আক্রমণ করলে সেখানকার রাজা গিয়াসুদ্দীনের সাহায্য চান। চিরাচরিত রীতি লঙ্ঘন করে গিয়াসুদ্দীন তাঁকে সাহায্য করতে বিরত হন। ফলে তিনি একটি অনুগত রাজ্য হারান এবং চাম্পানেরের বিখ্যাত দুর্গ গুজরাতের অধিকারে চলে যায়। তিনি দুবার চিতোর আক্রমণ করে পরাস্ত হয়েছিলেন। তাঁর জীবনকালেই তাঁর উত্তরাধিকার নিয়ে তাঁর দুই পুত্র নাসিরুদ্দীনের ও আলাউদ্দীনের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয় এবং নাসিরুদ্দীন ক্ষমতালাভ করেন। গিয়াসুদ্দীন মারা যান ১৫০১ খ্রীষ্টাব্দে।

১৫০৩ খ্রীষ্টাব্দে নাসিরুদ্দীন চিতোরে একটি অভিযান প্রেরণ করেন, কিন্তু তার ফলাফল সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী কথা শোনা যায়। নাসিরুদ্দীনের রাজত্বকালেই তাঁর পুত্র সিহাবুদ্দীন বিদ্রোহী হন এবং এই বিদ্রোহ দমন করা হয়। তিনি তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র আজম হুমায়ুনকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন।

১৫১১ খ্রীষ্টাব্দে নাসিরুদ্দীনের মৃত্যু হলে আজম হুমায়ুন দ্বিতীয় মাহমুদ শাহ উপাধি নিয়ে সুলতান হন। তাঁর আমলে পদাধিকারীদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব বেশি বেড়ে গিয়েছিল। এরই ফলে নাসিরুদ্দীনের আমলের ওয়াজির বসন্ত রায় নিহত হয়েছিলেন। মাহমুদের সময়ে রাজ্যের প্রধান পরিচালক ছিলেন মেদিনী রায়। তাঁর প্রাধান্য অসহ্য হওয়াতে মাহমুদ ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাতে পালিয়ে যান, এবং মেদিনী রায়ই কার্যত মালবের অধীশ্বর হয়ে দাঁড়ান। মেদিনী রায়কে উৎখাত করার জন্য গুজরাতের সুলতান মুজফ্‌ফর একটি বাহিনী পাঠান এবং সেই বাহিনী মাণ্ডু অধিকার করে ও মাহ্‌মুদ পুনরায় মালবের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু মালবের অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ এলাকা মেদিনী রায়ের অনুচরদের অধীনে ছিল। এদিকে মেদিনী রায় মেবারের মহারাণা সাঙ্গার সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁর বাহিনী নিয়ে মালব আক্রমণ করেন। যুদ্ধে মাহ্‌মুদ পরাজিত ও বন্দী হন। কিন্তু সাঙ্গা তাঁকে পুনরায় মালবের সিংহাসন ফিরিয়ে দেন।

এর পর মাহ্‌মুদ কিছুটা শক্তি সঞ্চয় করে সারঙ্গপুর অধিকার করেন এবং চিতোরে একটি অভিযান প্রেরণ করেন। চিতোরের মহারাণা রতন সিংহ পাল্টা মালব আক্রমণ করেন এবং উজ্জয়িনী পর্যন্ত অগ্রসর হন। এদিকে গুজরাতের সুলতান বাহাদুর শাহ মালব সীমান্তে একটি বাহিনী সন্নিবেশ করায় রতন সিংহ

প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু মাহমুদ বাহাদুর শাহের সিংহাসনের প্রতিদ্বন্দ্বী চাঁদ খানকে আশ্রয় দেওয়ায় বাহাদুর শাহের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। ১৫৩১ খ্রীষ্টাব্দে মাহমুদ মাণ্ডু দুর্গে বাহাদুর শাহ কর্তৃক বন্দী হন এবং পলায়নকালে নিহত হন। বাহাদুর শাহের আমলে মালব গুজরাতের অধীন ছিল।

৬॥ মেবার

দিল্লী সুলতানী আমলে রাজস্থানে দুটি স্বাধীন শক্তির বিকাশ দেখা যায়, মেবার ও মারবার।

১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দে আলাউদ্দীন খলজী চিতোর অধিকার করলে তদানীন্তন মেবারের গুহিলবংশীয় রাজা রতন সিংহের পতন হয়, এবং মেবারের আনুষ্ঠানিক অধিকার গুহিলদেরই একটি শাখাবংশ শিশোদিয়াদের হাতে আসে। এই বংশের লক্ষ্মণ সিংহ ও তাঁর সাত পুত্র তুর্কীদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রাণ হারান। তাঁর একমাত্র জীবিত পুত্র অজয় সিংহ আরাবল্লী পর্বতে আত্মগোপন করেন। ১৩১৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মারা গেলে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র হম্মীর আনুষ্ঠানিক রাজকীয় উপাধিসমূহ গ্রহণ করেন।

দিল্লী সুলতানীর প্রতিনিধি হিসাবে আলাউদ্দীনের পুত্র খিজির খান চিতোরের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। তিনি দিল্লী প্রত্যাবর্তন করলে মালদেব চৌহান দিল্লীর তরফ থেকে চিতোরের ভারপ্রাপ্ত হন। ১৩২১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মারা গেলে তাঁর পুত্র চিতোরের শাসকরূপে নিযুক্ত হন! এই সময় দিল্লীতে তুঘলক বংশের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এদিকে হম্মীর নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে ছিলেন না। তাঁর শক্তিকেন্দ্র ছিল আরাবল্লী পাহাড়ের কেলওয়ারা নামক দুর্গম অঞ্চল। জিলওয়ারা দুর্গ দখল করে এবং পরে শিরোহীর ঈদর দুর্গ অধিকার করে তিনি নিজের শক্তির ভিত্তি পাকা করে নেন। অতঃপর সুযোগ বুঝে ১৩৩৮-এর পর কোন সময়ে তিনি চিতোর পুনর্দখল করেন। হম্মীরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ক্ষেত্র সিংহ ১৩৭৮ থেকে ১৪০৫ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এই সময়টা দিল্লী সুলতানীর খুবই টালমাটাল অবস্থা ছিল, ক্ষেত্রসিংহ প্রথমে হাড়া-বংশীয় সর্দারদের অধিকৃত বুন্দি অঞ্চলটির উপর আধিপত্য স্থাপন করেন। এরপর ১৩৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মালবের দিলাবার খানকে পরাজিত করেন। দ্বিতীয় একটি যুদ্ধেও দিলাবার পরাজিত হন।

ক্ষেত্র সিংহের পর তাঁর পুত্র লক্ষসিংহ বা লাখা মেবারে ১৪২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁর আমলে পার্শ্ববর্তী রাজপুত রাজ্য মারবারের সঙ্গে মেবারের বন্ধুত্ব

হয়। এছাড়া মেবারে রৌপ্য ও তাম্রের খনি আবিষ্কার হবার ফলে সেখানকার অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হয়। মেবারের পরবর্তী রাণা মোকল গুজরাতের একটি আক্রমণ প্রতিহত করার সময় চাচা এবং মেরা নামক দুজন আততায়ীর হাতে নিহত হন। এরা দুজন ছিল ক্ষেত্রসিংহের অবৈধ সন্তান। এদের মধ্যে একজন নিজেকে রাণা বলে ঘোষণা করে। মোকলের মৃত্যুর (১৪৩৩ খ্রীঃ) সুযোগে গুজরাত ও মালব মেবারের আভ্যন্তরীন গোলযোগের সুযোগ নেবার চেষ্টা করে। মারবারের রাঠোররা এই দুঃসময়ে মেবারের পরিত্রাতার ভূমিকা নেয়। রাঠোর রাজ রণমল্ল মেবারের বিদ্রোহীদের দমন করেন এবং মোকলের পুত্র কুম্ভকে মেবারের রাণা বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু রণমল্লের সার্বিক প্রভুত্ব মেবারের শিশোদিয়া অভিজাতদের বরদাস্ত না হওয়ায় ১৪৩৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে কয়েকজন চক্রান্তকারী হত্যা করে। এর ফলে মেবার ও মারবারের সম্পর্কের অত্যন্ত অবনতি ঘটে, যা পরবর্তীকালে গোটা রাজস্থানের পক্ষেই চরম ক্ষতিকর হয়েছিল।

কুম্ভের আমলে মেবারকে একদিকে মারবারের সঙ্গে অপরদিকে মালবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়। মারবারের সঙ্গে যুদ্ধে কুম্ভ সাফল্যলাভ করেন। রাজধানী মান্দোর অধিকৃত হয় এবং রণমল্লের পুত্র যোধা পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। ১৪৫৬ খ্রীষ্টাব্দে নাগোর বা নাগৌরের রাজা কুম্ভের অধীনতা অস্বীকার করে গুজরাতের সুলতান কুতবুদ্দীনের আশ্রয় নেন। ফলে কুম্ভ সরাসরি নাগোর দখল করে নেন। কুতবুদ্দীন অতঃপর মেবারের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। এই অভিযান দ্বিমুখী হয়েছিল। একটি বাহিনী সুলতানের অধীনে আরাবল্লী পর্বত অতিক্রম করে কুম্ভলগড়ের দিকে অগ্রসর হয়েছিল। অপর বাহিনী তাঁর পুত্রের অধীনে শিরোহির অভ্যন্তর দিয়ে মেবারে প্রবেশের চেষ্টা করেছিল। সুযোগ বুঝে মালবের সুলতান মাহমুদ খলজীও মেবার আক্রমণ করেন। এ ভিন্ন মারবারের পলাতক রাঠোর রাজা যোধা কুম্ভের বিরোধী পক্ষে যোগদান করেন। কিন্তু এতগুলি অভিযানের ধাক্কা কুম্ভ সামলে ছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত আক্রমণকারীরা প্রত্যাবর্তন করেছিল। এরপর আক্রমণাত্মক যুদ্ধ চালিয়ে তিনি গুজরাতের সুলতানের কাছ থেকে শিরোহি এবং নাগোর জয় করেন। মালবেরও কিছু অঞ্চল কুম্ভ অধিকার করেন। ফলে ১৪৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাত ও মালব পুনরায় মেবার আক্রমণ করে, কিন্তু এবারেও আক্রমণকারীরা সাফল্যলাভ করতে পারে নি।

কুম্ভ তাঁর পুত্র উদয় কর্তৃক নিহত হন. কিন্তু রাজপুত সম্রান্ত ব্যক্তিদের সাহায্যে

উদয়ের ছোট ভাই রায়মল্ল উদয়কে অপসারিত করে ১৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দে মেবারের রাণা হন। এই সময়কার বিশৃংখলার সুযোগে মালবের সুলতান গিয়াসুদ্দীন খলজী (১৪৬৯-১৫০০) মেবার আক্রমণ করেন, কিন্তু তিনি পরাজিত হন। জাফর খানের নেতৃত্বে মালবের দ্বিতীয় আক্রমণও প্রতিহত হয়। রায়মল্লের শেষ জীবন তাঁর পুত্রদের মধ্যে সিংহাসনের জন্য পারস্পরিক দ্বন্দ্বের মধ্যে অতিবাহিত হয় এবং এই দ্বন্দ্বের পরিণামে সাঙ্গা ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে মেবারের সিংহাসনে আরোহন করেন।

সাঙ্গার আমলে মেবার রীতিমত শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। মালবের সুলতান মাহমুদ খলজীর বিরুদ্ধে তাঁর ওয়াজির মেদিনী রায় সাঙ্গার সাহায্য চাইলে সাঙ্গা ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দে মালবে অভিযান করেছিলেন। কিন্তু সুলতান মাহমুদ গুজরাতের সাহায্য পেতে চলেছেন দেখে সাঙ্গা মেবারে ফিরে যান, এবং মেদিনী রায়কে তাঁর অধীনে চাকরী দেন। এদিকে সুলতান মাহমুদ নিজের শক্তিকে সংহত করতে পেরে, এবং গুজরাতী বাহিনীর ভরসায় ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে সাঙ্গার অধিকৃত গাগরাউন আক্রমণ করলে সাঙ্গা দ্রুত তাঁকে পরাজিত ও বন্দী করেন। পরে তাঁকে নিজের সুবিধাজনক শর্তে তিনি মুক্তি দেন এবং মালবের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হতে সাহায্য করেন। জামিন হিসাবে মালবের সুলতানের একজন পুত্রকে তিনি নিজ দরবারে রেখে দেন।

শিরোহী রাজ্যের সিংহাসনের দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে গুজরাতের সঙ্গে সাঙ্গার বিরোধ বাধে। এই বিরোধ চলেছিল মূলত ১৫১৯-২১ খ্রীষ্টাব্দে। উভয় পক্ষই উভয় পক্ষের অভ্যন্তরে বার কতক হানা দিয়েছিল। মালবের সুলতান মাহমুদ গুজরাতের পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন। এই যুদ্ধগুলির ফলাফল মোটামুটিভাবে সাঙ্গারই অনুকূল হয়েছিল। কিন্তু সাঙ্গা ইতিমধ্যে বৃহত্তর ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ছিলেন। ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লী সুলতানীর অধিকারী হন ইব্রাহিম লোদী। তাঁর রাজত্বের গোড়ার দিকের অশান্তির সুযোগে সাঙ্গা নিজের এলাকা, প্রতিপত্তি ও প্রভাব খুবই বাড়িয়ে ফেলেছিলেন। সিংহাসনে নিজেকে দৃঢ় করে নিয়ে ইব্রাহিম লোদী সাঙ্গাকে আক্রমণ করেন কিন্তু ধোলপুরের যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন। ইব্রাহিম লোদীর দ্বিতীয় আক্রমণ চূড়ান্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

দিল্লীর বিরুদ্ধে সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে সাঙ্গা দিল্লী সুলতানীকে উচ্ছেদ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তিনি বাবুরের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁকে দিল্লী অভিযানে উৎসাহিত করেন। এবং স্থির হয় যে বাবুর যখন পশ্চিম দিক থেকে দিল্লী

আক্রমণ করবেন তিনি আক্রমণ করবেন অন্য দিক থেকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাঙ্গা দিল্লী আক্রমণ করেননি। ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে বাবুর একাই পাণিপথের যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করে দিল্লী দখল করেন। সাঙ্গা দিল্লী আক্রমণ করেননি কারণ তিনি ভেবেছিলেন যে বাবুর লুঠপাট করে কাবুলে ফিরে যাবেন, এবং তিনি সেই অবসরে দিল্লী অধিকার করবেন। যখন তিনি বুঝলেন যে বাবুর এখানে পাকা-পাকি থাকার জন্য মনস্থ করেছেন, কালবিলম্ব না করে তিনি গুজরাতের রাজকুমার বাহাদুর শাহকে সিংহাসন লাভ করতে সাহায্য করে বাবুরের সঙ্গে গুজরাতের সমঝোতার পথ রুদ্ধ করে ছিলেন। গুজরাতকে নিজপক্ষে আনয়ন করা তাঁর কুটনীতির একটি বড় সাফল্য।

বাবুরের সঙ্গে সাঙ্গার চূড়ান্ত যুদ্ধ হয়েছিল ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে খানুয়া নামক স্থানে। এই যুদ্ধে সাঙ্গা পরাজিত হলে দিল্লীতে রাজপুত অধিকারের প্রচেষ্টা বিলীন হয়। বাবুরের সাফল্যের কারণ ছিল উন্নত রণকৌশল যা পূর্বে এদেশে অজ্ঞাত ছিল। এছাড়া বাবুরের বাহিনী আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করেছিল, ভারতীয়রা যাতে অভ্যস্ত ছিল না। খানুয়ার যুদ্ধে পরাজয়ের পরেও সাঙ্গা পুনরায় মুঘলদের সঙ্গে লড়বার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু ১৫২৮ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ৪৬ বছর বয়সে তাঁর আকস্মিক মৃত্যু হওয়ায় তা সম্ভব হয়নি।

৭॥ মারবার

মেবারে শিশোদিয়াদের পাশাপাশি মারবারে রাঠোরদের উত্থান হয়। রাঠোর বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম সীহ যিনি ত্রয়োদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বর্তমান ছিলেন। সীহের পুত্র আস্থান এবং তাঁর পুত্র ধুহড় যাঁর মৃত্যুর তারিখ ১৩০৯ খ্রীষ্টাব্দ। রাজপুত বিবরণী সমূহে পরবর্তী রাজাদের নাম আছে।

আসলে চতুর্দশ শতকের প্রথম দশকের কিছু পূর্বে রাঠোররা খের অঞ্চলে একটি ছোট রাজ্য স্থাপন করে এবং ক্রমশ দিল্লী সুলতানীর দুর্বলতার সুযোগে বৃহত্তর মারবার রাজ্যের পত্তন করে। প্রথম শক্তিমান রাঠোর রাজার নাম চুণ্ডা, যিনি মান্দোর জয় করেন এবং দিল্লী সুলতানীর দুর্বলতার সুযোগে আক্রমণাত্মক নীতি অনুসরণ করে নাগোর অধিকার করেন, কিন্তু তিনি রাজপুতদের মধ্যেই এত বেশি নিজের শত্রু সৃষ্টি করেছিলেন যে মোহিল, ভট্টি প্রভৃতি গোষ্ঠী তাঁর শত্রুপক্ষের সঙ্গে যোগ দেয় যার ফলে শেষ পর্যন্ত নাগোর তাঁর হস্তচ্যুত হয় ও ১৪২২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নিহত হন।

চুণ্ডার মৃত্যুর পর ক্ষমতার দ্বন্দ্বে তাঁর এক পুত্র রণমল্ল ১৪২৭ খ্রীষ্টাব্দে মারবারের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি নাগৌরের মুসলিম শাসককে পরাজিত ও নিহত করে ওই স্থানটি দখল করেন। বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের দ্বারা তাঁর পিতা মেবারের সঙ্গে মারবারের সুসম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। মেবারের রাণা মোকল আততায়ীদের দ্বারা নিহত হলে রণমল্ল তাদের বিনাশ করে কুম্ভকে মেবারের সিংহাসনে বসান, কিন্তু তাঁর প্রভুত্ব অসহ্য মনে হওয়াতে মেবারের শিশোদিয়া সর্দাররা ১৪৩৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে হত্যা করে। তাঁর পুত্র যোধা পালিয়ে যান, এবং মালবের সঙ্গে মেবারের যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে নিজ শক্তি সংহত করেন এবং মেবার কর্তৃক মারবারের অধিকৃত অঞ্চলগুলি দখল করে নেন। ১৪৫৮ খ্রীষ্টাব্দে মেবারের রাণা কুম্ভের সঙ্গে মারবারের সন্ধি হয়। যোধা যোধপুর নগরের পত্তন করেন, এবং এইখানেই রাজধানী সরিয়ে আনেন। তাঁর আমলেই রাঠোর রাজকুমাররা নিজেদের মূল এলাকা ত্যাগ করে অন্যত্র ছোট ছোট রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁর একপুত্র সাতল সাতলমেরে একটি রাজ্যের পত্তন করেন। অপর পুত্র বিকা পত্তন করেন বিকানীর রাজ্যের। দুদা মের্তা অঞ্চলের শাসক হন।

১৪৮৮ খ্রীষ্টাব্দে যোধা মারা গেলে সাতল রাজত্ব করেন ১৪৯১ পর্যন্ত, তারপর সুজা ১৫১৫ পর্যন্ত এবং তারপর গাঙ্গা ১৫৩২ পর্যন্ত।

৮॥ কাশ্মীর

১৩৩৯ খ্রীষ্টাব্দে শাহ্ মীর কাশ্মীরে একটি ইসলামধর্মী রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৩৪২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মারা গেলে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র জামসিদ রাজা হন, কিন্তু কিছুদিন পরই তিনি তাঁর ভাই আলি শের কর্তৃক বিতাড়িত হন। আলি শের আলাউদ্দীন নাম নিয়ে বারো বছরের অধিককাল কাশ্মীরে রাজত্ব করেন। পরবর্তী রাজা সিহাবুদ্দীন, সম্ভবত তাঁর ভাই, উনিশ বছর রাজত্ব করেন। তাঁর রাজত্বকাল কাশ্মীরের ইতিহাসে স্মরণীয়। পশ্চিমে আফগানিস্তানের কিছু অংশ ও দক্ষিণে শতদ্রু পর্যন্ত তাঁর রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটেছিল। তিনি উদার ও পরমত সহিষ্ণু ছিলেন।

পরবর্তী সুলতান হিন্দল, যিনি কুতবুদ্দীন নাম গ্রহণ করেছিলেন, ১৩৮৯ খ্রীষ্টাব্দে মারা গেলে নাবালক সুলতান সিকন্দরের হয়ে তাঁর মা সুভটা তাঁর মামাতো ভাই উদ্দকের পরামর্শে রাজকার্য চালাতেন। সিকন্দর সাবালক হলে উদ্দক বিদ্রোহ করেন, কিন্তু সেই বিদ্রোহ দমিত হয়। সিকন্দর ওহিন্দের শাহী রাজাকে যুদ্ধে

পরাজিত করেন এবং তাঁর কন্যা মেরাকে বিবাহ করেন। তাঁর সময়ে তৈমুরের ভারত আক্রমণ ঘটে, কিন্তু তৈমুর তাঁকে ঘাঁটাননি। সিকন্দর তাঁর পূর্ববর্তীদের মত পরমতসহিষ্ণু ছিলেন না। হিন্দুদের, বিশেষ করে ব্রাহ্মণদের উপর তিনি রীতিমত অত্যাচার করেছিলেন, এবং এই কাজে বিশেষ সহায়তা পেয়েছিলেন তাঁর ধর্মান্তরিত মন্ত্রী সুহভট্টের কাছ থেকে। ১৪১৩ খ্রীষ্টাব্দে সিকন্দর মারা গেলে পরবর্তী সুলতান, সিকন্দরের পুত্র মীর খান, যিনি আলি শাহ নাম নিয়েছিলেন, ১৪২০ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। খোক্করদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে তিনি খোক্কর নেতা জসরথের হাতে পরাজিত ও নিহত হন। অতঃপর তাঁর ভাই শাহী খান জৈনুল আবেদিন উপাধি নিয়ে কাশ্মীরের সিংহাসনে আরোহন করেন।

জৈনুল আবেদিনের রাজত্বকাল (১৪২০-৭০) কাশ্মীরের ইতিহাসের স্মরণীয় অধ্যায়। তাঁর আমলে কাশ্মীরের চরম বিস্তৃতি ঘটেছিল। পূর্বদিকে লদাখ ও তিব্বতের কিছু অংশ, দক্ষিণে পাঞ্জাবের উত্তরাংশ, ও পশ্চিমে আফগানিস্তানের কিয়দংশ তাঁর অধিকারে এসেছিল। রাজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রে তিনি খোক্কর নেতা জসরথের সহায়তা পেয়েছিলেন প্রভূত পরিমাণে। তিনি ছিলেন আলোকপ্রাপ্ত নৃপতি। সংস্কৃত, পারসিক ও তিব্বতী ভাষায় তাঁর যথেষ্ট বুৎপত্তি ছিল। স্থানীয় ভাষায় তিনি অনেক গ্রন্থ অনুবাদ করিয়েছিলেন এবং তাঁর বড় কীর্তি মহাভারত ও রাজতরঙ্গিণীর পারসিক অনুবাদ প্রণয়নে সহায়তা। তিনি প্রচলিত আইনকানুনের সংস্কার করেছিলেন এবং জনহিতকর নানা পরিকল্পনা কার্যকর করেছিলেন। তাঁর পূর্ববর্তীরা হিন্দুদের প্রতি যে অন্যায় করেছিলেন তিনি তাঁর প্রতিকার করেছিলেন, ভগ্ন মন্দিরগুলি সংস্কার করিয়েছিলেন, কাশ্মীর থেকে পলাতক ব্রাহ্মণদের ফিরিয়ে এনেছিলেন। মক্কা, মিশর, গিলান ও খুরাশনের শাসকেরা তাঁর সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। দিল্লীর সুলতান বুহ্‌লুল লোদীও তাঁকে পর্যাপ্ত শ্রদ্ধা করতেন।

জৈনুলের পর কাশ্মীরে রাজত্ব করেছিলেন যথাক্রমে হায়দর শাহ (১৪৭০-৭১), হাসান (১৪৭১-৮৪) ও মুহম্মদ (১৪৮৫-১৫৩৭, মধ্যে তিনবার সিংহাসনচ্যুত)। তাঁদের রাজত্বকালের ইতিহাস ক্ষমতার জন্য দ্বন্দ্ব ও চক্রান্তের ইতিহাস। বিভিন্ন গোষ্ঠীর সংঘর্ষ, অন্তঃপুরের চক্রান্ত, সামন্তদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব এবং রাজাদের অযোগ্যতা জৈনুল আবেদিনের পরবর্তী কাশ্মীর ইতিহাসের একটি স্থায়ী বিষয় হয়ে গিয়েছিল।

সপ্তম অধ্যায়

আঞ্চলিক ইতিহাস

দাক্ষিণাত্য ও সুদূর দক্ষিণ

১॥ খান্দেশ

খান্দেশ অঞ্চলটি ছিল মালবের নিম্নে, নর্মদা ও তাপ্তীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে, সাতপুরা পর্বতমালাকে কেন্দ্র করে। বর্তমান গুজরাতের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, মহারাষ্ট্রের উত্তরাঞ্চল ও মধ্যপ্রদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল জুড়ে ছিল মধ্যযুগীয় খান্দেশ। এই অঞ্চলে ফিরুজ তুঘলকের সময় মালিক রাজা নামক এক ব্যক্তি প্রাধান্য অর্জন করেন, এবং তুঘলক-দের অবক্ষয়ের সুযোগে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। মালবের সুলতান দিলাবার খানের সহায়তায় তিনি গুজরাতে একটি ব্যর্থ সামরিক অভিযান করেন এবং শেষ পর্যন্ত গুজরাতের সুলতান মুজফফর শাহের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হন। ১৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর কিছু পূর্বে তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র নাসির খানকে নিজ উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। কনিষ্ঠ পুত্র ইফতিকারকে তিনি দেন থালনের অঞ্চলটি।

নাসির খান ১৪১৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর শ্যালক মালবের হুসঙ্গের সহায়তায় ইফতিকারকে বিতাড়ন করে থালনের দুর্গ অধিকার করেন। এরপর খান্দেশ ও মালবের সম্মিলিত বাহিনী গুজরাত আক্রমণ করে আহমদের নিকট পরাজিত হলে নাসির গুজরাতের অধীনতা মেনে নেন। ১৪২৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বহমনী রাজ্যের আহ্‌মদ শাহ বহমনীর সঙ্গে একযোগে গুজরাত আক্রমণ করে ব্যর্থ হন এবং গুজরাতের সঙ্গে বহমনীর যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়ান। ১৪৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বহমনী রাজ্য আক্রমণ করে শোচনীয় ভাবে পরাজিত হয়ে লালিং-এর দুর্গে অবরুদ্ধ হন এবং গুজরাত ও মালবের নিকট সাহায্য ভিক্ষা করেন। কিন্তু তা আসার পূর্বেই তিনি মারা যান ১৪৩৭ খ্রীষ্টাব্দে।

নাসিরের পুত্র মীরান আদিল খান গুজরাতী বাহিনীর সহায়তায় বিপন্মুক্ত হন। ১৪৪১-এ তিনি মারা গেলে তাঁর পুত্র মীরান মুবারক ১৬ বছর রাজত্ব করেন। ১৪৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর দ্বিতীয় আদিল খান খান্দেশের সিংহাসনে আসীন হন। আদিল গণ্ডোয়ানা এবং গরহ-মন্দলার রাজাদের তাঁর অধীনতা মানতে বাধ্য করেন, এবং আসীরের দুর্গকে শক্তিশালী করে তোলেন। এরপর তিনি গুজরাতের

প্রতি তাঁর আনুগত্য প্রত্যাহার করেন এবং কর প্রদান বন্ধ করেন। ফলে গুজরাতের মাহমুদ বেগরহ ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে খান্দেশ আক্রমণ করে আদিলকে বকেয়া সমুদয় কর প্রদানে বাধ্য করেন। এরপর তাঁর মৃত্যু (৮ই এপ্রিল ১৫০৩) পর্যন্ত আদিল আর গুজরাতকে ঘাটাননি।

আদিল খানের মৃত্যুর পর তাঁর ভাই দাউদ রাজা হয়ে আহমদনগরের আহমদ নিজাম শাহের আক্রমণের সম্মুখীন হন। মালবের সুলতান নাসিরুদ্দীনের সহায়তায় তিনি পরিত্রাণ পেলেও, এই ঘটনার পর তিনি মালবের অধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য হন। ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মারা গেলে তাঁর পুত্র গজনী খান খান্দেশের রাজা হন, কিন্তু মাত্র দুদিন পরেই তিনি তাঁর পিতৃব্য হিসামুদ্দীন কর্তৃক বিষপ্রযুক্ত হয়ে নিহত হন। গজনী খানের কোন উত্তরাধিকারী না থাকায় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ তাঁর এক দূরবর্তী আত্মীয় আলম খানকে খান্দেশের রাজা হিসাবে মনোনীত করেন। আহমদনগরের আহমদ নিজাম শাহ এবং বেরারের ইমাদুদ মুল্ক আলমের পক্ষ সমর্থন করেন। পক্ষান্তরে নাসির খানের এক পৌত্র আদিল তাঁর মাতামহ গুজরাতের মাহমুদ বেগরহের সহায়তায় খান্দেশের সিংহাসন দখল করে নেন, এবং তৃতীয় আদিল খান নামে পরিচিত হন। তাঁর সময়ে আহমদনগরের নিজাম শাহ খান্দেশ সীমান্তে আলম খানের সহযোগিতায় সৈন্য সমাবেশ করলে আদিল খান গুজরাতের দ্বিতীয় মুজফ্‌ফর শাহের সহায়তায় তাঁদের হটিয়ে দেন। ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে আদিল মুজফ্‌ফর শাহের মালব অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দে আদিল মারা গেলে মীরান মুহম্মদ খান্দেশের রাজা হন।

২॥ বহমনী রাজ্য

মুহম্মদ তুঘলকের রাজত্বকালে ১৩৪৭ খ্রীষ্টাব্দে দৌলতাবাদ বা দেবগিরিতে হাসান গঙ্গু নামক এক ব্যক্তি জাফর খান উপাধি গ্রহণ করে একটি স্বাধীন রাজ্যের পত্তন করেন, এবং নিজেকে আবুল মুজফ্‌ফর আলাউদ্দীন বহমন শাহ নামে পরিচিত করেন। তাঁর প্রবর্তিত রাজবংশ বহমনী বংশ নামে পরিচিত। বহমন শাহ সর্বপ্রথম নাসিক অধিকার করে সেখান থেকে তুঘলকী বাহিনীকে হটে যেতে বাধ্য করেন। কাছাকাছি অকলগুলির মধ্যে তিনি অঞ্চলকোট, ভূম ও মুন্দরগী অধিকার করেন। যাঁরা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন তাঁদের তিনি অধীনস্থ সামন্ত হিসাবে নিজ নিজ এলাকাতেই বহাল রেখেছিলেন। তিনি করহাদ ও কোলহাপুর অধিকার করেছিলেন। তাঁর সময়ে বহমনী রাজ্যের সীমা উত্তর পূর্বে মাহুর পর্যন্ত (১৯°৪৯´উ এবং

৭৭° ৫৮´ পূ) এবং দক্ষিণে তেলিঙ্গনার পশ্চিমে ভঙ্গীর দুর্গ পর্যন্ত (১৭°৩১´ উ এবং ৭৮°৫৩´ পূ) বিস্তৃত হয়েছিল।

বহমন শাহ তাঁর রাজধানী দৌলতাবাদ থেকে গুলবর্গায় স্থানান্তরিত করেছিলেন। তাঁর রাজ্যসীমার সংলগ্ন দুটি হিন্দু রাজ্যের সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক বিরোধ অবশ্যম্ভাবী ছিল। একটি ছিল বরঙ্গল এবং অপরটি ছিল বিজয়নগর। দুটি রাজ্যই তুঘলকদের অবক্ষয়ের যুগে গড়ে উঠেছিল। ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দে বহমন শাহ বরঙ্গলের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন এবং সেখানকার শাসক কাপয় নায়ককে কৌলাস দুর্গ ছেড়ে দিতে এবং বার্ষিক করপ্রদানে বাধ্য করেন।

১৩৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বহমন শাহ মারা গেলে তাঁর পুত্র মুহম্মদ শাহ বহমনী রাজ্যের সুলতান হন। তখন থেকেই বিজয়নগরের সঙ্গে বহমনী রাজ্যের চিরন্তন সংঘর্ষের সূচনা হয়। মূলত কৃষ্ণা-তুঙ্গভদ্রা দোয়াব অঞ্চলের অধিকার নিয়ে এই বিরোধের সূত্রপাত। যে রাজনৈতিক কারণে পূর্ববর্তী যুগে চালুক্য ও পল্লবদের মধ্যে, রাষ্ট্রকূট ও চোলদের মধ্যে অথবা চালুক্য ও চোলদের মধ্যে চিরন্তন বিরোধ লেগেছিল, সেই একই কারণে এই নবগঠিত রাজ্যদ্বয়ের বিরোধ অনিবার্য ছিল। মুহম্মদ শাহের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন বিজয়নগরের বুক্ক। এদিকে বরঙ্গলের কাপয় নায়ক কৌলাস দুর্গ পুনরাধিকারের চেষ্টা করছিলেন। ফলে ১৩৬২-৬৫ খ্রীষ্টাব্দে মুহম্মদ শাহকে দুই শক্তির সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল। বরঙ্গলের বিরুদ্ধে তিনি নিশ্চয়ই সাফল্য অর্জন করেছিলেন, কেননা কাপয়কে গোলকোণ্ডা অঞ্চলটি মুহম্মদকে সমর্পণ করতে হয়েছিল, কিন্তু বিজয়নগরের বিরুদ্ধে গোড়ার দিকে সাফল্য অর্জন করলেও, তিনি শেষ পর্যন্ত তা বজায় রাখতে পারেন নি। কেননা বুক্কের সঙ্গে তাঁর যে সন্ধি হয়েছিল তার শর্ত অনুযায়ী কৃষ্ণা-তুঙ্গভদ্রা দোয়াবের উপর বিজয়নগরের প্রভুত্ব মুহম্মদ শাহ মেনে নিয়েছিলেন, এবং কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণ দিকের কয়েকটি মহল উভয় রাজ্যের যৌথ মালিকানাধীনে থাকবে এটা স্বীকৃত হয়েছিল।

১৩৭৫ খ্রীষ্টাব্দে মুহম্মদ শাহ মারা গেলে তাঁর পুত্র আলাউদ্দীন মুজাহিদ তিনবছর বিজয়নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। তিনি অদোনি নামক একটি দুর্গ নয় মাস অবরুদ্ধ করে রাখেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত অবরোধ প্রত্যাহার করে প্রত্যাবর্তনকালে নিজ তাঁবুতে তাঁর সম্পর্কিত ভ্রাতা দাউদের হাতে নিহত হন ১৩৭৮ খ্রীষ্টাব্দে। মুজাহিদের অনুচরেরা পাল্টা দাউদকে নিহত করে, এবং তাঁর পুত্র সঞ্জরকে অন্ধ করে। অতঃপর দাউদের ভাই দ্বিতীয় মুহম্মদ বহমনী রাজ্যের সুলতান হন। এই

থেয়োয়া অশান্তির সুযোগে প্রতিবেশী বিজয়নগর গোয়া সমেত বহমনী রাজ্যের কিয়-দংশ গ্রাস করে। দ্বিতীয় মুহম্মদ রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে ধার্মিক, প্রজাহিতৈষী ও বিদ্বান ছিলেন।

১৩৯৭ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় মুহম্মদের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারী হন গিয়াসুদ্দীন। সেই সময় তুর্কী আমীরদের একটি গোষ্ঠী শক্তিশালী হয় যার নেতা ছিলেন তাঘালচিন। উচ্চাকাঙ্খী এই ব্যক্তিটি ক্ষমতা করায়ত্তের অভিপ্রায়ে গিয়াসুদ্দীনকে অন্তরীণ এবং অন্ধ করেন, এবং তাঁর সৎ-ভ্রাতা সামসুদ্দীনকে সিংহাসনে বসান। সামসুদ্দীনের মা ছিলেন দাসী। সামসুদ্দীনের রাজপদে নিয়োগকে রাজপরিবারের অন্যান্য সদস্যেরা ভাল চোখে দেখেননি। একটি প্রাসাদ বিদ্রোহের দ্বারা অতঃপর ফিরুজ নামক রাজ পরিবারের একজন সদস্য ক্ষমতাসীন হন। তাঘালচিনকে হত্যা করা হয়।

ফিরুজ শাহ পঁচিশ বছর রাজত্ব করেন ১৩৯৭ থেকে ১৪২২ পর্যন্ত। তিনি তিন-বার বিজয়নগরের বিরুদ্ধে অভিযান করেছিলেন যথাক্রমে ১৩৯৮, ১৪০৬ এবং ১৪১৭ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর প্রথম অভিযান খুব একটা ফলপ্রসূ হয়নি। বিজয়নগরের সঙ্গে তিনি একটি সন্ধি করে খেরলার গন্দবংশীয় রাজা নরসিং রায়কে তিনি পরাজিত ও অধীনতা স্বীকারে বাধ্য করেন। বরঙ্গল বা তেলিঙ্গনা সংলগ্ন কোণ্ডবিড়ু ও সন্নিহিত রেড্‌ডি শাসিত অঞ্চলে ক্ষমতালোভী দুটি গোষ্ঠী বেম এবং বেলমদের দ্বন্দ্বের মধ্যে বিজয়নগর এবং বহমনী রাজ্য উভয়েই জড়িয়ে পড়ে, বেমদের পক্ষে বিজয়নগর এবং বেলমদের পক্ষে বহমনী। ফিরুজ প্রথমে বেমদের বিরুদ্ধে সাফল্যলাভ করলেও শেষ পর্যন্ত পশ্চাদাপসরনে বাধ্য হন। বেম প্রধান কাটয়ের সেনাপতি আল্লাড় রেড্‌ডির নিকট বহমনী সেনাপতি আলি খান পরাস্ত হন। বিজয়নগরের বিরুদ্ধে ফিরুজের তৃতীয় অভিযান (১৪১৭-২০ খ্রীঃ) ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ফিরুজ পাঙ্গল দুর্গটি অবরোধ করে তা অধিকার করতে ব্যর্থ হন। যে রায়চুর দোয়াবকে কেন্দ্র করে উভয় রাজ্যের সংঘর্ষ তা বিজয়নগরেরই অধিকারে থাকে। ফিরুজের ব্যর্থতা বহমনী রাজদরবারে অত্যন্ত বিরূপভাবে সমালোচিত হয়, যার পরিণামে শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর ভাই আহমদের অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হন।

১৪২২ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে আহমদ শাহ বহমনী সুলতান হন। ১৪২৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গুলবর্গা থেকে রাজধানী বিদরে স্থানান্তরিত করেন। রাজত্বের শুরুতেই তিনি বিজয়নগরের রাজা দ্বিতীয় দেবরায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন ও তাঁকে পরাজিত করেন। ১৪২৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বরঙ্গল জয় করেন এবং ওই অঞ্চলটি

বহমনী রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়। উত্তরে মালবের সঙ্গে বহমনী রাজ্যের প্রথম সংঘর্ষ হয় আহমদ শাহের আমলে এবং বহমনীরা বিজয়লাভ করে। আহমদ শাহ গুজরাতের বিরুদ্ধেও যুদ্ধে লিপ্ত হন। ১৪২৯ খ্রীষ্টাব্দে ঝালাওয়ারের রাজা কৃষ্ণ গুজরাতের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে আহমদ শাহ বহমনী তাঁর সমর্থনে গুজরাতে অভিযান করেন এবং নন্দুরবার জেলাটি লুণ্ঠন করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত গুজরাতী বাহিনীর তাড়া খেয়ে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৪৩০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সালসেটি দখলের অভিপ্রায়ে খলাফ হাসান বসরীর নেতৃত্বে গুজরাতের বিরুদ্ধে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন, কিন্তু বহমনী বাহিনীর মধ্যে দক্ষিণী বনাম পরদেশীর দ্বন্দ্বের ফলে দক্ষিণীরা দলত্যাগ করলে গুজরাত সহজেই বহমনীদের পরাস্ত করে।

১৪৩৬ খ্রীষ্টাব্দে আহমদ শাহ বহমনীর মৃত্যুর পর আলাউদ্দীন আহমদ রাজ্যলাভ করেই বিজয়নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। বিজয়নগরের সঙ্গে তার মোট দুবার যুদ্ধ হয় যথাক্রমে ১৪৩৬ ও ১৪৪৩ খ্রীষ্টাব্দে। দুটি যুদ্ধই কৃষ্ণা তুঙ্গভদ্রা দোয়াব, এবং মুদ্গল ও রায়চুর দুর্গ এলাকাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁর প্রথম অভিযান বিশেষ সাফল্যলাভ না করলেও দ্বিতীয় অভিযানে তিনি বিজয়নগরের দ্বিতীয় দেবরায়কে পরাস্ত করেছিলেন। ১৪৩১ খ্রীষ্টাব্দে সঙ্গমেশ্বরের রাজা আলাউদ্দীনের বশ্যতা স্বীকার করেন। এরপর খান্দেশের নাসির খান গুজরাত ও মালবের সুলতানদের উৎসাহে বহমনী রাজ্য আক্রমণ করে পরাজিত হন। ১৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দে আলাউদ্দীনের শ্যালক জালাল খান বিদ্রোহ করেন ও নিজেকে তেলিঙ্গনার রাজা বলে ঘোষণা করেন। শুধু তাই নয়, আলাউদ্দীনকে মৃত বলে প্রচার করে তিনি মালবের মাহমুদ খলজীর সহায়তায় বহমনী সিংহাসন দখল করার অভিলাষী হন। এই বিদ্রোহ দমনের জন্য আলাউদ্দীন তাঁর বিশ্বস্ত মাহমুদ গওয়ানকে প্রেরণ করেন। গওয়ান নলগোন্দায় জালালকে পরাজিত করেন। এরপর থেকেই গওয়ানের প্রতিপত্তি বাড়তে শুরু করে।

১৪৫৮ খ্রীষ্টাব্দে আলাউদ্দীন মারা গেলে তাঁর পুত্র হুমায়ুন ১৪৬১ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁর সময়ে দেশের নানা প্রান্তে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল এবং সেই বিদ্রোহ দমনে হুমায়ুন অমানুষিক নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করেছিলেন। পরবর্তী রাজা, হুমায়ুনের পুত্র, নিজাম শাহ মাত্র আট বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর অভিভাবক হিসাবে থাকেন তাঁর মা এবং দুজন বিচক্ষণ মন্ত্রী, মাহমুদ গওয়ান ও খাজা জাহান তুর্ক। নাবালক রাজা থাকার সুযোগে উড়িষ্যার রাজা কপিলেন্দ্র, তেলেঙ্গনার

রাজার সহায়তায় বহমনী রাজ্য আক্রমণ করেন। তাঁরা রাজধানী বিদর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন কিন্তু মাহমুদ গওয়ান এবং খাজা জাহানের নেতৃত্বে সেই আক্রমণ প্রতিহত হয়। ইত্যবসরে মালবের সুলতান মাহমুদ খলজী বহমনী রাজ্য আক্রমণ করেন ও বিদর দখল করেন। গওয়ান তখন গুজরাতের সুলতান মাহমুদ বেগরহের নিকট সাহায্যের জন্য আবেদন করলে বেগরহ তৎক্ষণাৎ এক বিরাট সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে দেন, ফলে মাহমুদ খলজী মালবে পলায়ন করতে বাধ্য হন। পর বৎসর (১৪৬৩) তিনি আবার বহমনী রাজ্য আক্রমণ করেন, কিন্তু যখন তিনি খবর পান যে গুজরাতের মাহমুদ বেগরহ পুনরায় বহমনীদের সাহায্য করতে অগ্রসর হচ্ছেন, তিনি তদ্দণ্ডেই প্রত্যাবর্তন করেন।

বালক রাজা নিজাম শাহ মাত্র দুবছর রাজত্ব করার পর ১৪৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মারা গেলে তাঁর ভাই তৃতীয় মুহম্মদ শাহ সুলতান হন এবং ১৪৮২ খ্রীষ্টাব্দে পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এই সময় মাহমুদ গওয়ান ভকিল-ই-সুলতান বা প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হন ও রাজ্যের সর্বেসর্বা হয়ে ওঠেন। তিনি বিজয়নগর ও উড়িষ্যার বিরুদ্ধে সাফল্যের সঙ্গে যুদ্ধ পরিচালনা করেন এবং বহমনী রাজ্যের সীমানা উড়িষ্যার দক্ষিণ থেকে গোয়া পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। হুবলী, বেলগাঁও ও বাগলকোট তাঁর আমলে বহমনী রাজ্যের অধীনে আসে।

কিন্তু বিস্তৃতি সত্ত্বেও আভ্যন্তরীন গোলযোগে বহমনী রাজ্যের সর্বনাশ হয়েছিল। বহমনী রাজ্যের আমীর ও পদাধিকারীরা দুইটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল, দক্ষিনী বা স্থানীয় এবং পরদেশী। পরদেশী অর্থাৎ ইরান, তুরস্ক, আরব, মধ্য এশিয়া আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশ থেকে আগত ভাগ্যান্বেষীদের প্রাধান্যে দক্ষিণী বা স্থানীয়রা ভীত ও ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েছিল। ১৪৩০-৩১ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাতের নিকট বহমনীদের বারবার পরাজয়ের কারণ হিসাবে দক্ষিণীরা পরদেশীদের দায়ী করে। এরপর থেকে রাজদরবারে দক্ষিণীদের প্রাধান্যের সূত্রপাত ঘটে। ১৪৪৬ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ কোংকনের রাজা শংকররাও শির্কের নিকট বহমনী বাহিনী পরাজিত হয়ে চাকনের দুর্গে আশ্রয় নিয়েছিল। দক্ষিণীরা সুলতান আলাউদ্দীন আহমদ শাহকে ভুল বুঝিয়ে কোংকনে পরাজয়ের দায়িত্ব পরদেশীদের ঘাড়ে চাপিয়ে ওই দুর্গের মধ্যে অনেক পরদেশীকে হত্যা করে। এরপর থেকে দু'তরফের মধ্যে কার্যত অহিনকুল সম্পর্কের সৃষ্টি হয়। প্রধান মন্ত্রী মাহমুদ গওয়ান পরদেশী হলেও অত্যন্ত বিচক্ষণ ছিলেন। দক্ষিণী দলের নেতা এবং তেলিঙ্গনার তরফদার হাসান নিজাম-উল-মুক তাঁর প্রতি অত্যন্ত ঈর্ষা-

পরায়ণ ছিলেন, এবং কৌশলে গওয়ানকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে তিনি বদ্ধ পরিকর হন। গওয়ানের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ ইউসুফ আদিল খানকে একটি সামরিক অভিযানে প্রেরণ করে তিনি গওয়ানকে নিঃসঙ্গ করে দেন। তারপর একটি জাল চিঠি, যেখানে উড়িষ্যার রাজাকে বহমনী রাজ্য আক্রমণ করতে আহ্বান জানানো হচ্ছে, উপস্থাপিত করে মিথ্যা অভিযোগে সুলতান মুহম্মদ শাহকে দিয়ে গওয়ানের প্রাণদণ্ডের আদেশ মঞ্জুর করিয়ে নেওয়া হয়, এবং ৫ই এপ্রিল ১৪৮১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে হত্যা করা হয়।

গওয়ানের হত্যাকাণ্ডে ভীত হয়ে পরদেশী আমীররা রাজধানী থেকে নিজ নিজ এলাকায় আত্মরক্ষার্থে ফিরে যান। এমন কি দক্ষিণীদের মধ্যেও অনেকে এই হত্যাকাণ্ডকে অনুমোদন করেননি। সুলতান মুহম্মদ শাহ অবশ্য পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। ভগ্নহৃদয়ে তিনিও মারা যান ১৪৮২ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু তার পূর্বেই হাসান ক্ষমতার চাবিকাঠিটি নিজের পকেটে পুরে ফেলেছিলেন। মালিক নায়েব হিসাবে তিনি পরবর্তী রাজা মাহমুদের আমলে সর্বেসর্বা হয়ে ওঠেন, কিন্তু দক্ষিণীদেরই একাংশ তাঁর প্রতি বিরূপ হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত বিদরের হাবসী শাসকের হাতে হাসানের মৃত্যু ঘটে। এর পরই আবার পরদেশীদের প্রাধান্য ঘটে। দক্ষিণীরা মুহম্মদ শাহকে অপসারণ করে তাদের মনোমত সুলতানকে গদিতে বসাবার অভিপ্রায়ে ১৪৮৭র অক্টোবর মাসে অকস্মাৎ রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করে। পরদেশীরা তা প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়, এবং দক্ষিণীদের উপর নির্মম প্রতিশোধ নেওয়া হয়।

এই সকল ঘটনার পর কাশিম বারিদ নামক একজন তুর্কী শাসনকার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেন যদিও মাহমুদ শাহ ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত সুলতান ছিলেন। কোন প্রাদেশিক শাসনকর্তাই কাশিম বারিদকে মানতে রাজি হননি। ১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে আহমদ নিজাম-উল-মুল্ক আহমদনগরে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁকে অনুসরণ করেন বিজাপুরের ইউসুফ আদিল খান এবং বেরারের ইমাদ-উল-মুল্ক। ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান মাহমুদ শাহের মৃত্যুর পরও বহমনী রাজ্যে চারজন নামেমাত্র সুলতান রাজত্ব করেছিলেন। ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দে শেষ সুলতান কলিমুল্লাহ্‌র মৃত্যুর পর বহমনী রাজ্য পাঁচটি স্বাধীন সুলতানীতে বিভক্ত হয়ে যায়—বিজাপুর (আদিল শাহী রাজবংশ), গোলকোণ্ডা (কুতবশাহী রাজবংশ), আহমদনগর (নিজামশাহী রাজবংশ), বিদর (বারিদশাহী রাজবংশ) এবং বেরার (ইমাদশাহী রাজবংশ)।

৩॥ পাণ্ড্যরাজ্য ও মা'বার

ত্রয়োদশ শতকের শেষের দিকে সুদূর দক্ষিণের পাণ্ড্যরাজ্য, রাজধানী মাদুরা সহ, কুলশেখর পাণ্ড্যের অধীন ছিল। কুলশেখরের দুই পুত্র বীর পাণ্ড্য ও সুন্দর পাণ্ড্যের মধ্যে দ্বন্দ্বের উদ্ভব হলে সুন্দর পাণ্ড্য আলাউদ্দীন খলজীর সেনাপতি মালিক কাফুরের সহায়তা প্রার্থনা করেন। কাফুর সত্যই কোন সাহায্য করেছিলেন কিনা বলা শক্ত। তবে কাফুর দিল্লী ফিরে গেলে এই দুই ভ্রাতার বিরোধের সুযোগ নিয়ে কেরলের রাজা রবিবর্মন-কুলশেখর পাণ্ড্য রাজ্যের অনেকখানি দখল করে নেন ১৩১২-১৩ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ। কিন্তু বীর পাণ্ড্য হোয়সল তৃতীয় বীরবল্লালের সহায়তায় রবিবর্মন-কে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য করেন। অনতিকাল পরেই বরঙ্গলের কাকতীয় প্রতাপ-রুদ্র পাণ্ড্যদেশ আক্রমণ করেন। তখন বীর ও সুন্দর এবং তাঁদের জ্ঞাতি বিক্রম, কুলশেখর ও পরাক্রম, এই পাঁচ পাণ্ড্য এক হয়ে প্রতিরোধ করেন। কিন্তু প্রতাপরুদ্র জয়লাভ করেন। অন্তর্দ্বন্দ্বে দীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও ১৩১৯ পর্যন্ত সুন্দর পাণ্ড্য রাজত্ব করে-ছিলেন। রামনাদ থেকে ১৩৪১ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ বীর পাণ্ড্যের লেখমালা পাওয়া গেছে।

১৩২৩ খ্রীষ্টাব্দে জৌনা খান, যিনি পরে মুহম্মদ বিন তুঘলক নামে পরিচিত হয়ে-ছিলেন, মাদুরা দখল করেন, এবং তারপর থেকেই পাণ্ড্যদেশের অনেকটা অঞ্চল মা'বার নামে পরিচিত হয়। মা'বার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবার পরই পাণ্ড্য শাসনের অবসান হয়নি, মাদুরা রামনাদ, তাঞ্জোর ও তিনেভেল্লী জেলার বহুস্থলেই তাদের কর্তৃত্ব ছিল এই। সময়কার পাণ্ড্যবংশীয় কয়েকজন রাজার নাম বিভিন্ন লেখমালায় পাওয়া গেছে, যাঁরা পূর্বোক্ত জেলাগুলির নানাস্থানে ছোটখাট রাজ্য স্থাপন করে-ছিলেন। এঁদের নাম মারবর্মন কুলশেখর (১৩৪৬খ্রী), জটাবর্মন পরাক্রম পাণ্ড্য (১৩১৫-৪৭খ্রী), মারবর্মন বীর পাণ্ড্য (১৩৬৪খ্রী), মারবর্মন পরাক্রম পাণ্ড্য (১৩৩৫-৫২, রামনাদ, তাঞ্জোর, দক্ষিণ আর্কট ও চিঙ্গলেপুত), জটাবর্মন পরাক্রম পাণ্ড্য (১৩৫৭-৮০) জটাবর্মন কুলশেখর পাণ্ড্য (১৩৬৭-১৪১১), প্রভৃতি। বন্ধনীর মধ্যে তারিখগুলি প্রাপ্ত লেখমালা থেকে জানা গেছে। পরবর্তীকালে অঞ্চলগুলি বিজয়নগর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত হয়ে যায়।

পাণ্ড্যরাজ্যের যে অংশটিতে মা'বার রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়ে সেখানে মুহম্মদ তুঘলকের আমলে ১৩৩৪ খ্রীষ্টাব্দে জালালুদ্দীন আহসন শাহ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এরপর

থেকে রাজ্যটিকে পার্শ্ববর্তীদের আক্রমণের ধাক্কা সামলাতে হয়। দ্বিতীয় সুলতান উদাইজি পার্শ্ববর্তীদের বিরুদ্ধে মারা যান। হোয়সল রাজ বীর বল্লাল মা'বার দখলের একটি ব্যর্থ চেষ্টা করেন। শেষ পর্যন্ত বিজয়নগরের কুমার কম্পন ১৩৭০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ মা'বারে বিজনগরের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।

৪॥ বিজয়নগর

মুহম্মদ তুঘলকের রাজ্যকালের বিশৃংখলার সুযোগে তুঙ্গভদ্রার তীরে কর্ণাটক এবং অন্ধ্রের মধ্যবর্তী এলাকায় হরিহর ও বুক্ক নামক দুই ভাই ১৩৩৬ খ্রীষ্টাব্দে বিজয়-নগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁরা উভয়েই ছিলেন সঙ্গম নামক এক ব্যক্তির পুত্র, এবং সেই হিসাবে তাঁদের রাজবংশ সঙ্গমবংশ নামে পরিচিত। তাঁরা আদিতে ছিলেন বরঙ্গলের বাসিন্দা, পরে কাম্পিলিতে এসে সেখানকার মন্ত্রীপদে নিযুক্ত হয়ে-ছিলেন। মুহম্মদ তুঘলক কাম্পিলি জয় করে তাঁদের বন্দী করে নিয়ে যান, এবং তাঁদের ইসলাম ধর্মগ্রহণ করিয়ে তাঁদের দিয়ে দক্ষিণে একটি মুসলিম শক্তিকেন্দ্র গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। গোড়ার দিকে এই চেষ্টা ফলবতী হয়েছিল। এই দুই ভাই অন্ধ্রের কাপয় নায়ক এবং হোয়সল বল্লালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু পরে বিদ্যারণ্য নামক একজন সাধকের প্রভাবে তাঁরা হিন্দুধর্মে পুনর্দীক্ষিত হন, কিন্তু তাঁরা যে হিন্দু রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন তা তাঁর পুরাতন শত্রুদের খুশি করতে পারেনি, যাঁরা ছিলেন হোয়সলরাজ তৃতীয় বল্লাল, অন্ধ্রের কাপয় নায়ক, নিম্ন পেন্নার উপত্যকার রেড্ডি বংশীয় প্রোলয় বেম প্রভৃতি। হোয়সলরাজ তৃতীয় বল্লাল এই রাজ্যটিকে অঙ্কুরেই গ্রাস করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তিনি মাদুরা (মা'বার) পুনরুদ্ধারে বেশি ব্যস্ত থাকায়, এবং শেষ পর্যন্ত সেখানকার যুদ্ধে নিহত হওয়ায় হরিহর ও বুক্কের সামনে গোটা হোয়সল রাজ্য দখলের সুযোগ উন্মুক্ত হয়ে যায় এবং ১৩৪৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই তা বিজয়নগরের অধিকারে আসে।

হরিহর তাঁর ভাই বুক্ককে যুবরাজ পদে নিয়োগ করে নিজ রাজধানী সুরক্ষিত করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। হেমকূট, মতঙ্গ ও মাল্যবন্ত এই তিনটি পাহাড় দিয়ে ঘেরা অঞ্চলে বিজয়নগর শহরটি স্থাপিত হয়েছিল। দেবগিরি থেকে দিল্লী সুলতানের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য তিনি প্রাক্তন চালুক্য রাজধানী বাদামিকে সুরক্ষিত করেন। নেলোরে তিনি বিখ্যাত উদয়গিরি দুর্গ নির্মাণ করেন এবং নিজ ভ্রাতা কম্পনের উপর তাঁর দায়িত্ব দেন। অনন্তপুর যেলার গুত্তি দুর্গের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন

তাঁর ভাই বুক্ক। ১৩৪৭ খ্রীষ্টাব্দে হরিহরের ছোট ভাই মারপ কদম্ব বংশীয় রাজাকে পরাজিত করে কোঙ্কনের উপকূলবর্তী বনবাসী নামক রাজ্যটি জয় করেন। ১৩৫২-৫৩ খ্রীষ্টাব্দে মাদুরা বা মা'বারের বিরুদ্ধে দু'দিক থেকে বিজয়নগরের অভিযান পরিচালিত হয়, একটি পূর্ব উপকূলের উদয়গিরি থেকে রাজকুমার সাবন্নের নেতৃত্বে, অপরটি কোলার জেলা থেকে বুক্কের পুত্র কুমার কম্পনের নেতৃত্বে। মাদুরার সুলতান পরাজিত হন, এবং ওই অঞ্চলের প্রাক্তন শাসক সম্বুবরায়কে মাদুরার সিংহাসনে বসিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু মাদুরার সুলতানী শক্তি পুরোপুরি ধ্বংস হয়নি।

১৩৫৬ খ্রীষ্টাব্দে হরিহর মারা গেলে বুক্ক রাজা হন, এবং গোটা বিজয়নগরকে একটি কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের মধ্যে আনয়ন করেন। মাদুরার রাজা সম্বুবরায়, যিনি হরিহর কর্তৃক সিংহাসনে পুনর্বাসিত হয়েছিলেন, সম্ভবত নিজের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। ফলে বুক্ক মাদুরা অভিযান করেন এবং ১৩৬০ খ্রীষ্টাব্দে মাদুরা বিজয়নগরের পুরো অধিকারে চলে আসে। ১৩৬৫-র কিছু আগে বহমনী রাজ্যের মুহম্মদ শাহের সঙ্গে বুক্কের সংঘর্ষ হয়। এই যুদ্ধের সঠিক ফলাফল কি হয়েছিল তা বলা যায় না, তবে উভয় পক্ষের সন্ধির শর্তানুযায়ী কৃষ্ণা নদীকে দুই রাজ্যের সীমানা হিসাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল, এবং কৃষ্ণার দক্ষিণের কয়েকটি মহলকে উভয় রাজ্যের যৌথ কর্তৃত্বাধীনে রাখা হয়েছিল। এর কিছুকাল পরে পেন্নার উপত্যকার কোণ্ডবিড়ুর রেডডি শাসকদের কাছ থেকে বুক্ক অহোবলম ও বিনুকোণ্ড অধিকার করেন। হরিহরের আমলে মাদুরার সুলতানী শক্তি পরিপূর্ণ ধ্বংস হয় নি। ১৩৭০ খ্রীষ্টাব্দে বুক্কের নির্দেশে কুমার কম্পন মাদুরার অবশিষ্টাংশ দখল করেন, এবং তার ফলে সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্যন্ত এলাকা বিজয়নগরের অঙ্গীভূত হয়।

১৩৭৭ খ্রীষ্টাব্দে বুক্ক মারা গেলে তাঁর পুত্র দ্বিতীয় হরিহর বিজয়নগরের রাজা হন। বুক্কের যোগ্য পুত্র কুমার কম্পন আগেই ১৩৭৪ খ্রীষ্টাব্দে মারা গিয়েছিলেন। দ্বিতীয় হরিহর শাসনভার গ্রহণের অব্যবহিত পরেই তামিল অঞ্চলগুলিতে ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দেয়, কিন্তু হরিহরের পুত্র বিরূপাক্ষ বা বিরূপন্ন উড়ইয়র কঠোর হস্তে এই বিদ্রোহগুলি দমন করেন। এই সময় বিরূপাক্ষ সিংহলে হাজির হয়ে সেখানকার রাজার কাছ থেকে কর আদায় করেন। ১৩৭৭ খ্রীষ্টাব্দে বহমনীরাজ মুজাহিদ বিজয়নগরে একটি অভিযান করেন এবং অদোনি নামক একটি দুর্গ অবরোধ করেন, কিন্তু তা দখল করতে ব্যর্থ হয়ে প্রত্যাবর্তনকালে ১৩৭৮ খ্রীষ্টাব্দে নিজের তাঁবুতে নিহত

হন। এই সুযোগে দ্বিতীয় হরিহর কোঙ্কন ও উত্তর কর্ণাটকে অভিযান করেন। এই অভিযানের ফলে গোয়া, চাউল এবং দভোল বন্দর বিজয়নগরের অধীনে আসে। অতঃপর দ্বিতীয় হরিহর পূর্ব উপকূলের দিকে নজর দেন। ১৩৮২-৮৩ খ্রীষ্টাব্দে কোণ্ড বিড়ুর রাজা অন-বেমের মৃত্যুর পর আভ্যন্তরীন গোলযোগের সুযোগে উদয়গিরির বিজয়নগর নিযুক্ত শাসক দেবরায় শ্রীশৈল জেলাটি জয় করে নেন। এই অঞ্চলটি পূর্বে ছিল রাচকোণ্ডের বেলম নামক একটি গোষ্ঠীর অধিকারে। অন-বেমের মৃত্যুর পর বেলমরা অঞ্চলটি পুনর্দখল করতে চেয়েছিল, কিন্তু দেবরায়ের আকস্মিক অভিযানে তাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়। তখন বেলমদের প্রধান অনপোতা প্রথম নয়ড়ু বহমনী সুলতান দ্বিতীয় মুহম্মদ শাহের সাহায্যে শ্রীশৈল অধিকারের চেষ্টা করে দুবার ব্যর্থ হন। দ্বিতীয় যুদ্ধটি হয়েছিল ১৩৯০-৯১ খ্রীষ্টাব্দে। ১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় হরিহর বহমনীদের বিরুদ্ধে একটি অভিযান প্রেরণ করেন। ঐতিহাসিক ফিরিশতার মতে এই যুদ্ধে বহমনী সুলতান ফিরুজ শাহ জয়লাভ করেন। পক্ষান্তরে নালগোন্দা জেলায় প্রাপ্ত পনগল লেখে দ্বিতীয় হরিহরকে বিজয়ী বলা হয়েছে।

১৪০৪ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় হরিহরের মৃত্যুর পর বিজয়নগরের সিংহাসনের জন্য দু'বছর গৃহযুদ্ধ চলে এবং শেষ পর্যন্ত প্রথম দেবরায় ১৪০৬ খ্রীষ্টাব্দে ক্ষমতা দখল করেন। তাঁর ষোল বছরের রাজ্যকাল বহমনীদের বিরুদ্ধে, রাচকোণ্ডের বেলমদের বিরুদ্ধে এবং কোণ্ডবিড়ুর রেড্‌ডিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধবিগ্রহে কেটেছিল। এই তিন শক্তি একত্র হয়ে দেবরায়ের সিংহাসনলাভের বছরেই বিজয়নগর আক্রমণ করে। বহমনী সুলতান ফিরুজশাহ রায়চুর জেলার দেওদুর্গ তালুকে বিজয়নগরের একটি বাহিনীকে পরাজিত করেন। বহমনী, রেড্‌ডি ও বেলমদের আর একটি বাহিনী উদয়গিরি অঞ্চলে সাফল্য লাভ করে। ১৪১০ খ্রীষ্টাব্দে রাজমহেন্দ্রী অঞ্চলের শাসক কাটয় বেম তাঁর জ্ঞাতি পেদ-কোমটি বেম এবং বেলমদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে দেবরায়ের সাহায্য চান। তাঁর বিপক্ষীয়রা স্বাভাবিকভাবেই বহমনী সুলতান ফিরুজের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। কয়েকটি ছোটখাট যুদ্ধের পর নেপথ্যের দুই প্রধান শক্তির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ফিরুজ প্রথমে সাফল্য লাভ করলেও, শেষ পর্যন্ত দেবরায় বিজয়লাভ করে সমগ্র কৃষ্ণা-তুঙ্গভদ্রা দোয়াবে নিজের কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। রাজমহেন্দ্রীতে দেবরায়ের হস্তক্ষেপ উড়িষ্যার রাজা গজপতি চতুর্থ ভানুদেব ভাল চোখে দেখেন নি, এবং সেখানে একটি বাহিনী প্রেরণ করে-ছিলেন। দেবরায়ও পাল্টা একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। অবশ্য উভয়পক্ষের মধ্যে

কোন যুদ্ধ হয়নি। রাজমহেন্দ্রীর আল্লাড়ের চেষ্টায় দুই শক্তির মধ্যে একটা বোঝা-পড়া হয়।

দেবরায়ের পর বিজয়নগর রাজ্যের উত্তরাধিকার নিয়ে সংশয় আছে। ১৪২২ খ্রীষ্টাব্দে দেবরায়ের মৃত্যুর বছরে রাজত্ব করেছিলেন রামচন্দ্র এবং তারপর সম্ভবত ১৪৩০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিজয়। প্রথম বিজয়ের পুত্র দ্বিতীয় দেবরায় তাঁর পিতার আমল থেকেই শাসন কার্য পরিচালনায় অভ্যস্ত ছিলেন। ১৪২৫ খ্রীষ্টাব্দে বহমনী সুলতান আহমদ শাহ বিজয়নগর আক্রমণ করেছিলেন। এই যুদ্ধে সম্ভবত বিজয়-নগর পরাজিত হয়, কিন্তু এই যুদ্ধ যে পুরোপুরি বহমনীদের স্বপক্ষে গিয়েছিল তা মনে হয় না, কেননা ১৪২৯ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ দ্বিতীয় দেবরায়ের একটি লেখে বহমনীদের উপর তাঁর বিজয়ের কথা উল্লিখিত হয়েছে। উড়িষ্যার ভানুদেব সেই সময় বিজয়নগর আক্রমণ করে অন্ধ্রের উপকূলভাগ দখল করেন এবং বেলমরা সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৪২৮ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ দ্বিতীয় দেবরায় বেলমদের ওই অঞ্চল থেকে বিতাড়িত করেন। ১৪৩৫-৩৬ এবং ১৪৪৩-৪৪ নাগাদ বহমনীদের সঙ্গে দ্বিতীয় দেবরায়ের পুনরায় যুদ্ধ হয়। এই দুটি যুদ্ধই কৃষ্ণা-তুঙ্গভদ্রা দোয়াবে মুদ্‌গল ও রায়চুর দুর্গদ্বয়কে কেন্দ্র করে সংঘটিত হয়েছিল। দ্বিতীয় যুদ্ধটি সম্ভবত বহমনীদের অনুকূলে গিয়েছিল। ১৪৩৮-এ বিজয়নগরের একটি বাহিনী সিংহল অভিযান করে এবং সেখান থেকে কর আদায় করে। ১৪৪৩ খ্রীষ্টাব্দে যখন দেবরায় বহমনীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন সেই সময় উড়িষ্যার কপিলেন্দ্র বিজয়নগরের অনুগত রাজমহেন্দ্রীর রেড ডিদের ধ্বংস করার প্রয়াস করেছিলেন বেলমদের সহযোগিতায়। মল্লপ্প উড়ইয়রের নেতৃত্বে বিজয়নগরের একটি বাহিনী কপিলেন্দ্রকে হটিয়ে দেয় এবং রেড ডিদের রাজমহেন্দ্রীতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে।

১৪৪৬ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় দেবরায়ের মৃত্যুর পর তাঁর ভাই দ্বিতীয় বিজয় কিছুকালের জন্য সিংহাসনে বসেন, এবং তাঁর উত্তরাধিকারী হন দ্বিতীয় দেবরায়ের পুত্র মল্লিকার্জুন, যিনি তৃতীয় দেবরায় নামেও পরিচিত। রাজা হিসাবে তিনি দুর্বল ছিলেন এবং তাঁর আমলেই সঙ্গম বংশের অবক্ষয়ের সূত্রপাত হয়। ১৪৫০ থেকে ১৪৫৪-র মধ্যে উড়িষ্যার কপিলেন্দ্র দক্ষিণে অভিযান চালিয়ে কোণ্ডবিড়ু থেকে বিজয়-নগর বাহিনীকে উৎখাত করেন, এবং বিনুকোণ্ড ও অদ্দঙ্কি দুর্গদ্বয় অধিকার করেন। তাঁর পুত্র কুমার হম্বীর ১৪৬৩ খ্রীষ্টাব্দে বিজয়নগরের কাছ থেকে উদয়গিরি, চন্দ্রগিরি, পড়ুইবিড়ু, কাঞ্চী, বড়ডুলম্পাট্টি, তিরাবরুর এবং তিরুচিরাপল্লীর দুর্গগুলি অধিকার

করেন। পরে অবশ্য দুর্গগুলি পুনরায় বিজয়নগরের অধিকারে আসে, কিন্তু নেলোর জেলার বিখ্যাত উদয়গিরি দুর্গ এবং কোণ্ডবিড়ু হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় বিজয়-নগরের রীতিমত শক্তিহানি হয়।

১৪৬৫ খ্রীষ্টাব্দে সম্ভবত মল্লিকার্জুনকে নিহত করে তাঁর পিতৃব্য পুত্র দ্বিতীয় বিরূপাক্ষ ১৪৮৫ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর সময়ে সামন্ত রাজারাই সর্বেসর্বা হয়ে উঠেছিলেন। পূর্ব উপকূলে গুণ্ডলকম্ম থেকে কাবেরী পর্যন্ত, দক্ষিণ কর্ণাটক, ও পশ্চিমী অন্ধ্র জেলা সমূহ শালুব বংশের সামন্ত রাজাদের অধীনে ছিল। মল্লিকার্জুনের বংশধরেরা কাবেরী নদীর দক্ষিণাঞ্চলে, তাঞ্জোর, দক্ষিণ আর্কট, ত্রিচিনোপোলি, কোয়েম্বাটোর ও সালেম জেলার নানা স্থানে প্রায় স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করতেন। পশ্চিম উপকূল তুলুব ও কোঙ্কনী সামন্তদের অধীন ছিল। বিরূপাক্ষের খাস এলাকা ছিল কার্যত কর্ণাটক ও পশ্চিম অন্ধ্রের কিছু অংশ। বিরূপাক্ষের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বহমনী রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী মাহমুদ গওয়ান গোয়া বন্দরটি বিজয়নগরের অধিকার থেকে কেড়ে নেন। বিরূপাক্ষ দুবার গোয়া অধিকারের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন।

বিরূপাক্ষের দুর্বলতার ফলে অধঃপতিত বিজয়নগরের পরিত্রাতার ভূমিকা নেন শালুববংশীয় সামন্তরাজা নরসিংহ। ১৪৭০ খ্রীষ্টাব্দে কপিলেন্দ্রের মৃত্যুর সুযোগে তিনি উড়িষ্যা অধিকৃত পূর্বউপকূলীয় অঞ্চলগুলি পুনরুদ্ধার করেন, এবং দক্ষিণের বিদ্রোহী পাণ্ড্য ও লম্বকর্ণদের দমন করেন। ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই তিনি কৃষ্ণার দক্ষিণ পর্যন্ত উপকূলীয় অন্ধ্রদেশ, মসুলিপত্তম বন্দর ও কোণ্ডবিড়ুর দুর্গ অধিকার করেন। এগুলি করতে গিয়ে তাঁকে বহমনীদের সঙ্গেও অনেকগুলি ছোটখাট যুদ্ধ করতে হয়েছিল। ১৪৮৪ খ্রীষ্টাব্দে বহমনী প্রধানমন্ত্রী মাহমুদ গওয়ান নিহত হবার পর যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় তার পুরো সুযোগ নরসিংহ নিয়েছিলেন। নরসিংহের সাফল্য দেখে বহমনী সুলতান মুহম্মদ শাহ ইউসুফ আদিল খান ও ফখরুল মুল্ককে নরসিংহের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। তিনি নিজেও একটি পৃথক অভিযান করে মসুলিপত্তম দখল করতে সমর্থ হয়েছিলেন, কিন্তু আদিল ও ফখরুলের অভিযানদ্বয় সাংঘাতিকভাবে ব্যর্থ হয়।

১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রৌঢ়-দেবরায় বিরূপাক্ষের উত্তরাধিকারী হলে তাঁর দ্বারা রাজ্য রক্ষা সম্ভব নয় মনে করে শালুব নরসিংহ বিনা বাধাতেই বিজয়নগরের সিংহাসন দখল করে নেন। সঙ্গম বংশের পর অতঃপর বিজয়নগরে শালুব বংশের শাসন শুরু হয়। ক্ষমতালাভ করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি উম্মত্তুর ও সঙ্গীতপুরের পালিগারদের সঙ্গে

যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। এইযুদ্ধ তাঁর জীবনকাল ধরেই চলেছিল। ১৪৮৪-৮৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন তিনি ক্ষমতা দখলের ব্যাপারে ব্যস্ত ছিলেন সেই সময় উড়িষ্যার রাজা পুরুষোত্তম গজপতি গুণ্টুর জেলা পর্যন্ত এলাকা পুনরধিকার করেন এবং উদয়গিরি দুর্গ দখল করেন।

১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দে শালুব নরসিংহ মারা গেলে তাঁর নাবালক জ্যেষ্ঠপুত্র তিম্মকে সিংহাসনে বসিয়ে মন্ত্রী নরস নায়ক অভিভাবক হিসাবে শাসন কার্য চালিয়ে যান। উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি বহমনী রাজ্য ও উড়িষ্যার সঙ্গে শত্রুতা অর্জন করেছিলেন। এ ছাড়া আভ্যন্তরীন সঙ্কটও খড় কম ছিল না। দক্ষিণের সামন্তরাজ্যগুলির ক্রমাগত বিদ্রোহ তাঁকে প্রচুর বেকায়দায় ফেলেছিল। তাঁর একজন প্রতিদ্বন্দ্বী রাজকুমার তিম্মকে হত্যা করে তার দায় নরসের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন। বিচক্ষণ নরস তৎক্ষণাৎ অপর রাজপুত্র ইম্মাদি নরসিংহকে সিংহাসনে বসিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেলেন যে রাজত্বের লোভে তিনি তিম্মকে হত্যা করেননি। কিন্তু তৎসত্বেও তিনি নূতন রাজকুমারকে কার্যত নজরবন্দী করে রেখেছিলেন। আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহসমূহ তিনি দমন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর সময়ে বহমনী রাজ্য ভেঙে যাবার মুখে পড়েছিল। বিজাপুরের শক্তিমান সামন্তরাজা আদিল খানের বিরুদ্ধে বহমনী রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী কাশিম বারিদ তাঁর সাহায্য চেয়েছিলেন। নরস বিজাপুর আক্রমণ করে আদিলকে পরাস্ত করেছিলেন এবং রায়চুর ও মুদগল দুর্গদ্বয় দখল করেছিলেন। যদিও সেই অধিকার শেষ পর্যন্ত বজায় রাখতে পারেননি। নরস উড়িষ্যার গজপতি বংশীয় রাজা প্রতাপরুদ্রকে পরাজিত করেছিলেন। মোটের উপর বিজয়নগর রাজ্যকে তার পূর্বসীমানায় ফিরিয়ে আনতে নরস সমর্থ হয়েছিলেন।

১৫০৩ খ্রীষ্টাব্দে নরস নায়ক মারা গেলে তাঁর পুত্র বীর নরসিংহ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন, এবং রাজ্যের প্রকৃত অধিকারী ইম্মাদি নরসিংহকে হত্যা করে নিজেই রাজা হন। তাঁর প্রবর্তিত রাজবংশ তুলুববংশ নামে পরিচিত। এই ঘটনা দেশব্যাপী বিক্ষোভের কারণ হয়েছিল এবং সামন্তরাজাদের মধ্যে অনেকেই বিদ্রোহী হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন আদবনী বা আদোনির সামন্তরাজা কাচ (কাশ্যপ উড়ইয়) যাঁর সঙ্গে বিজাপুরের আদিল শাহের বন্ধুত্ব ছিল। বিজয়নগরের আভ্যন্তরীণ অসন্তোষের সুযোগ নিয়ে আদিল খান কাচের সহযোগিতায় বিজয়নগর আক্রমণ করেন, কিন্তু বীর নর সিংহের অনুগত আরেবিড়ুর সামন্তরাজা প্রথম রামরাজ ও তাঁর পুত্র তিম্ম আদিল খানকে ও কাচকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। তিনি অবশ্য

কর্ণাটকের বিদ্রোহীদের দমন করতে ব্যর্থ হন। যদিও পশ্চিম উপকূলের তুলু-নাড়ের বিদ্রোহীদের সম্পূর্ণভাবে দমন করেছিলেন।

১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে বীর নরসিংহ মারা গেলে তাঁর ভাই কৃষ্ণদেব রায় সিংহাসনে আরোহণ করে বহমনী রাজ্যের আক্রমণের সম্মুখীন হন। যদিও সেই সময় বহমনী রাজ্যের সামন্তরাজ্যগুলি প্রায় স্বাধীন হয়ে গিয়েছিল, সুলতান মাহমুদ শাহ বিজা-পুরের আদিল খান ও অন্যান্য সামন্তরাজাদের সহায়তায় বিজয়নগরের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন। এই সম্মিলিত বাহিনী ডোনি নামক স্থানে কৃষ্ণদেব রায়ের নিকট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়, এবং সুলতান মাহমুদ শাহ নিজেও আহত হন। পলায়-মান বহমনীদের অনুসরণ করে কৃষ্ণদেব কোবেলকোণ্ডা নামক স্থানে তাদের পুনরায় পরাজিত করেন। বিজাপুরের আদিল খান যুদ্ধে নিহত হন। অতঃপর কৃষ্ণদেব কৃষ্ণা-তুঙ্গভদ্রা দোয়াবে আক্রমণ চালিয়ে ১৫১২ খ্রীষ্টাব্দে রায়চুর অধিকার করেন। তারপর তিনি বারিদ-ই মমালিক ও তাঁর মিত্রগণকে পরাজিত করে, গুলবর্গা দুর্গ অধিকার করেন। এরপর তিনি বারিদকে অনুসরণ করে বিদরে উপস্থিত হন এবং সেখানকার দুর্গ জয় করেন। তিনি মাহমুদ শাহকে পুনরায় বহমনী রাজ্যের সিংহাসনে বসিয়ে দেন, কারণ তিনি জানতেন যে যতদিন বহমনী রাজ্যের ছায়া থাকবে ততদিন তার অন্তর্গত প্রায় স্বাধীন শক্তিমান সামন্ত রাজ্যগুলির মধ্যে কলহ ও অন্তর্দ্বন্দ্ব বজায় থাকবে।

উম্মুত্তরে পালিগারদের বিরুদ্ধে দু বছরব্যাপী যুদ্ধ চালিয়ে তিনি বিজয়ী হন। পালিগারদের শক্তির উৎস সেরিঙ্গাপতম এবং শিবনসমুদ্রম দুর্গদ্বয় তিনি ধ্বংস করেন। ১৫১৩ থেকে কৃষ্ণদেব উড়িষ্যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন। বিজয়নগরের প্রভাবাধীন অনেক এলাকা উড়িষ্যার প্রতাপরুদ্রদেবের অধীনস্থ হয়েছিল। কৃষ্ণদেব প্রথমে উড়িষ্যা অধিকৃত উদয়গিরি দুর্গটি পুনরুদ্ধার করেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি কোণ্ড-বিড়ুতে অভিযান করেন। এই অভিযানকালে কন্দুকুর, অদ্দঙ্কি, বিনুকোণ্ড, বেল্লম-কোণ্ড, নাগার্জুনিকোণ্ড, তনগেদ ও কেতবরম দুর্গগুলি থেকে উৎকল বাহিনী হটে যায়। পরবর্তী পর্যায়ে বেজওয়াদা, বেঙ্গি এবং তেলিঙ্গনার কিয়দংশ তাঁর হাতে আসে। শেষ পর্যায়ে তিনি কটক আক্রমণ করেন। পরাজিত প্রতাপরুদ্র ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দে নিজ কন্যার সঙ্গে কৃষ্ণদেবের বিবাহ দিয়ে সন্ধি করেন। এই সন্ধির ফলে কৃষ্ণা নদীর উত্তরের উপকূলভাগ কৃষ্ণদেব প্রতাপরুদ্রকে ছেড়ে দেন।

যখন কৃষ্ণদেব উড়িষ্যার সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন গোলকোণ্ডার কুলি কুতব শাহ

বিজয়নগরের সীমান্তে পঙ্গল এবং গুণ্টুরে অবস্থিত কয়েকটি দুর্গ অধিকার করেছিলেন। প্রতাপরুদ্রের মিত্র সিতাবখানকে পরাজিত করে তিনি বরঙ্গল, কম্বম্মেত ও আরও কয়েকটি দুর্গ, এবং প্রতাপরুদ্রের এলাকা থেকে কৃষ্ণা-গোদাবরীর মধ্যবর্তী কিছু অঞ্চল জয় করেছিলেন। কৃষ্ণদেবের অনুপস্থিতির সুযোগে তিনি কোণ্ডবিড়ুতে একটি অভিযান করেছিলেন। কৃষ্ণদেবের নির্দেশে শালুব তিম্ম কুতবশাহী সৈন্যদের নির্মূল করেছিলেন। এদিকে বিজাপুরের প্রাক্তন সুলতান ইউসুফ আদিলের পুত্র ইসমাইল আদিল রায়চুর অঞ্চলটি পুনরধিকার মানসে গোব্বুর নামক স্থানে বিরাট এক সৈন্যবাহিনীর সমাবেশ করেছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণদেব তাঁকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেছিলেন পরপর কয়েকটি যুদ্ধে এবং গুলবর্গা শহরটিকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছিলেন। বিজাপুরের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি একটি পোর্তুগীজ বাহিনীকেও কাজে লাগিয়েছিলেন।

কৃষ্ণদেব রায় ১৫২৯ খ্রীষ্টাব্দে মারা যান। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর ভাই অচ্যুতকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন।

৫॥ মালাবার অঞ্চল

গোয়া থেকে কুইলন পর্যন্ত ভারতের পশ্চিম উপকূল তুঘলকদের রাজ্যসীমার বাইরে ছিল। চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি এই এলাকায় অনেকগুলি ছোট ছোট রাজ্য ছিল। এই রাজ্যগুলি বন্দর সমৃদ্ধ হবার দরুন বহির্বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল ছিল। অনেক রাজ্যের নিজস্ব বাণিজ্যপোতও ছিল। বেশির ভাগ রাজ্যই ছিল হিন্দুশাসিত, যদিও অধিবাসীদের মধ্যে মুসলমান, খ্রীষ্টান ও ইহুদিদের অভাব ছিল না। বহির্জগতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের দরুন, এবং বাণিজ্যভিত্তিক অর্থনীতির কল্যাণে এই সকল অঞ্চলে সাম্প্রদায়িকতা বোধ খুবই কম ছিল। রাজ্যের প্রধান যে ধর্মাবলম্বীই হোন না কেন, রাষ্ট্রের প্রকৃতি ছিল ধর্মনিরপেক্ষ।

মালাবার অঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে কালিকট বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করেছিল। এখানকার রাজার উপাধি ছিল জামোরিন। চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকের জামোরিনরা নায়ার গোষ্ঠীর লোক ছিলেন। তাঁদের মধ্যে মাতৃতান্ত্রিক উত্তরাধিকার প্রথা বর্তমান থাকায় ছেলের বদলে ভাগনে রাজত্বের উত্তরাধিকারী হত। কালিকটের জামোরিনরা অষ্টম-নবম শতকের রাজা চেরামান পেরুমালের বংশধর বলে নিজেদের পরিচয় দিতেন। কোচিনসহ আরও চারটি রাজ্যের রাজারা ওই একই পরিচয় দিতেন। এই রাজ্য

গুলি একটা যুক্তরাষ্ট্রীয় আকারের মধ্যে বর্তমান ছিল, তবে কালিকটের জামোরিনের শ্রেষ্ঠত্ব অন্য রাজ্যগুলি মেনে চলত। কান্নানোর থেকে কোচিন পর্যন্ত এলাকায় কালিকটের জামোরিনের বিশেষ প্রভাব ছিল।

৬॥ ভারতে পোর্তুগীজ

১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই মে তারিখে কালিকটের উত্তরে কাপুকদ নামক স্থানে তিনটি জাহাজ নিয়ে পোর্তুগীজ ভাস্কো-ডা-গামা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে অবতরণ করেন। মুসলমান বণিকেরা, যারা আরব সাগর দিয়ে নানা স্থানে বাণিজ্য করত, পোর্তুগীজদের হাড়ে হাড়ে চিনত। তারা জামোরিনকে সঙ্গত ভাবেই বুঝিয়েছিল যে নিছক বাণিজ্যের জন্যই পোর্তুগীজরা এতটা পথ ঠেলে আসেনি। ফলে জামোরিনের আদেশে ভাস্কো ও তাঁর সঙ্গীদের বন্দী করা হয়েছিল এবং তাঁদের প্রাণদণ্ডেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কয়েকজন মন্ত্রী ও কর্মচারীদের কথায় জামোরিন তাদের ছেড়ে দেন। ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ শে আগস্ট ভাস্কো দলবল নিয়ে ফিরে যান, এখানকার পরিবেশ সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল হয়েই।

ভাস্কোর কাছ থেকে মালাবার অঞ্চল সম্পর্কে খোঁজ খবর নিয়ে পেড্রো অলভারেজ কাব্রাল ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই সেপ্টেম্বর কয়েকটি জাহাজ দিয়ে কালিকটে আসেন, এবং জামোরিনের কছে থেকে সাদর অভ্যর্থনা লাভ করেন। উভয় তরফের একটি বাণিজ্য চুক্তি হয় এবং পোর্তুগীজরা কালিকটে একটি দপ্তর স্থাপন করে। কিন্তু মুসলমান বণিকেরা তাদের কাজকর্মে বিঘ্ন সৃষ্টি করলে তারা জামোরিনকে এই বণিকদের বিরুদ্ধে নালিশ জানায়। জামোরিন কোন সিদ্ধান্ত নেবার পূর্বেই তারা একটি মুসলিম জাহাজ দখল করে। মুসলিম বণিকেরা তখন পোর্তুগীজদের দপ্তর আক্রমণ ও ধ্বংস করে এবং ৫৩ জন লোক সহ দপ্তরের অধ্যক্ষ আয়রেস কোরেয়াকে হত্যা করে। প্রতিশোধ স্বরূপ কাব্রাল দশটি মুসলমান বাণিজ্যতরী ধ্বংস করে এবং দুদিন ধরে কালিকট শহরের উপর গোলা বর্ষণ করে। এরপর তারা কালিকট ছেড়ে কোচিনে চলে যায়।

কোচিনের রাজার সঙ্গে পোর্তুগীজদের একটি চুক্তি হয় এবং স্থির হয় যে পোর্তুগীজরা কালিকটের জামোরিনের অধীনতা থেকে মুক্ত হতে তাঁকে সাহায্য করবে। কান্নানোর ও কুইলনের রাজারাও ওই শর্তে পোর্তুগীজদের সাহায্য করতে রাজি হন। এই সংবাদ কাব্রাল পোর্তুগালের সম্রাটকে পৌছে দিলে তিনি ১৫০২

খ্রীষ্টাব্দে কুড়িটি জাহাজসহ ভাস্কো-ডা-গামাকে পুনরায় প্রেরণ করেন। গোয়ার নিকট আঞ্জিদিভ নামক স্থানে তিনি একটি মুসলিম তীর্থযাত্রী জাহাজ ডুবিয়ে দেন। কয়েক দিন কান্নানোরে অবস্থানের পর ভাস্কো কালিকট অভিমুখে অগ্রসর হন। পোর্তুগীজদের শৌর্য এবং নৃশংসতার খ্যাতি ও অখ্যাতি ইতিমধ্যে এত ছড়িয়েছিল যে কালিকটের জামোরিন ভাস্কোর সঙ্গে শান্তিস্থাপনে আগ্রহী হলেন। ভাস্কো দাবি করলেন যে সমস্ত মুসলমানদের কালিকট থেকে তাড়িয়ে দিতে হবে। এই দাবি অস্বীকৃত হওয়ায় ভাস্কো পুরো একদিন গোলাবর্ষণ করে কালিকটের যথেষ্ট ক্ষতি করলেন। তারপর তিনি কোচিনে ফিরে গিয়ে একটি দপ্তর স্থাপন করলেন এবং কান্নানোরে একটি দুর্গ। অতঃপর সহকারী ভিনসেন্ত সোদ্রেকে ভারতীয় বিষয় সমূহের দায়িত্ব দিয়ে তিনি পোর্তুগালে ফিরে গেলেন।

কিন্তু কালিকটের জামোরিন নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে ছিলেন না। পোর্তুগীজদের আশ্রয় দেবার অপরাধে তিনি কোচিন আক্রমণ করলেন, ফলে কোচিনের রাজা তাঁর পোর্তুগীজ বান্ধবগণ সহ একটি দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। কিন্তু ১৫০৩ খ্রীষ্টাব্দে পোর্তুগাল থেকে আফোনসো দে' আলবুকার্কের নেতৃত্বে একটি বাহিনী জামোরিনকে কোচিন থেকে বিতাড়িত করে। অতঃপর কোচিনের সঙ্গে কালিকটের একটি সন্ধি হয়। পোর্তুগীজরা কোচিনে একটি দুর্গ নির্মাণ করে। ১৫০৫ খ্রীষ্টাব্দে পোর্তুগালের রাজা ভারতে পোর্তুগীজদের স্বার্থ রক্ষার জন্য ফ্রান্সিস্কো দে'আলেমিদাকে রাজপ্রতিনিধি হিসাবে প্রেরণ করেন। তিনি কোচিনে পোর্তুগীজদের নিজস্ব ঘাটি ছাড়াও গোয়ার দক্ষিণে আঞ্জিদিভে এবং কান্নানোরে কয়েকটি দুর্গ নির্মাণ করেন। পোর্তুগীজদের বর্ধিত প্রতিপত্তি দেখে জামোরিন তাদের বিতাড়নের চেষ্টা করেন। ১৫০৬ খ্রীষ্টাব্দে জামোরিন ও মুসলিম বণিকদের সম্মিলিত বাহিনী পোর্তুগীজদের নিকট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়।

এই ঘটনার পর গুজরাত, বিজাপুর ও অপরাপর উপকূলবর্তী রাজ্যগুলির টনক নড়ে। তাঁরা মিশরের সুলতানের কাছে পোর্তুগীজদের বিরুদ্ধে সাহায্যের জন্য আবেদন করেন। মিশরের সুলতান ১৫০৮ খ্রীষ্টাব্দে আমীর হুসেনের নেতৃত্বে একটি বিরাট নৌবাহিনী পাঠান, এবং এই বাহিনী বোম্বাই-এর দক্ষিণে চাউল নামক স্থানে পোর্তুগীজদের পরাজিত করে। আলেমিদার পুত্র এই যুদ্ধে নিহত হন। পরবৎসর ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে পোর্তুগীজরা এই পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয় মিশরীয় ও পশ্চিম-ভারতীয় যুগ্ম নৌবাহিনীকে গুজরাত উপকূলে দিউ নামক স্থানে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে।

১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে আলেমিদার স্থানে আলবুকার্ক রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত হন এবং ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কালিকটে অভিযান করেন। জামোরিন অনুপস্থিত থাকা সত্ত্বেও কালিকটবাসীরা দৃঢ় প্রতিরোধের দ্বারা পোর্তুগীজদের হারিয়ে দেয়। তাদের কয়েকজন সেনাপতি মারা যায়। আলবুকার্ক নিজেও জখম হন।

১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে আলবুকার্ক বিজাপুরের ইউসুফ আদিল খানকে পরাস্ত করে গোয়া দখল করেন। এখানে স্থায়ী পোর্তুগীজ বসতি গঠিত হয়। আলবুকার্ক পোর্তুগীজদের ভারতীয় মেয়েদের বিবাহ করতে উৎসাহ দেন। হিন্দুদের তিনি নানাবিধ পদ দিয়ে স্বপক্ষে এনেছিলেন, এবং বিজয়নগরের মত হিন্দুরাষ্ট্রের সঙ্গে পোর্তুগীজদের রাজনৈতিক সম্পর্কও গড়ে উঠেছিল। গোয়া পোর্তুগীজগণ কর্তৃক অধিকৃত হলে গুজরাতের সুলতান তাদের সঙ্গে শান্তি চুক্তি করেন। কালিকটের জামোরিনও এক পথের পথিক হন।

১৫১১ খ্রীষ্টাব্দে আলবুকার্ক মলাক্কা জয় করেন যে অঞ্চলটি ছিল মশলার কারবারের মূল উৎস। তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগে বিজাপুরের সুলতান গোয়া পুনরুদ্ধারের জন্য পুলাদ খান ও পরে রাসেল খানকে প্রেরণ করেন। কিন্তু আলবুকার্ক দ্রুত ফিরে এসে এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেন। ১৫২৯ খ্রীষ্টাব্দে তৎকালীন পোর্তুগীজ রাজপ্রতিনিধি নিনো দে'কুনহা কোচিন থেকে গোয়াতে পোর্তুগীজদের সদর দপ্তর তুলে নিয়ে আসেন। অতঃপর গোয়াই ভারতে প্রথম পোর্তুগীজ অধিকৃত ভূখণ্ডে পরিণত হয়।

অষ্টম অধ্যায়

আঞ্চলিক ইতিহাস

(উড়িষ্যা ও পূর্ব-ভারত)

১ ॥ উড়িষ্যা

১২৬৪ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যার পূর্বী গঙ্গ বংশীয় রাজার মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র প্রথম ভানুদেব ১২৭৯ পর্যন্ত, এবং তারপর ভানুদেবের পুত্র দ্বিতীয় নরসিংহ ১৩০৬ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁর পুত্র দ্বিতীয় ভানুদেব, যিনি ১৩২৮ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন, গিয়াসুদ্দীন তুঘলকের একটি আক্রমণ সাফল্যের সঙ্গে প্রতিহত করেন।

দ্বিতীয় ভানুদেবের উত্তরাধিকারী, তাঁর পুত্র তৃতীয় নরসিংহ ১৩৫২ খ্রীষ্টাব্দে রাজত্ব করেন। তাঁর পুত্র তৃতীয় ভানুদেবের রাজত্বকালে বঙ্গদেশের সামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ এবং দিল্লীর ফিরুজ তুঘলক উড়িষ্যায় অভিযান করে ব্যাপক লুণ্ঠন ও ধ্বংসকার্য চালান। এছাড়া উড়িষ্যা দক্ষিণের কোণ্ডবিড়ুর রেড্‌ডিদের ব্যাপক আক্রমণের সম্মুখীন হয়। ভানুদেবের সমকালীন রেড্‌ডি রাজা ছিলেন অনপোতা (১৩৫৫-৬৪)। ১৩৭৮ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় ভানুদেব মারা গেলে তাঁর পুত্র চতুর্থ নরসিংহের নামলে দক্ষিণের রেড্‌ডিদের বিজয়নগরের আক্রমণে বিপর্যস্ত হবার সুযোগে উড়িষ্যা তার কিছু হৃত অঞ্চল পুনরুদ্ধার করতে সমর্থ হয়। কিন্তু কুমারগিরির নেতৃত্বে শক্তিমান হয়ে রেড্‌ডিরা ১৩৯০ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যা আক্রমণ করে এবং চিল্কা পর্যন্ত অগ্রসর হয়।

১৪১৪ নাগাদ চতুর্থ নরসিংহ মারা গেলে তাঁর পুত্র চতুর্থ ভানুদেব রেড্‌ডিদের আভ্যন্তরীন গোলযোগের সুযোগে রাজমহেন্দ্রী অঞ্চলে একটি অভিযান প্রেরণ করেন। ওদিকে উড়িষ্যার অগ্রগতি দেখে বিজয়নগর রাজনৈতিক প্রয়োজনেই রেড্‌ডিদের সাহায্যে এগিয়ে আসে। রাজমহেন্দ্রীর শাসক অল্লাড় বিচক্ষণতার সঙ্গে যুদ্ধ এড়িয়ে যান, কিন্তু এরপর থেকে উড়িষ্যার সঙ্গে বিজয়নগরের সংঘর্ষের ক্ষেত্র প্রস্তুত হতে থাকে। কিন্তু রেড ডিরে সঙ্গে উড়িষ্যার একটা বোঝাপড়া হয়ে যায়। ১৪২২ খ্রীষ্টাব্দে মালবের হুসঙ্গ একটি আকস্মিক আক্রমণ করে চতুর্থ ভানুদেবকে বন্দী করেন এবং কিছু মুল্যবান অশ্বের বিনিময়ে তাঁকে ছেড়ে দেন। হুসঙ্গের প্রত্যাবর্তন-

কালে অল্লাড় রেড্ডি তাঁকে যুদ্ধে পরাস্ত করে তাঁর সর্বস্ব কেড়ে নেন। ১৪২৩ খ্রীষ্টাব্দে অল্লাড়ের মৃত্যুর পর কিছু পরে ভানুদেব রেড্ডিরাজ্য আক্রমণ করেন, সম্ভবত তেলিঙ্গনার বেলমদের সহায়তায়। গোড়ার দিকের সাফল্যের পর বিজয়নগরের দেবরায় রেড্ডিদের পক্ষ অবলম্বন করলে ভানুদেবের অভিযান প্রতিহত হয়, এবং ১৪৩৪ খ্রীষ্টাব্দে নাগাদ রেড্ডি অঞ্চল থেকে উৎকল বাহিনী সম্পূর্ণ সরে আসে। এদিকে ভানুদেবের দীর্ঘ অনুপস্থিতির সুযোগে কপিলেন্দ্র উড়িষ্যার সিংহাসন দখল করে সেখানে গজপতি রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন ১৪৩৪-৩৫ খ্রীষ্টাব্দে।

১৪৪৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কপিলেন্দ্র ভিজাগাপতম জেলাটি অধিকার করেন। বিজয়-নগরের দ্বিতীয় দেবরায়ের তৎপরতায় তাঁর রাজমহেন্দ্রী অভিযান ব্যর্থ হলেও ১৪৫০-৫০-র মধ্যে তিনি ওই অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হন, এবং কৃষ্ণা অতিক্রম করে কোণ্ডবিড়ু অধিকার করেন। উত্তরে বঙ্গদেশে অভিযান করে কপিলেন্দ্র হুগলী জেলার মান্দারণ দুর্গ অধিকার করেছিলেন। ১৪৪৪-৪৫ খ্রীষ্টাব্দে মাহমুদ শাহ উড়িষ্যা আক্রমণ করেন। ১৪৫৮ খ্রীষ্টাব্দে দুজন বহমনী আমীর সুলতান দ্বিতীয় হুমায়ুনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তেলিঙ্গনার বেলমদের সহায়তা পান, ফলে হুমায়ুন শাহ বেলমদের প্রচণ্ড-ভাবে আক্রমণ করলে তারা কপিলেন্দ্রের সাহায্য চায়। কপিলেন্দ্র তাঁর পুত্র হম্বীরকে বহমনীদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন, এবং যুদ্ধে বহমনী বাহিনী নির্মূল হয়। এর কিছু-কাল পর হম্বীর বরঙ্গল জয় করেন। ১৪৬১ খ্রীষ্টাব্দে বহমনী সুলতান হুমায়ুন মারা গেলে তাঁর পুত্রের নাবালকত্বের সুযোগে কপিলেন্দ্র বহমনী রাজ্য আক্রমণ করেন। কিন্তু এবার তিনি পরাজিত হন। এরপর কপিলেন্দ্র তাঁর পুত্র হম্বীরকে তামিল উপকূলীয় অঞ্চলগুলি জয় করতে পাঠান। ১৪৬৩র কিছু পরে উদয়গিরি ও চন্দ্রগিরি তাঁর অধীনে আসে, এবং ১৪৬৪তে কাঞ্চী। কিন্তু পরে এই অঞ্চলগুলি তাঁর হাতছাড়া হয়ে যায়। তামিল এলাকাগুলির পুনরুদ্ধার মানসে কপিলেন্দ্র স্বয়ং একটি অভিযান করেন এবং ১৪৬৭ নাগাদ তিনি কৃষ্ণা নদীর তীরে পৌছান। এই সময়ই তাঁর মৃত্যু ঘটে।

কপিলেন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর মনোনীত কনিষ্ঠ পুত্র পুরুষোত্তম উড়িষ্যার সিংহাসনে আরোহণ করলে তাঁর যোগ্য জ্যেষ্ঠ পুত্র হম্বীর বহমনী সুলতানের আশ্রয় নেন ১৪৭১ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁকে সিংহাসনে বসতে বহমনী সুলতান সাহায্য করবেন এই প্রতি-শ্রুতিতে তিনি সুলতানকে রাজমহেন্দ্রী এবং কোণ্ডবিড়ু জয় করে দেন। কিন্তু সুলতান তাঁর কথা না রাখলে হম্বীর কোণ্ডবিড়ুর দুর্গ নিজেই জয় করে নেন, এবং

সেখান থেকে তাঁর ভাই পুরুষোত্তমকে জানান যে যদি তাঁকে তেলিঙ্গনা অঞ্চলটি দেওয়া হয় তাহলে তিনি কোণ্ডবিড়ুর দুর্গ ও অধীনস্থ এলাকাগুলি তাঁকে সমর্পণ করবেন। পুরুষোত্তম রাজি হয়ে রাজমহেন্দ্রী অবরোধ করেন। কিন্তু বহমনীরা তাঁকে পরাস্ত করলে তিনি সন্ধি করে ফিরে যেতে বাধ্য হন। এরপর হম্বীরের ভাগ্যে কি ঘটেছিল তা জানা যায় না। তবে ১৪৮১ খ্রীষ্টাব্দে মাহমুদ গওয়ানের মৃত্যুর পর বহমনীদের বিশৃঙ্খলার সুযোগে তিনি দক্ষিণের কিছু এলাকা দখল করেন। বিজয়নগরের অধিকার থেকে উদয়গিরি দুর্গটিও তিনি কেড়ে নেন।

১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে পুরুষোত্তম মারা গেলে তাঁর পুত্র প্রতাপরুদ্র সিংহাসনে বসেন। ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণদেব রায় বিজয়নগরের অধিপতি হলে তিনি দক্ষিণের অধিকৃত এলাকাগুলিকে সুরক্ষিত করার জন্য সেখানে চলে যান এবং ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন। এই অবসরে বঙ্গদেশের হুসেন শাহ উড়িষ্যা আক্রমণ করেন। সংবাদ পেয়ে প্রতাপরুদ্র তাড়াতাড়ি প্রত্যাবর্তন করে হুসেন শাহকে তাড়া করলে তিনি হুগলীর মান্দারণ দুর্গে আশ্রয় নেন। প্রতাপরুদ্র মান্দারণ জয় করতে ব্যর্থ হয়ে হুসেন শাহের সঙ্গে সন্ধি করেন। ১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দে বিজয়নগরের কৃষ্ণদেব রায় প্রতাপরুদ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং পাঁচ বছরের একটানা যুদ্ধের পর প্রতাপরুদ্র দক্ষিণ থেকে একেবারে উৎখাত হয়ে যান। অবশেষে ১৫২৯ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণদেবের সঙ্গে তিনি সন্ধি করেন যাতে কৃষ্ণার দক্ষিণের সমস্ত অঞ্চল তিনি কৃষ্ণদেবকে সমর্পণ করতে বাধ্য হন, তবে কৃষ্ণার উত্তরাঞ্চলে তাঁর অধিকার কৃষ্ণদেব স্বীকার করে নিয়েছিলেন। কৃষ্ণদেবের মৃত্যুর পর গোলকোণ্ডার সুলতান কুতব-উল-মালিক উড়িষ্যা অধিকৃত তেলিঙ্গনা অঞ্চলের কিছুটা অধিকার করেন। প্রতাপরুদ্র মারা যান ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ। তিনিই ছিলেন উড়িষ্যার শেষ শক্তিমান সম্রাট, যদিও যুদ্ধক্ষেত্রে ভাগ্যদেবী তাঁর প্রতি বিশেষ প্রসন্ন হননি।

২॥ জৌনপুর

জৌনপুর শহরটি তৈরী করেছিলেন ফিরুজ শাহ তুঘলক, তাঁর পিতৃব্য জৌনা খানের (মুহম্মদ বিন তুঘলক) নামানুসারে, বারাণসীর ৩৪ মাইল উত্তর পশ্চিমে গোমতী নদীর তীরে। এই শহরটিকেই কেন্দ্র করে পরে জৌনপুর রাজ্যের পত্তন হয়। সুলতান মুহম্মদের (ফিরুজ তুঘলকের পুত্র) একজন দাস মালিক সর্বর ১৩৮৯ খ্রীষ্টাব্দে খাজা জাহান উপাধি সহ ওয়াজির পদে উন্নীত হন। ১৩৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে

জৌনপুরের শাসক নিযুক্ত করা হয় এবং তিনি বিদ্রোহীদের হাত থেকে অবধ, কনৌজ, সাণ্ডিল, দলমৌ, বহরইচ এবং বিহারের বেশ কিছু দুর্গ অধিকার করেন। গাঙ্গেয় উপত্যকায় কোইল বিহার পর্যন্ত এলাকা নিয়ে জৌনপুর প্রদেশ গঠিত হয়।

পরবর্তী শাসকেরা ছিলেন মুবারক শাহ (১৩৯০-১৪০২) ও ইব্রাহিম শাহ (১৪০২-১৪৪০)। তাঁদের উপাধি ছিল শার্কি। মালিক সর্বর স্বাধীনভাবে চললেও দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করেননি, কিন্তু মুবারক শাহ নিজেকে সুলতান বলে বলে ঘোষণা করেছিলেন। ফলে ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সুলতান মাহমুদ তুঘলক ,তাঁর মন্ত্রী মল্লুর প্ররোচনায় জৌনপুরে অভিযান প্রেরণ করলেও শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ হয় নি। ইব্রাহিম শাহের আমলে মল্লুর দাপটে অস্থির হয়ে স্বয়ং সুলতান মাহমুদ তুঘলক জৌনপুরে আশ্রয় নেন। ১৪০৭ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পরে ইব্রাহিম দিল্লী অভিযান করেন, কিন্তু গুজরাতের মুজফ্ফর শাহের দিল্লীর সুলতানের পক্ষে এগিয়ে আসার সংবাদে তিনি প্রতিনিবৃত্ত হন। ১৪২৭ খ্রীষ্টাব্দে ইব্রাহিন বয়ান আক্রমণ করলে দিল্লীর সৈয়দ বংশীয় সুলতান তা প্রতিরোধ করেন। ১৪৩১ খ্রীষ্টাব্দে ইব্রাহিম কাল্পি আক্রমণ করেন, কিন্তু মালবের হুসঙ্গ শেষ পর্যন্ত কাল্পি জয় করেন।

১৪৪০ খ্রীষ্টাব্দে ইব্রাহিম মারা গেলে তাঁর উত্তরাধিকারী মাহমুদ শাহ বঙ্গদেশ আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হয়েও, শেষ পর্যন্ত কাল্পি আক্রমণ করেন। কাল্পির তদানীন্তন শাসক নাসির দিল্লীর সুলতানের অপ্রিয়ভাজন হওয়ায় তাঁরই নির্দেশে জৌনপুরের মাহমুদ শাহ নাসিরকে আক্রমণ করেন ১৪৪৪ খ্রীষ্টাব্দে। তখন মালবের সুলতান মাহমুদ খলজী নাসিরের পক্ষ অবলম্বন করেন। শেষ পর্যন্ত একজন সাধুর মধ্যস্থতায় উভয়পক্ষেয় যুদ্ধ বিরতি ঘটে। কাল্পি নাসিরের অধীনে থাকে। অতঃপর মাহমুদ চুনারে একটি বিদ্রোহ দমন করেন। ১৪৫২ খ্রীষ্টাব্দে মাহমুদ কয়েকজন বিদ্রোহী আমীরের আহ্বানে দিল্লী আক্রমণ করেন। উদ্দেশ্য ছিল দিল্লীর সুলতান বুহ্লুল লোদীকে অপসারণ। কিন্তু বুহ্লুলের নিকট তিনি পরাস্ত হন। এর পরেও বুহ্লুলের সঙ্গে আরও একবার যুদ্ধ হয়েছিল যখন বুহ্লুল সামসাবাদ নামক স্থানটির শাসনভার রাজা করণের উপর অর্পণ করেছিলেন। কিন্তু ১৪৫৭ খ্রীষ্টাব্দে মাহমুদ শাহ মারা গেলে পরবর্তী সুলতান মুহম্মদ শাহ বুহ্লুলের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসেন।

১৪৫৮ খ্রীষ্টাব্দে মুহম্মদ শাহ তাঁর ভ্রাতা হুসেন কর্তৃক অপসারিত হন। হুসেন তিরহুত জয় করেন এবং উড়িষ্যায় একটি অভিযান প্রেরণ করেন। গোয়ালিয়র দুর্গ অধিকারেরও তিনি একটি ব্যর্থ চেষ্টা করেন। অতঃপর হুসেন দিল্লী অভিযানের জন্য

প্রস্তুত হন। বুহ্‌লুলের একার পক্ষে তাঁকে প্রতিহত করা সম্ভব ছিল না। তিনি মালবের সাহায্য চেয়েছিলেন। কিন্তু মালবের সুলতানের আকস্মিক মৃত্যুতে সে সাহায্য পৌঁছোয় নি। ১৪৬৯ খ্রীষ্টাব্দে হুসেন বিরাট বাহিনী নিয়ে দিল্লীর উপকণ্ঠে হাজির হন। বুহ্‌লুল যথেষ্ট হীনতা স্বীকার করে সন্ধির প্রস্তাব করেন। কিন্তু হুসেন তা প্রত্যাখ্যান করলে, বুহ্‌লুল একটা আকস্মিক আক্রমণ করে জৌনপুর বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে দেন। পর বৎসর হুসেন পুনরায় দিল্লী আক্রমণ করতে গিয়ে বুহ্‌লুল কর্তৃক সিকেরা নামক স্থানে পরাজিত হন। ১৪৭৯ খ্রীষ্টাব্দে হুসেন আবার দিল্লী আক্রমণ করে পরাজিত হন এবং বিহারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বুহ্‌লুলের মৃত্যুর পর সিকন্দর লোদী দিল্লীর সুলতান হলে হুসেন সিকন্দরের ভাই জৌনপুরের তদানীন্তন শাসক বারবককে বিদ্রোহ করতে উৎসাহিত করেন। তখন সিকন্দর বারবকের কাছ থেকে জৌনপুর কেড়ে নেন এবং হুসেনকে তাড়া করেন। হুসেনের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে তিনি বাংলার সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহের আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং সেখানেই অখ্যাত অবস্থায় পরলোকগমন করেন।

৩ ॥ তিরহুত বা মিথিলা

উত্তরে হিমালয়, পূর্বে কোশী, পশ্চিমে গণ্ডক ও দক্ষিণে গঙ্গা দ্বারা বেষ্টিত মিথিলা বা তিরহুতে কর্ণাটবংশীয় নান্যদেবপ্রবর্তিত একটি রাজবংশ ১০৯৭ খ্রীষ্টাব্দে থেকে রাজত্ব করত। এই অঞ্চলটি প্রত্যক্ষভাবে দিল্লী-বাংলা রাস্তার বাইরে ছিল বলেই, এদিকে কোন সুপরিকল্পিত তুর্কী আক্রমণ ঘটে নি, যদিও ১২২৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশের গিয়াসুদ্দীন আইওয়াজ বা ১২৪৩-৪৪ খ্রীষ্টাব্দে তুখান বা তুঘ্রিল এই অঞ্চলে কিছু লুণ্ঠন ও কর আদায় করেছিলেন। ১২৮০ খ্রীষ্টাব্দে নাগাদ মিথিলায় হরিসিংহ নামে একজন শক্তিশালী রাজা ছিলেন। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় যে তিনি একটি শক্তিশালী সুলতানকে পরাজিত করেছিলেন। এই ঘটনাটি ঘটেছিল হয় ১২৮৭ খ্রীষ্টাব্দে বলবনের মৃত্যুর পর বিশৃংখলার যুগে, না হয় ১৩১৬ খ্রীষ্টাব্দে আলাউদ্দীন খলজীর মৃত্যুর পর। ১৩২৪-২৫ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সুলতান গিয়াসুদ্দীন তুঘলক তিরহুত বা মিথিলা জয় করেন। হরিসিংহ প্রবল ভাবে বাধা দিয়েও শেষ পর্যন্ত নেপালে পালিয়ে যান। মুহম্মদ তুঘলকের মৃত্যুর পর সম্ভবত তিরহুত স্বাধীন হয়েছিলেন, কিন্তু ১৩৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ফিরুজ তুঘলক পুনরায় তিরহুত অধিকার করেন এবং একজন ব্রাহ্মণকে সেখানকার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করেন। এই নূতন রাজবংশ সুগৌন বংশ হিসাবে পরিচিত এবং এই বংশ

১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে রাজত্ব করেছিল। কোন কোন প্রাচীন গ্রন্থে প্রাক্তন হরিসিংহের বংশধরদের মিথিলার শাসক হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এমন হতে পারে যে গিয়াসুদ্দীন তুঘলক মিথিলা জয় করে হরিসিংহের কোন বংশধরকে তাঁর অধীনস্থ রাজা হিসাবে বসিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু পরে তাঁর মতিগতি বা ক্রিয়াকলাপ দিল্লীর পক্ষে প্রতিকূল মনে হওয়ায় ফিরুজ তুঘলক তাঁকে সরিয়ে অন্য লোককে বসিয়েছিলেন। সুগৌন বংশের চোদ্দজন রাজার নাম যথাক্রমে কামেশ্বর, ভোগীশ্বর, গণেশ্বর, কীর্তিসিংহ, ভবসিংহ, দেবসিংহ, শিবসিংহ, পদ্মসিংহ, হরসিংহ, নরসিংহ, ধীরসিংহ, ভৈরবসিংহ, রামভদ্রী ও লক্ষ্মীনাথ। বিখ্যাত কবি বিদ্যাপতি ছিলেন শিবসিংহের সভাকবি। মিথিলার রাজনৈতিক জীবন ছিল মোটামুটি নিস্তরঙ্গ। মাঝে মাঝে দু'একবার বহিরাক্রমণ হয়েছে, কিন্তু তার তেমন কোন প্রভাব মিথিলার রাজনৈতিক জীবনে পড়েনি। গিয়াসুদ্দীন তুঘলক বা বাংলার সামসুদ্দীন ইলিয়াস মিথিলায় অভিযান করেছিলেন এবং কিছু লুণ্ঠনকার্যও সম্পন্ন করেছিলেন। ১৪৯৪-৯৫ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সুলতান সিকন্দর লোদী জৌনপুরেরর হুসেনকে তাড়া করে প্রত্যাবর্তনের পথে মিথিলায় এসেছিলেন, এবং মিথিলার তৎকালীন রাজার কাছ থেকে কর নিয়ে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার সুলতান নুসরৎ শাহ মিথিলা জয় করে নিলে সেখানে সৌগন বংশের শাসন বিলুপ্ত হয়।

৪॥ বঙ্গদেশ

দিল্লী-সুলতানীর যুগে বঙ্গদেশ বরাবরই কার্যত স্বাধীন ছিল। গিয়াসুদ্দীন বলবন বঙ্গদেশের বিদ্রোহী তুঘ্রিল খানকে দমন করে নিজপুত্র বুঘরা খানকে সেখানে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করার সুযোগ দিয়ে প্রকারান্তরে বঙ্গদেশের স্বাধীনতা মেনে নিয়েছিলেন। বুঘরার শাসনকেন্দ্র ছিল লখনৌতি (মালদহ জেলায়)। শান্তিপ্রিয় বুঘরা দিল্লীর সুলতানী প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, এবং শেষ জীবনে তাঁর পুত্র রুকনুদ্দীন কাইকাউসের অনুকূলে ১২৯১ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসন ত্যাগ করেচিলেন। রুকনুদ্দীন যে ১২৯৮ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা ও বিহারের নানাস্থানে কর্তৃত্ব করেছিলেন তার প্রমাণ তাঁর লেখমালা ও মুদ্রাসমূহ থেকে পাওয়া যায়। ১৩০১ খ্রীষ্টাব্দে সম্ভবত রুকনুদ্দীনকে হত্যা করে সামসুদ্দীন ফিরুজ বঙ্গদেশের রাজা হন। রুকনুদ্দীন এবং সামসুদ্দীনের আমলে দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গে তাঁদের অধিকার বিস্তৃত হয়। লখনৌতি ছাড়া তাঁদের আরও দুটি শাসনকেন্দ্র গড়ে ওঠে যথাক্রমে সাতগাঁও (হুগলী জেলা) ও সোনারগাঁওতে (ঢাকা জেলা)। সামসুদ্দীন ফিরুজ শ্রীহট্ট বা শিলেট জয় করেছিলেন।

সামসুদ্দীন ফিরুজের রাজত্বকালে তাঁর দুই পুত্র শিহাবুদ্দীন বুঘদহ এবং গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর ১৩১০-১৪ নাগাদ বিদ্রোহ করে যথাক্রমে লখনৌতি ও সোনারগাঁও দখল করেন। ১৩২২ খ্রীষ্টাব্দে সামসুদ্দীনের মৃত্যু হলে গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর অন্য ভাইদের নিহত করে ক্ষমতা দখল করেন। তাঁর দুই ভাই অবশ্য মৃত্যু এড়াতে পেরেছিলেন, লখনৌতির শাসক নাসিরুদ্দীন ইব্রাহিম এবং সোনারগাঁও-এর শাসক সিহাবুদ্দীন। ১৩২৪ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সুলতান গিয়াসুদ্দীন তুঘলক বঙ্গদেশ আক্রমণ করে গিয়া-সুদ্দীনকে বাহাদুরকে পরাজিত করেন ও তাঁকে বন্দী করে দিল্লী নিয়ে যান। উত্তর বঙ্গের (লখনৌতি) শাসনভার তিনি অর্পণ করেন পূর্বের সুলতান সামসুদ্দীনের পুত্র নাসিরুদ্দীন ইব্রাহিমের উপর। পক্ষান্তরে সোনারগাঁও এবং সাতগাঁও দিল্লী সুলতানীর অংশ হিসাবে ঘোষিত হয় এবং বহরাম খানকে এই দুই অঞ্চলের শাসক নিযুক্ত করা হয়।

মুহম্মদ তুঘলক বাংলাদেশকে বাগে রাখার জন্য কতিপয় দিল্লীর এজেন্টকে খবরদারির জন্য পাঠিয়ে দেন। লখনৌতিতে নাসিরুদ্দীন ইব্রাহিমের উপর নজর রাখার জন্য জনৈক কাদির খানকে তাঁর ঘাড়ে চাপিয়ে দেন। সোনারগাঁও-এ বহরাম খানের উপর কর্তৃত্ব করার জন্য তিনি গিয়াসুদ্দীন বাহাদুরকে বন্দী দশা থেকে মুক্ত করে পাঠিয়ে দেন। সাতগাঁও-এর জন্য তিনি নিযুক্ত করেন ইজুদ্দীন ইয়াহিয়াকে। গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর কিন্তু দিল্লীর ক্রীড়নক হয়ে থাকতে রাজী ছিলেন না। তিনি বিদ্রোহ করলে বহরাম খান তাঁকে পরাস্ত ও নিহত করেন। তাঁর চামড়া খুলে তার মধ্যে খড় পুরে মুহম্মদ তুঘলকের নিকট পাঠিয়ে দেন। এই ঘটনা ঘটে ১৩২৮ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পরে।

১৩৩৭-৩৮ খ্রীষ্টাব্দে সোনারগাঁও-এর শাসক বহরাম খানের মৃত্যু ঘটলে তাঁর এক কর্মচারী ফকরুদ্দীন মুবারক শাহ দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করেন। এই সংবাদে ক্ষিপ্ত হয়ে মুহম্মদ তুঘলক কারা, লখনৌতি ও সাতগাঁও-এর শাসকদের নির্দেশ দেন ফকরুদ্দীনকে দমন করার। ফকরুদ্দীন পরাজিত হলেও শেষ পর্যন্ত বিজয়ী পক্ষের সৈন্যদের নিজেদের মধ্যে বিক্ষোভের সুযোগ নিয়ে সোনারগাঁও পুনরাধিকার করেন এবং লখনৌতির শাসক কাদির খানকে নিহত করেন। দিল্লীর সুলতান মুহম্মদ তুঘলক যখন নানাস্থানে বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত, সেই সুযোগে ফকরুদ্দীন পুরোপুরি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১৩৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দে ফকরুদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ইখতিয়ারুদ্দীন গাজী শাহ তিন বছর রাজত্ব করেন। এদিকে লখনৌতিতে আলি

মুবারক নামে এক ব্যক্তি ক্ষমতা দখল করে ১৩৪০ খ্রীষ্টাব্দে আলাউদ্দীন আলি শাহ নাম নিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

১৩৪৫-৪৬ খ্রীষ্টাব্দে নাগাদ সামসুদ্দীন ইলিয়াস নামক একজন ব্যক্তি আলাউদ্দীন আলি শাহকে অপসারিত করে লখনৌতি দখল করেন। ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তিরহুত বা মিথিলার মধ্য দিয়ে নেপাল পর্যন্ত অভিযান করেন এবং প্রচুর ধনরত্ন লুণ্ঠন করেন। তারপর তিনি উড়িষ্যায় একটি অভিযান করেন এবং কটক ও চিল্কা অঞ্চলে লুঠপাট করেন। ১৩৫২-৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সোনারগাঁও-এর সুলতান ইখতিয়ারুদ্দীন গাজী শাহকে পরাস্ত করে পূর্ববঙ্গ নিজ অধিকারে আনেন। তাঁর ক্ষমতাবৃদ্ধিতে শংকিত হয়ে দিল্লীর সুলতান ফিরুজ তুঘলক বঙ্গদেশে স্বয়ং একটি অভিযান করেন এবং পাণ্ডুয়া অধিকার করেন। সামসুদ্দীন ইলিয়াস তখন একডালা দুর্গে আশ্রয় নেন। এই দুর্গটি ছিল মহানন্দার দুই উপনদী বালিয়া ও চিরামতীর মধ্যে অবস্থিত। ফিরুজ দু'মাস এই দুর্গ অবরোধ করে থাকেন, তারপর বর্ষা আসন্ন দেখে দিল্লী ফিরে যেতে মনস্থ করেন। ফিরুজের প্রত্যাবর্তনকালে ইলিয়াস সম্ভবত পিছন দিক থেকে তাঁকে আক্রমণ করেছিলেন, তবে যুদ্ধের ফলাফল যে কোন পক্ষের অনুকূলে গিয়েছিল তা বলা যায় না। ফিরুজের অভিযান চলেছিল ১৩৫৩-৫৫ পর্যন্ত। ইলিয়াস দিল্লীর একটা আনুষ্ঠানিক আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন, এবং ফিরুজ বিনিময়ে বঙ্গদেশে তাঁর সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়েছিলেন।

ইলিয়াস শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সিকন্দরের রাজত্বকালে ১৩৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ফিরুজ তুঘলক আরও একবার বঙ্গদেশ অভিযান করেন। তাঁর পিতার মত সিকন্দর-ও একডালা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং কিছুকাল ওই দুর্গ অবরোধ করে থাকার পর ফিরুজ সিকন্দরের সঙ্গে একটা সন্ধি করে ফিরে যান। সন্ধির শর্ত অনুযায়ী কুশী নদীর পশ্চিমাঞ্চলে যে সকল স্থানে সিকন্দরের অধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেগুলি সিকন্দর ফিরুজকে দিয়ে দেন। বিনিময়ে ফিরুজ সিকন্দরকে বঙ্গদেশের স্বাধীন সুলতান হিসাবে স্বীকৃতি দেন ও বহুমূল্য একটি মুকুট উপহার দেন। গোদাবরী বদ্বীপে উড়িষ্যার অধীন একটি সামন্তরাজ্য কোনমণ্ডলের রাজা দ্বিতীয় বোড় ফিরুজের বিরুদ্ধে বঙ্গদেশের সুলতানকে সাহায্য করেছিলেন, তবে এই সুলতান ইলিয়াস না সিকন্দর তা বলা যায় না।

১৩৯০-৯১ খ্রীষ্টাব্দে সিকন্দরের বিদ্রোহী পুত্র গিয়াসুদ্দীন আজম সিকন্দরকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করে বঙ্গদেশের সুলতান হন। তিনি কামতা ও অহোমদের বিরোধের সুযোগ নিয়ে আসাম আক্রমণ করেন, কিন্তু তারা বিচক্ষণতার সঙ্গে ঐক্য-

বদ্ধ হয়ে গিয়াসুদ্দীনের বাহিনীকে হটিয়ে দেয়। আরাকানের রাজা মেঙ্গ-সৌ-মৌন রাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়ে তাঁর কাছে আশ্রয় নিয়েছিলেন, এবং গিয়াসুদ্দীন তাঁকে আরাকানের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করার একটা ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলেন। জৌনপুর সুলতানীর প্রতিষ্ঠাতা খাজা জাহানের সঙ্গে গিয়াসুদ্দীনের সুসম্পর্ক ছিল। জৌনপুরের পরবর্তী সুলতান বঙ্গদেশ আক্রমণ করে ব্যর্থ হন। গিয়াসুদ্দীন আজম চীনের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্কের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

গিয়াসুদ্দীনের পর বঙ্গদেশে পর্যায়ক্রমে রাজত্ব করেন তাঁর পুত্র সৈফুদ্দীন হামজা শাহ (১৪১০-১২), তাঁর পুত্র সিহাবুদ্দীন বায়জিদ শাহ (১৪১৩-১৪) এবং তাঁর পুত্র আলাউদ্দীন ফিরুজ শাহ (১৪১৪-১৫)। সম্ভবত আলাউদ্দীন ফিরুজ শাহ রাজা গণেশ কর্তৃক উৎখাত হয়ে লখনৌতি ত্যাগ করে পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে সরে এসেছিলেন। রাজা গণেশ উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর অথবা রাজশাহী জেলার জমিদার ছিলেন। গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের আমলে তিনি প্রাধান্য লাভ করেন। রাজা গণেশ সম্পর্কে উপাদান-গ্রন্থসমূহে যা লেখা আছে তা থেকে দুরকম সিদ্ধান্ত করা যায়। প্রথমটি হচ্ছে এই যে গণেশ নিজে সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন এবং সাত বছর রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র যদু জালালুদ্দীন নাম গ্রহণ করে রাজত্ব করেছিলেন এবং তিনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। গণেশের আমলে জৌন-পুরের ইব্রাহিম শাহ শার্কি বঙ্গদেশ আক্রমণ করেছিলেন। দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটি হচ্ছে গণেশ কোন দিনই রাজা হননি, তবে তিনি অত্যন্ত ক্ষমতাবান ব্যক্তি ছিলেন। ইলিয়াসশাহী বংশের শেষ পর্যায়ে তিনি তাঁর পুত্র যদুকে ইসলামধর্মে দীক্ষিত করিয়ে বঙ্গদেশের সিংহাসনে বসিয়ে দেন।

দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটির পক্ষে একটি বক্তব্য হচ্ছে রাজা গণেশের নামাঙ্কিত কোন মুদ্রা নেই অথচ তাঁর পুত্র যদু বা জালালুদ্দীনের নামে মুদ্রা আছে যেগুলি তৈরি হয়ে-ছিল ১৪১৮-১৯ খ্রীষ্টাব্দে। এই সময়টা ইলিয়াস শাহী বংশের শেষ রাজা আলাউদ্দীন ফিরুজ শাহের ঠিক পরবর্তী পর্যায়ের সঙ্গে খাপ খেয়ে যায়। তবে ১৪১৭-১৯ মধ্যে প্রস্তুত দনুজমদনদেব নামক এক রাজার মুদ্রা পাওয়া গেছে। এই দনুজমর্দনকে কেউ কেউ রাজা গণেশের সঙ্গে অভিন্ন মনে করেন। তবে পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য থেকে অনুমিত হয় যে দনুজমর্দন অন্য কোন অঞ্চলের স্থানীয় রাজা ছিলেন।

তবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে গণেশের পুত্র জালালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ ১৪১৫ থেকে ১৪৩১ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। তিনি গোটা বঙ্গদেশের উপরই পূর্ণ কর্তৃত্ব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। শাসক হিসাবে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। চীনের সঙ্গে তিনি তাঁর পূর্ববর্তীদের মত সম্পর্ক রেখেছিলেন।

তাঁর পুত্র সামসুদ্দীন আহমদ শাহ ১৪৩৬ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর দু'জন সভাসদ কর্তৃক নিহত হন। কিন্তু তাঁর হত্যাকারীদের পারস্পরিক বিবাদের সুযোগে প্রাক্তন ইলিয়াস শাহী বংশের নাসিরুদ্দীন মাহমুদ ক্ষমতা দখল করেন এবং ১৪৫৯ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁর সময় পশ্চিমবঙ্গের কিছু অঞ্চল উড়িষ্যার কপিলেন্দ্র কর্তৃক বিজিত হয়। তিনি তাঁর রাজধানী গৌড়ে স্থানান্তরিত করেন।

পরবর্তী সুলতান রুকনুদ্দীন বারবক শাহ ১৪৭৪ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি শাহ ইসমাইল গাজী নামেও পরিচিত। তিনি উড়িষ্যার সঙ্গে দীর্ঘকাল যুদ্ধ করেছিলেন, হুগলী জেলার আরামবাগে অবস্থিত মান্দারণ দুর্গকে কেন্দ্র করে। তিনি আসামের কামতা রাজাকে পরাজিত করেছিলেন এবং আরাকানীদের হাত থেকে চট্টগ্রাম উদ্ধার করেছিলেন। তিনি সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ বিজয় কাব্যের লেখক মালাধর বসুকে গুণরাজ খান উপাধি দিয়েছিলেন। রুকনুদ্দীনের পর সামসুদ্দীন ইউসুফ ১৪৮১ পর্যন্ত এবং তারপর তাঁর পুত্র সিকন্দর রাজত্ব করেন। কিন্তু পূর্ববর্তী সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহমুদের পুত্র জালালুদ্দীন ফথ শাহ তাঁকে পদচ্যুত করে ক্ষমতা দখল করেন। এই সময় রাজপ্রাসাদের একটি হাবসী বা আবিসিনীয় দাসচক্র শক্তি-মান হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত এরাই ইলিয়াস শাহী বংশকে খতম করে। হাবসী দাসদের নেতা সৈফুদ্দীন ফিরুজ নাম নিয়ে ১৪৮৭ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

সৈফুদ্দীন ফিরুজ শাসক হিসাবে সুযোগ্য ছিলেন এবং ১৪৯০ পর্যন্ত নির্বিবাদে রাজত্ব করেছিলেন। পরবর্তী রাজা তাঁর পুত্র নাসিরুদ্দীন মাহমুদ নাবালক থাকায় প্রথমে হাবশ খান ও পরে সিদীবদর তাঁর অভিভাবক হন। সিদীবদর নাসিরুদ্দীনকে হত্যা করে ১৪৯১ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসন দখল করেন। তাঁর কুশাসন ও অত্যাচার চূড়ান্ত হওয়ায় তাঁরই মন্ত্রী সৈয়দ হুসেন বিদ্রোহী আমীরদের সহায়তায় ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে নিহত করে আলাউদ্দীন হুসেন শাহ নাম নিয়ে বঙ্গদেশের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

হুসেন শাহের রাজত্বকাল নানা কারণে বঙ্গদেশের ইতিহাসে স্মরণীয়। তিনি প্রথমেই কঠোরভাবে শান্তি ও শৃংখলার প্রবর্তন করেন। পুরাতন আমলের কর্ম-চারীদের বরখাস্ত করে তিনি সমস্ত দপ্তর নূতন ও নিজের অনুগত লোকদের দিয়ে পূর্ণ করেন। পূর্বতন অরাজকতা যুগের লুণ্ঠিত ধনসামগ্রী তিনি উদ্ধার করেন। ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে নাগাদ দিল্লীর সুলতান সিকন্দর লোদী বঙ্গদেশে আশ্রিত জৌনপুরের পলাতক সুলতানের অনুসন্ধানে এলে হুসেন শাহ তাঁকে প্রতিহত করার জন্য একটি

বাহিনী পাঠান। শেষ পর্যন্ত অবশ্য উভয় তরফের একটা সন্ধি হয়। উভয়পক্ষই পরস্পরের সীমানা লঙ্ঘন না করতে প্রতিশ্রুত হয়, এবং হুসেন এই প্রতিশ্রুতি দেন যে আশ্রয়প্রাপ্ত জৌনপুরের সুলতানকে কোন রাজনৈতিক উচ্চাশা পূরণের সুযোগ দেবেন না। ১৪৯৯ থেকে ১৫০২-এর মধ্যে হুসেন আসামের কামতা রাজ্যে অভিযান করেন এবং কামরূপ জেলার হাজো পর্যন্ত তাঁর এলাকা বিস্তৃত হয়। মেদিনীপুর ও হুগলীর আরামবাগ অঞ্চল উড়িষ্যার প্রভাবাধীন ছিল। এই প্রভাব উৎখাত করার জন্য হুসেন দীর্ঘকাল উড়িষ্যার সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন ও কিয়দংশে সফলও হয়েছিলেন। উড়িষ্যার প্রতাপরুদ্র মান্দারণ দুর্গ অবরোধ করেও তা অধিকার করতে ব্যর্থ হন। ত্রিপুরা রাজ্যের বিরুদ্ধে হুসেন পর পর চারবার অভিযান করেছিলেন। ত্রিপুরার সামান্য কিছু জায়গা দখল করা ভিন্ন এই অভিযানগুলি বিশেষ সার্থক হয়নি। ১৫১৩ থেকে ১৫১৬ এর মধ্যে হুসেন কয়েকবার আরাকানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হন কেননা ত্রিপুরার বিরুদ্ধে যুদ্ধে আরাকানীরা ত্রিপুরার রাজা ধন্যমাণিক্যকে সাহায্য করেছিল। আরাকানীদের নিকট থেকে তিনি চট্টগ্রাম অধিকার করতে পেরেছিলেন। হুসেন শাহ কোন সামরিক প্রতিভা ছিলেন না, এবং তাঁর রাজত্বকালে বাংলাদেশর যে খুব সমৃদ্ধি হয়েছিল তা নয়। তথাপি হুসেন শাহ জনপ্রিয় ছিলেন কেননা তিনি সেই যুগে বঙ্গদেশে যেভাবেই হোক না কেন একটি জাতীয় চেতনা (আধুনিক অর্থে না হলেও) সঞ্চার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। মুঘল বাদশাহরা যেমন তাঁদের উদারতা বা সঙ্কীর্ণতা, ব্যক্তিগত সুকৃতি বা অকৃতি সত্ত্বেও, নিজেদের ভারতীয় মনে করতেন, হুসেন শাহ ও তাঁর পুত্র নুসরৎ শাহ, তেমনই একটি বাঙালী জাতীয়তার অংশীদার হিসাবে নিজেদের মনে করতেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য তাঁরা পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। চৈতন্যদেব হুসেন শাহের সময়ই আবির্ভূত হয়েছিলেন।

১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে হুসেন শাহ মারা গেলে তাঁর পুত্র নুসরৎ শাহ বঙ্গদেশের সীমানা আরও বাড়িয়ে তুলেছিলেন। উত্তর ভারতে ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে বাবুর ক্ষমতালাভ করলে পরাজিত আফগানরা পূর্বদিকে সরে এসে তাঁর অস্তিত্বের ক্ষেত্রে বিঘ্ন ঘটাতে পারে এই আশঙ্কায় বিচক্ষণ নুসরৎ বাবুরের সঙ্গে সন্ধি করেন। ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি উত্তর ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় অহোম রাজ্য আক্রমণ করেন, কিন্তু দীর্ঘকাল আসামের নানা স্থানে যুদ্ধ চালিয়েও তিনি বিশেষ সাফল্য লাভ করতে পারেননি। পিতা হুসেন শাহের মতই তিনি বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দে আততায়ীর হস্তে নুসরতের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র আলাউদ্দীন ফিরুজ কিছুদিন বঙ্গের সুলতান হন। কিন্তু শীঘ্রই তাঁর পিতৃব্য গিয়াসুদ্দীন মাহমুদ শাহ ক্ষমতা দখল করেন।

তিনি ১৫৩৮ পর্যন্ত রাজত্ব করেন, এবং শেষ পর্যন্ত শেরশাহ কর্তৃক উৎখাত হন।

৫॥ আসাম

ত্রয়োদশ শতকের শেষের দিকে আসামের রাজনৈতিক চিত্র ছিল নিম্নরূপ: কামতা বা কামতাপুর নামে পরিচিত পুরাতন কামরূপ রাজ্যের একটা অংশ যার পশ্চিমসীমা ছিল কোচবিহারের কিঞ্চিত দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত করতোয়া নদী এবং যার পূর্বসীমা বলে কিছু বাঁধা ধরা এলাকা ছিল না। বর্তমান কামরূপ ও গোয়ালপাড়া জেলা কখনও কখনও কামতা রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। পূর্বদিকে উত্তর ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় গড়ে উঠেছিল অহোমরাজ্য। বর্তমান লখিমপুর ও শিবসাগর এবং সন্নিহিত কিছু অঞ্চল নিয়ে ছিল চুতিয়াদের রাজ্য, যাদের রাজধানীর নাম ছিল সদিয়া। চুতিয়াদের রাজ্যের দক্ষিণ পশ্চিমে ছিল কাছাড়ীদের রাজ্য।

কামতা অঞ্চলে ১১৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বল্লভদেব রাজত্ব করতেন। এখানে ১২০৫, ১২২৭ ও ১২৫৭ খ্রীষ্টাব্দে যথাক্রমে বখ্‌তিয়ার খলজী, গিয়াসুদ্দীন আইওয়াজ এবং তুঘ্রিল খানের আক্রমণ ঘটেছিল যদিও কোনটিই কোন স্থায়ী ফল প্রসব করেনি। ত্রয়োদশ শতকের শেষের দিকে কামতায় দুর্লভ নারায়ণ রাজত্ব করতেন যাঁর রাজ্যের এলাকা করতোয়া থেকে বরনদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁর সময় আহোমরাজ সুখাঙ্গপা কামতা আক্রমণ করেছিলেন, যদিও শেষ পর্যন্ত উভয় রাজ্যের মধ্যে সন্ধি হয়েছিল।

পুরাতন কামরূপ রাজ্যের দক্ষিণ অঞ্চলে বাংলাদেশের মৈমনসিংহ ও সিলেট জেলায় দুর্লভনারায়ণের জ্ঞাতিভাই ধর্মনারায়ণ রাজত্ব করতেন। চতুর্দশ শতকে বঙ্গদেশের সুলতান সামসুদ্দীন ফিরুজ সিলেট দখল করেন। এইখানে সম্ভবত ঘাঁটি করে দিল্লী প্রেরিত শাসক সুলতান গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর শাহ ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম তুঘলকদের তরফ থেকে দখল করেন ১৩২৬-২৭ খ্রীষ্টাব্দে। ইলিয়াস শাহ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় একটি অভিযান চালিয়েছিলেন। আজম শাহ কামতারাজ্য আক্রমণ করে সাফল্যলাভ করতে পারেননি। চতুর্দশ শতকের শেষের দিকে কামতারাজ্য রীতিমত শক্তিশালী ছিল এবং দক্ষিণের তুর্কী অধিকৃত এলাকাগুলি, যেমন মৈমনসিংহ ও সিলেট, পুনরায় কামতা রাজাদের কর্তৃত্বে এসেছিল। তবে পরবর্তীকালে ১৪৯৮ থেকে ১৫০২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে হুসেন শাহ কামতারাজ্যে কয়েকটি অভিযান প্রেরণ করেছিলেন এবং কিছুকালের জন্য কামরূপ জেলার হাজো পর্যন্ত এলাকা নিজ অধিকারে রেখেছিলেন।

পূর্বদিকের অহোমরাজ্য ১২১৫ থেকে ১২৯৩র মধ্যে সুকাফা, সুতেউফা ও সুবিনফার নেতৃত্বে শক্তিশালী হয়। পরবর্তী রাজা সুখাঙ্গপা অহোমরাজ্যের সীমানা বর্ধিত করেন এবং পার্শ্ববর্তী কামতারাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। ১৩৩২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মারা গেলে তাঁর তিন পুত্র পরপর উত্তরাধিকারী হন যাঁদের রাজত্বকাল ১৩৩২ থেকে ১৩৬৯ পর্যন্ত। এই সময় অহোমদের সঙ্গে চুতিয়াদের দীর্ঘস্থায়ী সংঘর্ষ হয়। পরবর্তী রাজা সুদাঙ্গফা ১৪০১ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পরে কামতারাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন, এবং তাঁদের বিরোধের সুযোগে বাংলার সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম আসাম আক্রমণ করলে, দুই রাজ্যের রাজা পারস্পরিক বিরোধ ভুলে যুক্তভাবে আজমকে পরাজিত করে হটিয়ে দেন। সুদাঙ্গ ফা মারা যান ১৪০৭ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর পরের দুজন রাজার রাজত্বকাল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয়। পরবর্তী রাজা সুসেন ফা ১৪৩৯ থেকে ১৪৮৮ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন যাঁর আমলে অহোমরাজ্যে একটি নাগা আক্রমণ হয়েছিল। পরবর্তী রাজা সুহেন ফা কাছাড়ীদের নিকট পরাজিত হন।

১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে সুহুঙ্গমুঙ্গ অহোম সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং স্বর্গ নারায়ণ নাম গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর রাজধানী দিহিং নদীর তীরে বকতা নামক স্থানে স্থানান্তরিত করেন। চুতিয়াদের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ হয়, ১৫১৩ থেকে ১৫২৩ পর্যন্ত, এবং পরিণামে চুতিয়ারাজ্য অহোম অধিকারে আসে। ১৫২৬ থেকে ১৫৩১-এর মধ্যে তিনি কয়েকবার কাছাড় আক্রমণ করেন যার ফলে সমগ্র ধানসিরি উপত্যকা এবং কোল্লঙ্গ নদীর উত্তরস্থ কাছাড়ী এলাকাগুলি তাঁর অধীনে আসে। তাঁর আমলে বঙ্গদেশের আলাউদ্দীন হুসেন শাহ ১৫১৯ এর কিছু আগে এবং তাঁর পুত্র নুসরৎ শাহ ১৫২৭ অথবা ১৫২৯ খ্রীষ্টাব্দে অহোমরাজ্য আক্রমণ করেছিলেন। গোড়ার দিকে তাঁরা কিছুটা সফল হলেও এবং অহোমরাজ্যের কয়েকটি স্থানে অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হলেও শেষ পর্যন্ত সুহুঙ্গমুঙ্গ তাঁদের অহোমরাজ্য থেকে উৎখাত করেছিলেন। সুহুঙ্গমুঙ্গ এর সময় অহোমরাজ্য পূর্বভারতের একটি প্রধান ও দুর্ভেদ্য শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। বিখ্যাত সাধক ও বৈষ্ণব প্রচারক শংকরদেব তাঁর সময়েই আবির্ভূত হয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে সুহুঙ্গমুঙ্গ তাঁর পুত্র সুকলেন কর্তৃক ১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দে নিহত হন।

নবম অধ্যায়

দিল্লী সুলতানী আমলের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ

১॥ দিল্লী সুলতানী যুগের প্রকৃত রাজনৈতিক চিত্র

দ্বাদশ থেকে ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত যে যুগটিকে ভারতবর্ষের ইতিহাসে দিল্লী সুলতানীর যুগ বলে মনে করা হয় সেযুগে কোন সার্বভৌম ভারতব্যাপী সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল না। দিল্লীর সুলতানদের মধ্যে কেউ কেউ ভারতের নানা-স্থানে দিগ্বিজয় করলেও বা কিছুকালের জন্য কোন কোন অঞ্চলে অধিকার প্রতিষ্ঠা করলেও, দিল্লী সুলতানীর মূল এলাকা প্রধানত দিল্লী ও পাঞ্জাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং সেই হিসাবে দিল্লীর সুলতানরা কার্যত একটি শক্তিরই প্রতিনিধিত্ব করতেন। নিরপেক্ষভাবে বিচার করলে দিল্লী সুলতানীর থেকে গুজরাতের সুলতানী ঢের বেশি শক্তিশালী ও পাকাপোক্ত ছিল। উত্তর-পশ্চিমের বহিরাক্রমণ বারবার দিল্লী সুলতানীর অস্তিত্ব বিপদাপন্ন করে তুলেছিল। মালব ও জৌনপুরের সুলতানরা বার-বার দিল্লী আক্রমণ করেছিলেন। পূর্বাঞ্চল কোনদিনই দিল্লীর অধীনে ছিল না। দক্ষিণে বহমনী রাজ্য ও বিজয়নগর দীর্ঘকাল স্বাতন্ত্র বজায় রেখেছিল। আসলে এই যুগটি পূর্ববর্তী যুগের মতই ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক শক্তির পারস্পরিক সংঘর্ষের যুগ হিসাবে চিহ্নিত।

এই যুগের শাসক শ্রেণীর মধ্যে মুসলমানদের প্রাধান্য থাকলেও এখানে কোন ঐস্লামিক রাষ্ট্রের পত্তন হয়নি। যদিও উলমা শ্রেণী, যাঁদের কাজ ছিল রাজসভায় অবস্থান করে শাসনক্ষেত্রে ঐস্লামিক ধ্যানধারণাসমূহের প্রসার ঘটানো, এ বিষয়ে কিছু চেষ্টা করেছিলেন। ইসলামী রাষ্ট্রতত্ত্বের মূল কথাটা হচ্ছে পৃথিবীর সর্বত্র ইসলাম ধর্মীরা এক ও অভিন্ন, তাদের সামগ্রিক সত্তার প্রতিনিধি হচ্ছেন খলিফা, ঈশ্বরের ইচ্ছায় যিনি জাগতিক বিষয়সমূহ নিয়ন্ত্রিত করেন। কোন কোন মুসলমান শাসক এই বোধের দ্বারা চালিত হয়েই খলিফার নিকট থেকে রাজত্ব করার নির্দেশ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এখানে ইসলামীয় রাষ্ট্রতত্ত্ব কার্যকর হবার পথে কতকগুলি মৌলিক অসুবিধা ছিল।

প্রথম অসুবিধা ছিল, ইসলাম ধর্মাবলম্বী যে সকল শক্তি ভারতে প্রবেশ করেছিল

তারা ছিল কয়েকটি বিশিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর মানুষ, মুখ্যত বিভিন্ন তুর্কীগোষ্ঠীর ও বিভিন্ন আফগান গোষ্ঠীর। মূলত ভাগ্যান্বেষণে তাদের এদেশে আগমন ঘটেছিল। এদেশে আগমনকালে তাদের উপজাতীয় চরিত্রের ও গোষ্ঠীগত প্রবণতার বদল হয়নি, যা ছিল বিজিত অঞ্চলে উপর একজন ব্যক্তির প্রাধান্যের বিশেষ অন্তরায়। সামগ্রিক প্রচেষ্টায় যে অঞ্চলগুলি বিজিত হত সেগুলির উপর একার অধিকার কায়েম রাখা সম্ভব ছিল না, তাই সুলতানদের তাঁদের গোষ্ঠীর লোকদের সন্তুষ্ট রাখার জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা রাখতে হত। বিজিত অঞ্চলের নানাস্থানের আঞ্চলিক শাসকত্ব ও নানা ধরনের পদ গোষ্ঠীর অপরাপর প্রধান ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত রাখতে হত। এব তা ছাড়া গোষ্ঠীর প্রধানরা আমীর ওমরাহ রূপে রাজদরবারে প্রচুর প্রতিপত্তি ভোগ করত। রাজনৈতিক ও অপরাপর ব্যাপারে তাদের হস্তক্ষেপ ছিল অবধারিত। সকলকে খুশি করা কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না। গোষ্ঠীভুক্ত অপরাপর প্রধানদেরও নিজস্ব রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খা ছিল। এরই ফলে ঘন ঘন বিদ্রোহ ঘটত, এবং প্রাসাদ-চক্রান্ত ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। আলাউদ্দীন খলজীর মত জবরদস্ত সুলতান এই গোষ্ঠীতন্ত্রকে নির্মূল করার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত শত্রুদের নিকাশ করলেও তিনি ব্যবস্থাটাকে বদলাতে পারেননি।

ফলে অবস্থাটা দাঁড়িয়েছিল এই যে সুলতান সহ প্রত্যেক প্রধান ব্যক্তিরই নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই নিজস্ব একটি শক্তির ভিত্তি থাকার একান্ত প্রয়োজন ছিল এবং তারই জন্য সকলকেই অল্প বিস্তর স্থানীয় শক্তিগুলির উপর নির্ভরশীল হতে হয়েছিল। ফলে তাঁদের এই ক্ষমতার দ্বন্দ্বে স্থানীয় রাজাদের, যাঁরা অধিকাংশই ধর্মে হিন্দু, একটা ভূমিকা ছিল। এখানকার অর্থনীতি মূলত কৃষিনির্ভর হবার দরুন দেশ জুড়েই ছোট বড় অসংখ্য ভূম্যাধিকারী বর্তমান ছিল। এই সকল জমিদার বা রাজারা অপেক্ষাকৃত বৃহৎ রাজাদের, তা তারা হিন্দুই হোক বা মুসলমানই হোক, অধীনস্থ হিসাবে স্বাধীনভাবেই থাকত, এবং তাদেরই সাহায্য ও সমর্থনের উপর উপর-তলার শক্তিগুলি নির্ভরশীল ছিল। স্থানীয় শক্তিগুলির উপর একান্ত নির্ভরতার জন্যই স্থানীয় প্রচলিত ব্যবস্থাগুলির উপর—তা সে সামাজিকই হোক আর ধর্মীয়ই হোক—হস্তক্ষেপ করা কার্যত সম্ভব ছিল না। অখণ্ড ঐস্লামিক রাষ্ট্রের আদর্শ তাই এখানে বাস্তবায়িত হবার কোন সুযোগ পায়নি।

রাজ্য ভাঙা-গড়া বা ক্ষমতার উত্থান পতনের সঙ্গে সাধারণ মানুষের কোন সম্পর্কই ছিল না কেননা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রকৃত কোন জাতীয় চেতনা বা রাজনৈতিক সচেতনতা গড়ে ওঠার সুযোগ ছিল না বললেই হয়। তদুপরি এদেশে সামন্ততন্ত্রের

প্রকৃতিও ছিল ভিন্ন ধরনের যার সঙ্গে ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের কোন সাদৃশ্য ছিল না। ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের ইতিবাচক দিকটি এখানে ছিল অজ্ঞাত, যা আমরা পরে ডঃ বার্নিয়েরের বক্তব্যপ্রসঙ্গে দেখব। বাবুর তাঁর আত্মজীবনীতে বাঙালীদের সম্পর্কে লিখেছেন: "এখানকার রাজ্য ব্যবস্থার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, যে কেউ রাজাকে হত্যা করে সিংহাসন দখল করে নিজে রাজা হতে পারে। আমীর, ওয়াজির, সৈন্যবাহিনী এবং কৃষকেরা তদ্দণ্ডেই তার বশ্যতা স্বীকার করে এবং তার বাধ্য হয়। বাঙালীরা বলে আমরা সিংহাসনেরই প্রতি অনুগত, এবং সিংহাসনের যে দখলদার তাকেই আমরা মানি, সে কেমন করে দখল পেল এটা আমাদের বিবেচ্য নয়।" এই মনোভাব সারা ভারতেই বর্তমান ছিল। কৃষক, শ্রমিক, কারিগর ও পেশাদার শ্রেণীসমূহ সমাজের নিম্নস্তরভুক্ত ছিল। তাদের সামাজিক অবস্থান জাতি প্রথার দ্বারা চিরস্থায়ী করে দেওয়া হয়েছিল, কাজেই কে রাজা রইল কে রইল না তা নিয়ে তাদের কোন মাথাব্যাথার প্রয়োজন ছিল না।

২। হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক

মধ্যযুগের ইতিহাসে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয়। একদল ঐতিহাসিকের মতে, এবং এঁদের মত এখনও বেশ প্রভাবশালী, দিল্লী সুলতানী আমলে হিন্দুদের সর্বনাশ হয়েছিল। অপর একদল মনে করেন মুসলমানদের অত্যাচার সম্পর্কে অনেক কথা বাড়িয়ে বলা হয়েছে, আসলে সে আমলে নানা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংঘর্ষ থাকলেও সেটা ঠিক হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের সংঘর্ষ নয়। এই বিতর্কের মধ্যে প্রবেশ না করেও সাধারণভাবে কিছু আলোচনা করা যায়।

একথা ঠিক, বিভিন্ন মুসলমান ঐতিহাসিকদের রচনায় হিন্দুদের জিম্মি বা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক করে রাখার আদর্শের উপর খুব জোর দেওয়া হয়েছে। যদি কোন সুলতান সেরকম প্রয়াস করে থাকেন তাঁর প্রচুর প্রশংসা করা হয়েছে, এবং যাঁরা তা করেন নি তাঁদের নিন্দা করা হয়েছে। এই রচনাগুলিতে সুলতানের কি করা উচিত তার উপর জোর দেওয়া হয়েছে, যদিও বাস্তবে ব্যাপারটা ছিল অন্য রকম। আমরা ভূমিকায় পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি কোন শাসকের ব্যক্তিগত উদারতা বা গোঁড়ামির দ্বারা নির্ধারিত হয় না। দিল্লীর সুলতানদের অধিকাংশ ছিলেন ধর্ম বিষয়ে উদার মত সম্পন্ন। ফিরুজ শাহ তুঘলক বা সিকন্দর লোদীর মত পরমত অসহিষ্ণু সুলতানের সংখ্যা কমই ছিল। আঞ্চলিক সুলতানদের ক্ষেত্রেও এই কথা সত্য।

এটা অস্বীকার করা যায় না যে অনেক সুলতান রাজ্য দখলের সময় কাফেরদের উচ্ছেদ বা ইসলামের প্রচারকে তাঁদের আদর্শ হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন, যদিও তাঁদের একটা বড় অংশ উদ্দেশ্য সিদ্ধির পর তাঁদের ঘোষিত আদর্শকে কার্যকর করার ক্ষীণতম চেষ্টা করেন নি। আসলে রাজ্যবিস্তার, পররাজ্য গ্রাস বা কোন রাজনৈতিক অভিসন্ধি পূরণের জন্য কোন আদর্শের দোহাই দেওয়া প্রচলিত রীতি। অশোকের মত সম্রাটও রাজ্য বিস্তারের জন্য ধর্ম বিজয়ের আদর্শ ঘোষণা করেছিলেন, শার্লমান খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই পররাজ্য গ্রাস করেছিলেন, ইংরাজরাও নাকি আধা শয়তান আধা শিশু বর্বর ভারতবাসীদের মুক্তি দেবার জন্যই ভারত দখল করে 'শ্বেত মানুষের দায়িত্বের বোঝা' বহন করেছিল, হিটলারও পবিত্র আর্যত্ব পুনরুদ্ধারের জন্যই লড়াই করেছিলেন। বর্তমানেও গণতন্ত্র রক্ষা বা অনুরূপ কোন মহৎ আদর্শের নাম করে দুর্বল ও পশ্চাদপদ দেশগুলির উপর বৃহৎ শক্তিগুলির হস্তক্ষেপ চলছে। কাজেই যদি এখানকার সুলতানরা রাজ্য বিস্তারের জন্য ইসলাম প্রসারের দোহাই দিয়ে থাকেন, তার মধ্যে অসঙ্গতি কিছুই নেই। বরং এমন ঘটনা বহু আছে, যেখানে একজন মুসলমান সুলতান পার্শ্ববর্তী অন্য মুসলমান সুলতানের রাজ্য আক্রমণ করার জন্য এই দোহাই দিয়েছেন যে শেষোক্ত সুলতান পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় দিয়েছেন। কাল্পির মুসলমান সুলতান নাসিরের রাজ্য আক্রমণের অজুহাত হিসাবে মালবের সুলতান মাহমুদ বলেছিলেন যে নাসির খানদানী মুসলিম মেয়েদের কাফেরদের হাতে তুলে দিয়ে ইসলামের আদর্শের বিকৃতি ঘটাচ্ছেন। আসলে নাসির কিছু মুসলমান মেয়েকে নাচ শেখাবার জন্য হিন্দু ওস্তাদ নিযুক্ত করেছিলেন।

বিভিন্ন মন্দির ধ্বংসের পিছনে ধনরত্ন লুণ্ঠনের প্রবণতাই কার্যকর ছিল, এগুলি ইসলামধর্ম প্রচারের কোন পরিকল্পনা অনুযায়ী করা নিশ্চয়ই হয় নি। মুসলমান শাসকেরা নিশ্চয়ই এটুকু বোঝার মত যথেষ্ট বুদ্ধিমান ছিলেন যে মন্দির ভেঙে হিন্দুদের ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করা যাবে না। এটা আমাদের বুদ্ধির অগম্য যে সুলতান মাহমুদের সোমনাথ লুণ্ঠনের পর আবার সেখানে ধনরত্ন মজুত করা হয়েছিল কেন, যার জন্য গুজরাতের মুজফ্‌ফর শাহ দ্বিতীয় বার সোমনাথ লুণ্ঠন করেছিলেন। এই সকল মন্দিরের প্রতি, সেখানকার পুরোহিত শ্রেণীর প্রতি, সেখানে সংগৃহীত ধনরত্নের প্রতি সাধারণ মানুষের মনোভাব কি ছিল তা সুস্পষ্টভাবে জানা যায় না। বিভিন্ন ভাষায় আঞ্চলিক ও লৌকিক সাহিত্য অনুসন্ধান করলে সঠিক চিত্রটি হয়ত পাওয়া সম্ভব হবে। বাংলা ভাষায় রামাই পণ্ডিত রচিত শূন্য পুরাণে যাজপুর শহরে মুসলমানগণ কর্তৃক মন্দিরাদি ধ্বংস করার বর্ণনা আছে, এবং তার মধ্যে সবচেয়ে বা

চিত্তাকর্ষক তা হচ্ছে এই যে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা এতে দুঃখিত হবার বদলে আনন্দিতই হয়েছিল। সদ্ধর্মী বা বৌদ্ধদের উপর এবং নিম্নজাতির লোকদের উপর ব্রাহ্মণদের প্রচণ্ড অত্যাচারের কথা এই গ্রন্থে বলা হয়েছে। একথা বলা হয়েছে যে এই অত্যাচার চরমে উঠলে স্বয়ং ধর্ম খোদা হিসাবে তার প্রতিকার করেন। ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরাদি অসংখ্য দেবতা বিভিন্ন মুসলিম চরিত্র গ্রহণ করে ব্রাহ্মণদের শক্তি-কেন্দ্রস্বরূপ এই মন্দিরগুলি ধ্বংস করেন। প্রয়োজনীয় অংশগুলি আমরা উদ্ধৃত করছি।

জাজপুর পুরবাদি সোলসঅ ঘর বেদি
বেদি লয় কন্নয় যুন
দখিন্না মাগিতে যাঅ জার ঘরে নাহি পাঅ
সাঁপ দিয়ে পুড়এ ভুবন।১
মালদহে লাগে কর না চিনে আপন পর
জালের নাঞিক দিসপাস
বলিষ্ঠ হইল বড় দস বিস হইয়া জড়
সদ্ধর্মিরে করএ বিনাস।৩
ধর্ম হৈল্যা জবনরূপি মাথা এত কাল টুপি
হাতে সোভে ত্রিরূচ কামান
চাপিয়া উত্তম হয় ত্রিভুবনে লাগে ভয়
খোদার বলিয়া এক নাম।৬
নিরঞ্জন নিরাকার হৈলা ভেস্ত অবতার
মুখেত বলেত দম্বাদার
জতেক দেবতাগণ সভে হয়্যা একমন
আনন্দেতে পরিল ইজার।৭
ব্রহ্ম হইল মহাঁমদ বিষ্ণু হইলা পেকাম্বর
আদম্ফ হৈল শূলপাণি
গণেশ হইআ গাজী কাত্তিক হইল কাজী
ফকির হইল্যা জত মুনি।৮
আপুনি চণ্ডিকা দেবি তিহুঁ হৈল্যা হায়াবিবি
পদ্মাবতী হল্য বিবি নূর
জতেক দেবতাগণ সভে হয়্যা একমন

প্রবেশ করিল জাজপুর ।১০
দেউল দেহারা ভাঙ্গে   কাড়্যা ফিড়্যা খায় রঙ্গে
পাখড় পাখড় বোলে বোল
ধরিয়া ধর্মের পায়   রামাঞি পণ্ডিত গায়
ই বড় বিসম গণ্ডোগোল ।১১

দ্বাদশ থেকে ষোড়শ শতকের মধ্যে ভারতবর্ষে হিন্দু শক্তি মোটেই গৌণ ছিল না। হিমালয় থেকে নর্মদা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে অসংখ্য হিন্দু স্থানীয় রাজা ছিলেন যাঁরা তাঁদের উপরন্তু সুলতানদের কর দিয়ে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতেন। পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে রাজনৈতিক ইতিহাস আলোচনার কালে আমরা দেখেছি যে হিন্দু শক্তিগুলি নিজেদের স্বার্থের খাতিরে এবং প্রতিপক্ষকে জব্দ করার জন্য পার্শ্ববর্তী মুসলিম সুলতানদের হস্তক্ষেপ স্বেচ্ছায় ডেকে এনেছিল। হিন্দু বৃহৎ শক্তিগুলির সংখ্যাও বড় কম ছিল না। এক্ষেত্রে রাজপুত রাজ্যগুলির কথা সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য, বিশেষ করে মেবারের ভূমিকা। দক্ষিণের রাজনৈতিক শক্তিগুলি ছিল অধিকাংশই হিন্দু, যেগুলির মধ্যে বিজয়নগর ছিল সর্ববৃহৎ। গোটা দিল্লী সুলতানীর যুগে বিজয়নগর শুধু স্বাধীন ও শক্তিমান অস্তিত্বই বজায় রাখেনি, দিল্লী সুলতানীর অবসানের পরেও তা বর্তমান ছিল। উড়িষ্যা ছিল আরও একটি শক্তিমান হিন্দু রাষ্ট্র, গোটা দিল্লী সুলতানী আমলে যাকে পদানত করা যায় নি। কিন্তু যেটা আমাদের লক্ষ্য করার বিষয় তা হচ্ছে এই যে, এই হিন্দু শক্তিগুলি প্রবলভাবে নিজেদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ করেছে, এবং সেই উদ্দেশ্যে পার্শ্ববর্তী মুসলিম সুলতানদেরও সাহায্য নিতে কুণ্ঠিত হয় নি। এখানে একটা প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই উদিত হয়, যা হচ্ছে ইসলামী শাসন সত্যই যদি হিন্দুদের নিকট অসহনীয় হয়েছিল, তাহলে হিন্দু শক্তিগুলি একত্র হয়ে মুসলমানদের উচ্ছেদ করার কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন নি কেন ?

এর উত্তরে একথা বলা যায় যে হিন্দুত্ব বলতে আজকে আমরা যা বুঝি, সেই রকম কোন কিছুর অস্তিত্ব সে যুগে ছিল না। এখানে বিভিন্ন ধরনের নানা মাপের অসংখ্য ধর্মমত বজায় ছিল, যদিও শাসকশ্রেণীর দ্বারা ব্রাহ্মণ্য জীবনচর্যাই পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত হত। কিন্তু জাতিবর্ণ ভিত্তিক ব্রাহ্মণ্য আদর্শের সমর্থকরা ছিল সংখ্যালঘু, বৃহত্তর জনজীবনের সঙ্গে যাদের বিশেষ কোন যোগ ছিল না। ইসলামের অগ্রগতি লোকের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল যে ব্রাহ্মণ্য জীবনাদর্শের ভিত্তি কত ভঙ্গুর। দিল্লী-সুলতানী আমলে অসংখ্য ধর্মসংস্কার আন্দোলন সারা ভারত জুড়ে কেন গড়ে উঠেছিল তার উত্তর এখানেই পাওয়া যাবে।

কিন্তু আরও একটা কথা আছে। ব্রাহ্মণ্যবাদ ঘরে এবং বাইরে উভয় দিক থেকে আক্রান্ত হয়েও আজও পর্যন্ত টিঁকে রইল কেন? তার কারণ অতীতে জাতি-বর্ণভিত্তিক ব্রাহ্মণ্য ব্যবস্থা বরাবর রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিল। মুসলমান শাসকদের আমলে গোড়ার দিকে এই ব্যবস্থা বেশ জোরালোভাবে ধাক্কা খেলেও, কিছুকালের মধ্যেই মুসলমান শাসকদের পক্ষেও এটা বুঝতে অসুবিধা হয় নি যে এদেশে প্রচলিত জাতিবর্ণভিত্তিক সমাজব্যবস্থা তাদের শাসনের পক্ষে খুবই অনুকূল, কেননা শাসিতেরা যদি নিজেরাই বিভক্ত থাকে শাসকের পক্ষে এর চেয়ে সুখকর আর কিছু হতে পারে না। বরং হিন্দু সমাজের সম্ভ্রান্ত অংশকে সমর্থক হিসাবে পেলে লাভ ষোল আনা। এরই পরিণামে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা শাসকশ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতা পেতে শুরু করেছিল। শুধু তাই নয় এদেশের মুসলমান অধিবাসীদের মধ্যেই এক শ্রেণীর জাতিপ্রথা গড়ে তুলতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছিল। এই পদ্ধতি ইংরাজ শাসকেরাও পরবর্তী কালে গ্রহণ করেছিল, যাদের ব্যবস্থায় এদেশের উচ্চবর্ণের মানুষদের প্রচুর সুযোগ সুবিধা দিয়ে তাদের মধ্যে ইংরাজদের সমর্থক একটি শক্তিমান শ্রেণীর সৃষ্টি করা হয়েছিল। কোন সাহেব পণ্ডিতই জাতিধর্মপ্রথাকে হিন্দুদের পক্ষে ক্ষতিকারক বলে উল্লেখ করেন নি, এক গোঁড়া মিশনারীরা ছাড়া, বরং প্রত্যেকে ইনিয়ে বিনিয়ে এই প্রথাকে যুক্তিসিদ্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন।

৩॥ শাসনব্যবস্থা

শাসনব্যবস্থার শীর্ষে ছিলেন সুলতান যাঁর কাজ ছিল ইজমা বা ধর্মের রক্ষণ, প্রজাদের মধ্যে বিবাদের মীমাংসা, রাজ্যের সীমান্তরক্ষা, ফৌজদারী দণ্ডবিধি কার্যকর করা প্রতিকূল শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, কর ও রাজস্ব আদায় করা, কর্মচারী নিযুক্ত করা এবং জনজীবনের বিষয়গুলির উপর নজর রাখা। তিনি নিয়মিত দরবারে বসতেন ও প্রধানদের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করতেন। রাজপ্রাসাদের কর্ম-চারীর সংখ্যা ছিল প্রচুর, যাদের উপর বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব দেওয়া থাকত। এই সকল কর্মচারীদের যিনি কর্তা ছিলেন তাঁকে বলা হত ওয়াকিল-ই-দর। প্রায় তুল্য-মূল্য ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন আমীর-ই-হাজিব বা বারবক যাঁর কাজ ছিল দরবারের রক্ষণা-বেক্ষণ। রাজপ্রাসাদের যাবতীয় কাজের জন্য এমন কি খাদ্য-বস্ত্র থেকে শুরু করে রাজপ্রাসাদের অধিবাসীদের প্রয়োজনীয় সকল বস্তু সংগ্রহ বা উৎপাদনের জন্য একটি বিরাট কর্মীবাহিনী ছিল যাদের বলা হত কারখানাহ।

সাধারণ শাসন ব্যবস্থার শীর্ষে ছিলেন ওয়াজির বা প্রধানমন্ত্রী যাঁর দপ্তরের নাম

ছিল দিওয়ান-ই-উইজারৎ। তাঁকে সাহায্য করতেন নায়েব ওয়াজির। অর্থনৈতিক ব্যাপারগুলির দায়িত্ব ছিল মুসরিফ-ই-মুমালিকের উপর। মুস্তৌফি-উ-মুমালিক ছিলেন হিসাব পরীক্ষক। এঁদের অধীনস্থ কর্মচারীরা মুসরিফ ও মুস্তৌফি নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁদের সহায়করা নাজিব এবং ওয়াকাফ নামে পরিচিত ছিলেন। অপরাপর দপ্তরগুলির মধ্যে ছিল দিওয়ান-ই-রিসালত, ধর্ম ও নীতি সংক্রান্ত বিষয়সমূহের এবং জনকল্যাণমূলক বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব যার উপর ছিল। এই দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন কাজী-ই-মুমালিক অথবা সদর-উস-সুদুর। দিওয়ান-ই-আর্জ ছিল সামরিক দপ্তর, যার অধিকর্তার উপাধি ছিল আরিজ-ই-মুমালিক। যোগাযোগ দপ্তরের নাম ছিল দিওয়ান-ই-ইনসা যার অধিকারিক ছিলেন দবীর-ই-খাস। সংবাদ বিভাগের মন্ত্রী বারিদ-ই-মুমালিক উপাধিতে পরিচিত ছিলেন। এই সকল পদাধিকারীদের নিয়ে গঠিত হত মন্ত্রিসভা। তবে এঁদের সকল সিদ্ধান্তই সুলতানের মর্জির উপর নির্ভরশীল ছিল। সুলতানের নিজস্ব কর্মচারী, আধুনিক ভাষায় যাকে বলা যায় প্রাইভেট সেক্রেটারী, ছিলেন নাইব-উল-মুল্ক।

রাজস্বের উৎস ছিল মূলত কৃষিজ ও শিল্পগত উৎপাদনের উপর কর, এবং বাণিজ্যিক লেনদেন থেকে প্রাপ্ত শুল্ক। কৃষিগত রাজস্ব ফসলের ভাগে নির্ধারিত হত। নিরাপত্তা রক্ষার জন্য জিজিয়া কর ধার্য করা হত। যেহেতু মুসলমানেরা সমরবিভাগে যোগদান করতে বাধ্য থাকবে এমন ধারণা নীতিগতভাবে গ্রহণ করা হয়েছিল, সেইহেতু মুসলমানদের নিকট থেকে জিজিয়া নেওয়া হত না। যে সকল হিন্দু সমরবিভাগে যোগদান করত, ওই একই যুক্তিতে তাদের উপরেও জিজিয়া ধার্য করা হত না। মহিলা, শারীরিকভাবে অক্ষম, বৃদ্ধ, বিকলাঙ্গ, অতি-দরিদ্র, সাধু ও পুরোহিতদের কাছ থেকে জিজিয়া আদায় করা হত না। কৃষকরাও এই করপ্রদান থেকে মুক্ত ছিল। মুসলমানদের জাকাৎ নামক একটি কর দিতে হত। এছাড়া যুদ্ধে জিত সম্পদ ও লুণ্ঠিত ধনরত্ন সরকারী কোষাগারে জমা পড়ত। সামরিক ক্ষেত্রে পদাতিক, অশ্বারোহী প্রভৃতি ভাগ ছিল বিভিন্ন সেনাপতির অধীনে। সৈন্যবাহিনীতে এক জাতিগোষ্ঠীর প্রাধান্য যাতে না হতে পারে সেদিকে বিশেষ নজর রাখা হত। তুর্কী, আফগানী, পারসিক, মঙ্গোল ও ভারতীয় এই পাঁচগোষ্ঠীর লোক নিয়ে সৈন্যবাহিনী গঠিত হত। সৈন্যবাহিনীতে হিন্দুর সংখ্যা ছিল প্রচুর, এবং এই ঐতিহ্যের সৃষ্টি খোদ গজনীর সুলতান মাহমুদের সময় থেকে হয়েছিল।

প্রাদেশিক শাসকেরা সুলতান কর্তৃক নিযুক্ত হতেন। প্রদেশগুলি বিভিন্ন শিকে বিভক্ত ছিল, এবং সেগুলির অধিকর্তাদের বলা হত শিকদার। শিকের ক্ষুদ্রতর

বিভাগগুলির নাম পরগণা। এগুলি যাঁরা শাসন করতেন তাঁদের বলা হত আমিল। অপরাপর কর্মচারীদের মধ্যে ছিলেন মুসরিফ, যিনি রাজস্বের পরিমাণ ও শর্তাবলী নির্ধারণ করতেন, মুনসিফ বা বিচারক, কারকুন বা লেখক, কানুনগো বা নথিপত্রের রক্ষক, চৌধুরী বা গ্রাম তত্ত্বাবধায়ক প্রভৃতি।

দশম অধ্যায়

মুঘল শক্তির আবির্ভাবের কাল

১ ॥ বাবুর (১৫২৬-৩০)

পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করে জহিরুদ্দীন মুহম্মদ বাবুর দিল্লী অধিকার করেছিলেন। বাবুর ১৪৮৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতা তুর্কীস্তানের অন্তর্গত ফরগণা নামক স্থানের শাসক ওমর শেখ মীর্জার মৃত্যুর পর মাত্র এগারো বছর বয়সে তিনি তাঁর উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। তাঁর জ্ঞাতিদের, অর্থাৎ মীর্জা গোষ্ঠীর সর্দারদের চক্রান্তে তিনি ফরগণা থেকে বিতাড়িত হন। ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে অনুগত সর্দারদের সাহায্যে তিনি তাঁদের পিতৃপুরুষদের আবাস সমরকন্দ অধিকার করেছিলেন, কিন্তু সে অধিকারও তাঁর হাতছাড়া হয়ে যায়, যখন তিনি ১৫০১ খ্রীষ্টাব্দে উজবেগ সর্দার সাহিবানি খানের নিকট পরাজিত হন। ফরগণা ও সমরকন্দ পুনরধিকার করতে ব্যর্থ হয়ে তিনি কাবুলে আসেন। ১৫০৪ খ্রীষ্টাব্দে বাবুর কাবুলের বেআইনী দখলদার আর্দুনকে পরাজিত করে কাবুল দখল করেন।

১৫০৫ খ্রীষ্টাব্দে বাবুর খাইবার গিরিপথ অতিক্রম করে কোহাটে উপস্থিত হন, সেখান থেকে বাঙ্গাস ও তারপর সিন্ধুর তীরবর্তী তরবিলা। এই সকল এলাকায় বিভিন্ন আফগান গোষ্ঠীর সঙ্গে তিনি ছোটখাট যুদ্ধে লিপ্ত হন ও ব্যাপক লুণ্ঠনকার্য চালান। ওদিকে উজবেক সর্দার সাহিবানি খান খিবা ও হিরাট দখল করে কান্দাহারে উপস্থিত হয়ে বাবুরকে বিপন্ন করে তোলেন, কিন্তু নিজ এলাকায় বিদ্রোহের সংবাদে তিনি প্রত্যাবর্তন করায় বাবুর হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে সাহিবানি খান ইরানের সম্রাট শাহ-ইসমাইলের নিকট পরাজিত ও নিহত হলে বাবুর ইরানের শাহের সাহায্যে মধ্য এশিয়ায় নিজের লুপ্ত অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হন।

অতঃপর তিনি কাবুলে ফিরে এসে পূর্বদিকের অর্থাৎ ভারতবর্ষের কিছু অঞ্চল অধিকার করতে মনস্থ করেন। ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে ঝিলম নদী পর্যন্ত অগ্রসর হন এবং ভেরার দুর্গ জয় করেন। এখান থেকে তিনি দিল্লীর সুলতান ইব্রাহিম লোদীকে

পত্রমারফৎ জানান যে পাঞ্জাবের শাসনভার তাঁর উপর ন্যস্ত হওয়া উচিত, কেননা ওই অঞ্চলটি তাঁর পূর্বপুরুষ তৈমুর কর্তৃক অধিকৃত হয়েছিল। পাঞ্জাবের শাসক দৌলত খান লাহোরে এই চিঠিটি আটক করেছিলেন। ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দে বাবুর পুনরায় বাজৌর নামক স্থানটির মধ্য দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন এবং তাঁর পূর্বাধিকৃত ভেরা দুর্গে উপস্থিত হন। সেখান থেকে ঝিলম অতিক্রম করে তিনি শিয়ালকোট দখল করেন এবং সেখান থেকে সৈয়দপুরে উপস্থিত হন। এখানে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে তিনি শহরটিকে ধ্বংস করেন, প্রতিটি পুরুষকে হত্যা করেন এবং স্ত্রীলোক ও শিশুদের বন্দী হিসাবে নিয়ে যান। কিন্তু তাঁর এই অভিযান অসমাপ্ত থাকে, কেননা কাবুলে আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের ফলে তাঁর সিংহাসন বিপন্ন হয়ে গিয়েছিল।

পর পর দু'বার ব্যর্থ চেষ্টার পর ১৫২২ খ্রীষ্টাব্দে বাবুর কান্দাহার অধিকার করেন এবং নিজ পুত্র মীর্জা কামরানকে সেখানকার শাসক নিযুক্ত করেন। এদিকে দিল্লীর সুলতান ইব্রাহিম লোদীকে অপসারণের জন্য একটি চক্রান্ত হচ্ছিল। এই চক্রান্তের দু'জন প্রধান শরিকের মধ্যে একজন ইব্রাহিম লোদীর খুল্লতাত আলম খান, যিনি গুজরাতের সুলতান মুজ্‌ফ্‌ফর শাহের নিকট রাজনৈতিক আশ্রয় পেয়েছিলেন, কাবুলে গিয়ে বাবুরকে হিন্দুস্তান আক্রমণের জন্য অনুরোধ করেন। পাঞ্জাবের শাসক দৌলত খান লোদীও দূত মারফৎ তাঁকে অনুরোধ জানান। ফলে ১৫২৪ খ্রীষ্টাব্দে বাবুর সিন্ধু, ঝিলম ও চেনাব নদী অতিক্রম করে দিল্লী-সুলতানী বাহিনীকে পরাজিত করে লাহোর অধিকার করেন। অতঃপর তিনি দীপালপুর লুণ্ঠন করেন।

দৌলত খান লোদী বাবুরের কাছ থেকে পাঞ্জাবের অধিকার চেয়েছিলেন, কিন্তু বাবুর তাঁকে বিশেষ পাত্তা দেননি। আলম খানকে তিনি অবশ্য দীপালপুরের শাসনভার দিয়েছিলেন। বাবুর কাবুলে ফিরে গেলে, ক্ষুব্ধ দৌলত খান দীপালপুর দখল করে আলম খানকে বিতাড়িত করেন। আলম খান কাবুলে গিয়ে বাবুরের কাছ থেকে একটি সৈন্যবাহিনী নিয়ে ফিরে আসেন দৌলত খানকে বিতাড়িত করার অভিপ্রায়ে, কিন্তু দৌলত খান তাঁকে বোঝান যে ইব্রাহিম লোদীর খুল্লতাত হিসাবে দিল্লীর সিংহাসন তাঁরই পাওনা হওয়া উচিত, এবং উভয়ে যুক্তভাবে দিল্লী আক্রমণ করেন, কিন্তু ইব্রাহিম লোদীর হস্তে তাঁরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন।

বাবুর ঘটনাচক্রের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছিলেন। অনুকূল পরিস্থিতি বুঝে তিনি ১৫২৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই নভেম্বর ব্যাপক তোড়জোড় করে দিল্লী অভিযান করেন। দৌলত খান পরাজিত ও বন্দী হন। আলম খান লোদী ইতিমধ্যে বাবুরের পক্ষে চলে

এসেছিলেন, এবং দিল্লীর শাসক লোদী বংশীয় হিসাবে রাজনৈতিক প্রয়োজনে ব্যবহারের নিমিত্ত বাবুর তাঁকে হাতে রেখেছিলেন। সিরহিন্দ এবং আম্বালার মধ্য দিয়ে বাবুর যখন দিল্লীর দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন দিল্লীর সুলতান ইব্রাহিম লোদী তাঁকে বাধা দেবার জন্য কয়েকটি বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন। হামিদ খানের নেতৃত্বাধীন প্রথম বাহিনী হুমায়ুন কর্তৃক পরাজিত হয়েছিল, দাযুদ খান ও হাতিম খানের নেতৃত্বাধীন দ্বিতীয় বাহিনীটিরও ভাগ্য বিপর্যয় ঘটেছিল। রূপড় নামক স্থান থেকে শতদ্রু অতিক্রম করে বাবুর প্রথমে আম্বালায় আসেন এবং সেখান থেকে যমুনার তীর ধরে পাণিপথে। এখানে ইব্রাহিম লোদীর মূল বাহিনীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। পাণিপথের ঐতিহাসিক যুদ্ধ ঘটে ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিল তারিখে। প্রচণ্ড বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেও ইব্রাহিম লোদী পরাজিত ও নিহত হন। ২৭ এপ্রিল তারিখে বাবুর হিন্দুস্তানের বাদশাহ হিসাবে নিজেকে ঘোষণা করেন।

এখানকার স্থানীয় আফগান শক্তিগুলি যখন উপলব্ধি করল যে বাবুর এখানে পাকাপাকিভাবেই অবস্থান করবেন, তখন কোন কোন আফগান শাসক ভবিতব্যকে মেনে নিয়ে বাবুরের বশ্যতা স্বীকার করলেন, কিন্তু অধিকাংশই তাঁর বিরুদ্ধে গেলেন। বিরোধী আফগান শক্তিগুলির হাত থেকে হুমায়ুন জৌনপুর, গাজিপুর এবং কাল্পি, ও পরে বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারা গোয়ালিয়র অধিকার করেছিলেন। কিন্তু বাবুরের প্রধান প্রতিপক্ষ ছিলেন মেবারের সংগ্রাম সিংহ, যিনি তখন 'জাতীয় নেতার' পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিলেন। স্থানীয় আফগান শক্তিগুলিও তাঁকে আশ্রয় করেছিল। সংগ্রাম সিংহ ও মেওয়াটের হাসান খান যুক্তভাবে মুঘল অধিকৃত বয়ান দখল করেন। ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারী বাবুর এই বাহিনীর বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন কিন্তু রাজপুতদের হাতে এই বাহিনী পরাজিত হয়। ওদিকে রাজপুতদের সহযোগী আফগানেরা রাপ্রি ও চন্দাবার দখল করে। সম্ভল ও কনৌজ থেকে মুঘলবাহিনী পলায়ন করে, গোয়ালিয়রেরও পতন ঘটে। এই সংকটময় অবস্থায় বাবুর স্বয়ং বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে আগ্রার ৩৭ মাইল পশ্চিমে খানুয়া নামক স্থানে ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ তারিখে সংগ্রাম সিংহের মুখোমুখি হন। এই যুদ্ধে বাবুর জয়লাভ করার পরই এটা নির্ধারিত হয়ে যায় যে অতঃপর বাবুরের ক্ষমতার কেন্দ্র কাবুলের পরিবর্তে পাকাপাকিভাবে আগ্রাতেই স্থাপিত হবে।

এরপর বাবুর মেওয়াট আক্রমণ করেন এবং মেওয়াটের রাজধানী আলোয়ার অধিকার করেন (৭ এপ্রিল, ১৫২৭)। ভারতের বহিরাঞ্চলের অধিকার রক্ষার্থে

তিনি হুমায়ুনকে বাদকশানের শাসকের পদ দিয়ে প্রেরণ করেন। ১৫২৮ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে তিনি মেদিনী রায়কে পরাজিত করে চান্দেরী দখল করেন। ওই বছরের ফেব্রুয়ারী মাসে স্থানীয় আফগানরা বিবনের নেতৃত্বে অযোধ্যা এবং লখনৌ থেকে মুঘলদের বিতাড়িত করে, কিন্তু বাবুর শেষপর্যন্ত তাদের পরাজিত করলে বিবন বাংলাদেশে পালিয়ে আসেন। ১৫২৯ খ্রীষ্টাব্দে স্থানীয় আফগান শক্তিগুলি ইব্রাহিম লোদীর ভাই মাহমুদ লোদীর নেতৃত্বে চুনারের নিকট একটি যুদ্ধে বাবুরের কাছে পরাজিত হয়। ফলে কতিপয় আফগান নেতা বাবুরের অধীনতা স্বীকার করেন, শের খান পলায়ন করেন, ও মাহমুদ লোদী বাংলায় আশ্রয় নেন। আফগান বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য বাবুর আরও পূর্বদিকে অগ্রসর হন এবং গঙ্গা ও ঘর্ঘরার সঙ্গমস্থলে আফগানদের একটি সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করেন ১৫২৯ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই মে তারিখে। এইটিই বাবুরের শেষ বৃহৎ যুদ্ধ। বিহারের বালক শাসক জালাল খান বাবুরের অধীনতা স্বীকার করে নেন। বাংলার নুসরৎ শাহ বাবুরের সঙ্গে একটি সন্ধি করে বিহারের উপর তাঁর কর্তৃত্ব মেনে নেন।

২॥ হুমায়ুন (১৫৩০-৫৬)

১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে বাবুর মারা গেলে তাঁর উত্তরাধিকারী হন তাঁর পুত্র হুমায়ুন। এই উত্তরাধিকার কিন্তু নিষ্কণ্টক ছিল না। বাবুরের অপর তিন পুত্র—কামরান, আস্‌করী ও হিন্দাল—এছাড়া মীর্জাগোষ্ঠীর আরও অনেকে, সিংহাসনের দাবিদার হয়েছিল। নবগঠিত মুঘল রাজ্যের শত্রুও কম ছিল না, বিশেষ করে গুজরাতের সুলতান বাহাদুর শাহ মুঘলদের বিরুদ্ধে প্রস্তুত হচ্ছিলেন, বিহারে আফগানগণ শেরখান শূরের নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হচ্ছিল।

বাবুরের অন্তিম ইচ্ছানুযায়ী হুমায়ুন তাঁর ভাই কামরানকে কাবুল, কান্দাহার ও পশ্চিম পাঞ্জাব ছেড়ে দিয়েছিলেন। আস্‌কারী ও হিন্দালকে তিনি যথাক্রমে সম্ভল ও আলোয়ার অঞ্চলের অধিকার দিয়েছিলেন। ১৫৩১ খ্রীষ্টাব্দে হুমায়ুনকে একটি সংঘবদ্ধ আফগান আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়। এই আক্রমণের নেতা ছিলেন প্রাক্তন দিল্লীর সুলতান ইব্রাহিম লোদীর ভাই মাহমুদ লোদী এবং প্রধান দুজন সেনাপতি ছিলেন বিবন খান জালওয়ানী ও শেখ বায়জিদ কারমালি। এই বাহিনী বিহার থেকে লখনউ পর্যন্ত অগ্রসর হয়। জৌনপুরের মুঘল শাসক জুনাইদ বারলাস পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন। কিন্তু আফগানদের নিজস্ব অনৈক্যের সুযোগ নিয়ে হুমায়ুন দদরাহের

যুদ্ধে তাদের পরাজিত করেন। আফগানদের অপর একজন নেতা শেরখান বারানসীর নিকটবর্তী চুনার দুর্গে আশ্রয় নিয়েছিলেন। চার মাস ওই দুর্গ অবরোধ করে থাকার পর গুজরাতের বাহাদুর শাহের আগ্রা অভিযানের খবর পেয়ে হুমায়ুন শের খানের সঙ্গে সন্ধি করে দ্রুত প্রত্যাবর্তন করেন। হুমায়ুনের সামন্তরাজা হিসাবে শের খান চুনার দুর্গের অধিকারী থেকে যান।

এদিকে হুমায়ুনের অনুপস্থিতির সুযোগে কামরান লাহোর দখল করেছিলেন এবং মুলতান ও হিসার জেলাদ্বয় নিজ রাজ্যভুক্ত করেছিলেন। স্নেহের বশবর্তী হয়ে হুমায়ুন এই অধিকার মেনে নেন। ১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর দুই জ্ঞাতি জমান মীর্জা ও সুলতান মীর্জা বিদ্রোহ করেন। হুমায়ুন তাঁদের পরাজিত করেন এবং সুলতান মীর্জাকে অন্ধ করে বন্দী করে রাখেন। কিন্তু জমান মীর্জা গুজরাতে পালিয়ে বাহাদুর শাহের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এদিকে শের খানের পশ্চিমমুখী অগ্রগমন রোধ করার জন্য হুমায়ুন কাল্পি জেলার কানার নামক স্থানে উপস্থিত হন। কিন্তু সেখানে খবর পান যে শের খানের সঙ্গে গুজরাতের বাহাদুর শাহের এই চুক্তি হয়েছে যে তাঁদের যে কোন একজন হুমায়ুন কর্তৃক আক্রান্ত হলেই অপর জন পিছন থেকে হুমায়ুনকে আক্রমণ করবেন, এবং তদনুযায়ী গুজরাতের বাহাদুর শাহ আগ্রা আক্রমণের তোড়জোড় করেছেন। ফলে বাধ্য হয়েই হুমায়ুনকে আগ্রায় প্রত্যাবর্তন করতে হয়।

গুজরাতের সঙ্গে হুমায়ুনের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। ১৫৩১ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাতের বাহাদুর শাহ মালব জয় করেন, এবং পর বৎসর রাজপুতদের কাছ থেকে রাইসেন, চান্দেরী ও ভিলসা দখল করেন, রণথম্ভোর অধিকার করেন, এবং চিতোর অবরোধ করেন। রাজপুতেরা মুঘলদের সাহায্যপ্রার্থী হয়। এছাড়া বাহাদুর শাহ বিদ্রোহী আফগানদের ও বিক্ষুব্ধ মুঘলদের আশ্রয় দিয়েছিলেন। ১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে হুমায়ুন সসৈন্যে গোয়ালিয়রে উপস্থিত হন এবং সেখানে দু'মাস অপেক্ষা করেন এই আশায় যে তাঁর ভয়ে ভীত হয়ে বাহাদুর শাহ চিতোর অবরোধ প্রত্যাহার করে নেবেন। কিন্তু বাহাদুর শাহ সোজাসুজি চিতোর দখল করলেন দেখে তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগে হুমায়ুন মালব আক্রমণ করলেন ও উজ্জয়িনী দখল করলেন। ফলে বাহাদুরকে প্রত্যাবর্তন করতে হল এবং মান্দাসোরে মুঘল বাহিনীর নিকট তিনি শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে মাণ্ডুতে পালিয়ে গেলেন ১৫৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল তারিখে। হুমায়ুন অতঃপর মাণ্ডু অবরোধ করলেন এবং মুঘলদের অতর্কিত নৈশ আক্রমণে বাহাদুর চাম্পানেরে পালিয়ে গেলেন। হুমায়ুন মাণ্ডুতে ব্যাপক

গণহত্যা ও লুণ্ঠন চালালেন। কার্যত গোটা মালবই তাঁর হাতে এসে গিয়েছিল। অতঃপর বাহাদুরকে ধরার জন্য হুমায়ুন চাম্পানেরে হাজির হলেন। বাহাদুর তখন ক্যাম্বেতে পালিয়ে গেলেন এবং সেখান থেকে দিউতে। হুমায়ুন তিন দিন ধরে ক্যাম্বে শহর লুণ্ঠন করলেন। ১৫৩৫ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে হুমায়ুন চাম্পানের দখল করলেন। ফলে সমগ্র গুজরাত তাঁর পদানত হল। দিউ থেকে বাহাদুর শাহ তাঁর অনুগত গুজরাতী আমীরদের সহায়তায় পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী গড়ে আর একবার হুমায়ুনের বিরুদ্ধে অগ্রসর হলেন। নাদিয়াদ এবং মাহমুদাবাদের মাঝামাঝি একটি স্থানে হুমায়ুন পুনরায় জয়লাভ করলেন, এবং বিজয়গর্বে আমেদাবাদ শহরের দখল নিলেন।

হুমায়ুনকে কিছু প্রবীন ব্যক্তি উপদেশ দিয়েছিলেন যে অতঃপর পরাজিত বাহাদুরের সঙ্গে তাঁর একটি বোঝাপড়া করা উচিত, কেননা পূর্বদিকের অর্থাৎ বঙ্গ-বিহারের অবস্থা ভাল নয়। কিন্তু ক্রমাগত সাফল্যে উৎফুল্ল হুমায়ুন, এই যুক্তি অগ্রাহ্য করে নিজের লোকদের গুজরাত ও মালবের শাসনকার্যে বহাল করলেন, এবং তাঁর স্বভাবজাত আলস্যে কাল কাটাতে লাগলেন। ইতিমধ্যে বাহাদুর শাহের অনুকূলে গুজরাতের নানাস্থানে স্থানীয় প্রধানদের নেতৃত্বে বিদ্রোহ দেখা দিল, এবং মুঘল বাহিনী ১৫৩৫ এর ডিসেম্বরের মধ্যেই নবসারি, ব্রোচ, সুরাট, ক্যাম্বে ও পাটন থেকে উৎখাত হয়ে গেল। ইতিমধ্যে বাহাদুর শাহ শক্তি সঞ্চয় করে চাম্পানের পুনরাধিকার করলেন, এবং সেখানকার মুঘল শাসক মাণ্ডুতে হুমায়ুনের কাছে পালিয়ে গেলেন ১৫৩৬ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে। এদিকে আগ্রায় গণ্ডগোলের সংবাদ পেয়ে হুমায়ুন সেখানে প্রত্যাবর্তন করলেন ১৫৩৬-এর আগষ্ট মাসে। গুজরাত ও মালব এভাবে দখল হয়েও শেষ পর্যন্ত বেদখল হয়ে গেল।

১৫৩৩ থেকে ১৫৩৬-এর মধ্যে যখন হুমায়ুন গুজরাত ও মালব নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, বিহারে শের খান নিজের ক্ষমতার ভিত্তি পোক্ত করে নিয়েছিলেন। ১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দে হুমায়ুন বিরাট বাহিনী সহ শের খানের বিরুদ্ধে অগ্রসর হলেন। প্রথমেই তিনি চুনার দুর্গ অবরোধ ও অধিকার করলেন। তখন শের খান বঙ্গদেশ জয়ের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। হুমায়ুন তৎক্ষণাৎ গৌড়ে হাজির হলে বঙ্গদেশের সুলতানও রক্ষা পেতেন এবং শের খানও জব্দ হতেন। কিন্তু তা না করে হুমায়ুন বারানসীতে চলে এলেন। এদিকে ১৫৩৮-এর ৬ই এপ্রিল শের খান গৌড় অধিকার করলেন। বঙ্গদেশ থেকে পলাতক সুলতান মাহমুদ হুমায়ুনকে কালবিলম্ব না করে বঙ্গদেশ দখল করতে

অনুরোধ করলেন। ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট তারিখে হুমায়ুন বঙ্গদেশ অধিকার করলেন, কিন্তু ততদিনে শের খান দক্ষিণ বিহারে সরে এসেছেন। যে ভুল হুমায়ুন মাণ্ডুতে করেছিলেন এখানেও তিনি তাঁর পুনরাবৃত্তি করলেন। গৌড়ে এসে সাফল্যের দম্ভ, আলস্য ও আফিমের নেশা তাঁকে পেয়ে বসল। এদিকে বিচক্ষণ শের খান হুমায়ুনের দিল্লী প্রত্যাগমনের পথগুলি বন্ধ করে দিলেন, এবং বারানসী, জৌনপুর ও চুনার দখল করলেন। কার্যত দিল্লী, আগ্রা ও বঙ্গদেশের মধ্যবর্তী এলাকায় রাতারাতি যেন একটি শক্তিমান রাজ্য গড়ে উঠল এবং হুমায়ুন সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন, এই অবসরে হুমায়ুনের ভাই হিন্দাল আগ্রা দখল করার চেষ্টা করলে তাঁর অপর ভাই কামরান তা হতে দেন নি। একমাত্র কামরানই সোজা পূর্বদিকে একটি অভিযান করে হুমায়ুনকে রক্ষা করতে পারতেন, কারণ তিনি কাবুল, কান্দাহার ও পাঞ্জাবে রীতিমত একটি শক্তিমান রাজ্যের অধিকারী ছিলেন, কিন্তু তিনি তা করেননি।

ফলে হুমায়ুন মরীয়া হয়ে গঙ্গার বাম তীর ধরে আগ্রা অভিমুখে রওনা হলেন। পথে খবর পেলেন যে তাঁর পূর্ববর্তী বাহিনী শের খানের লোকেদের হাতে মুঙ্গেরে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে। অতঃপর তিনি গঙ্গা অতিক্রম করে দক্ষিণ তীর দিয়ে অগ্রসর হলেন এবং শাহাবাদ জেলার চৌসা নামক স্থানে উপস্থিত হলেন। এইখানে তিনি শের খানের বাহিনীর সম্মুখীন হলেন, কিন্তু মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত না হয়ে সেখানে অবস্থান করে শের খানের সঙ্গে সন্ধির জন্য একটি চুক্তি করার সিদ্ধান্ত করলেন। হুমায়ুনের শর্ত ছিল যে শের খান আনুষ্ঠানিক ভাবে আনুগত্য স্বীকার করে নিজ অধিকৃত এলাকা ভোগ করবেন। কিন্তু অতর্কিতে ১৫৩৯-এর ২৬শে জুন তারিখে একটি আক্রমণ চালিয়ে শের খান মুঘল বাহিনীকে নির্মূল করে দেন। হুমায়ুন এবং তাঁর সহযোগী মীর্জা আসকরী একজন ভিস্তির কৃপায় কোনক্রমে প্রাণ রক্ষা করে আগ্রায় প্রত্যাবর্তন করেন।

আগ্রায় ফিরে এসে হুমায়ুন তাঁর দুই ভাই কামরান ও হিন্দালের সাহায্যে শের খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার পরিকল্পনা করেন, কিন্তু তাঁর দুই ভাই এই প্রস্তাবে রাজি হন না। এদিকে শের খান একটি বিরাট বাহিনী নিয়ে গঙ্গার তীর ধরে পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হচ্ছিলেন। ১৫৪০ এর ১৭ই মে তারিখে কনৌজের নিকট বিল্বগ্রাম নামক স্থানে হুমায়ুন পুনরায় শের খান কর্তৃক পরাজিত হলেন। শের খানের আফগান বাহিনী মুঘলদের তাড়া করল। হুমায়ুন আগ্রা থেকে প্রথম গেলেন দিল্লী, এবং

সেখান থেকে লাহোর যেখানে তিনি তাঁর ভাই কামরানকে শের খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উৎসাহিত করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। ইতিমধ্যে শের খান দিল্লী ও আগ্রা দখল করে নিয়েছিলেন। কামরান গোপনে শের খানের সঙ্গে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন। হুমায়ুন শেষ পর্যন্ত শের খানের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন। অতঃপর হুমায়ুন সিন্ধুদেশে পালিয়ে এলেন এবং রোহ্‌রি নামক স্থানে আশ্রয় নিলেন ১৫৪১ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারি তারিখে।

সিন্ধুর সুলতান শাহ হুসেনের কাছ থেকে হুমায়ুন কোন সাহায্যই পাননি। পরন্তু ভক্কর ও সেহওয়ানের দুর্গদ্বয় অধিকার করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। অতঃপর তিনি মারবারের রাজা মালদেব এবং জয়শলমীরের রাজার নিকট আশ্রয় চেয়ে ব্যর্থ হলেন। কিন্তু অমরকোটের রাণা তাঁকে আশ্রয় দিলেন এবং সিন্ধুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন। এই অমরকোটেই ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর তাঁর পত্নী হামিদাবানু আকবরকে প্রসব করেন। এরপর হুমায়ুন সিন্ধু আক্রমণ করেন, কিন্তু তাঁর মন্ত্রণাদাতা বৈরাম বেগের পরামর্শে সিন্ধুর সুলতান শাহ হুসেনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসেন। স্থির হয় যে হুমায়ুন কান্দাহারে যাবেন এবং তাঁর প্রয়োজনীয় ব্যয় শাহ হুসেন বহন করবেন। পরে বৈরামের পরামর্শে তিনি কান্দাহারের পরিবর্তে পারস্যে যেতে মনস্থ করলেন।

১৫৪৪ এর আগষ্ট মাসে পারস্য সম্রাট শাহ তহ্‌মাস্‌পের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। শাহ তাঁকে সাহায্য করার পরিবর্তে দুটি শর্ত তাঁর উপর আরোপ করেন। প্রথমত হুমায়ুনকে শিয়া ধর্ম অবলম্বন করতে হবে, এবং দ্বিতীয়ত আফগানিস্তানে তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য শাহ তাঁকে সৈন্য দেবেন, বিনিময়ে কান্দাহার অঞ্চলটি শাহের হাতে তুলে দিতে হবে। হুমায়ুন বাধ্য হয়েই এই শর্ত মেনে নিলেন। চৌদ্দ হাজার পারসিক সৈন্য নিয়ে তিনি ১৫৪৫-এর ২১ মার্চ কান্দাহার অবরোধ করলেন। এদিকে বৈরাম কাবুলে উপস্থিত হয়ে নানা কূটনৈতিক আলোচনা চালিয়ে তৈমুরবংশীয় বহু স্থানীয় শাসককে হুমায়ুনের পক্ষে নিয়ে এলেন। কান্দাহার হুমায়ুনের হাতে আসার পর পারসিক বাহিনী আর তাঁর হয়ে কাজ করতে রাজি হল না। তখন হুমায়ুন পারস্যের শাহের সঙ্গে তাঁর চুক্তি লঙ্ঘন করে আকস্মিকভাবে তাঁর নূতন সংগৃহীত সৈন্যদের সাহায্যে পারসিক বাহিনীকে হটিয়ে দিলেন। কান্দাহারে হুমায়ুন এতকাল পরে মাটিতে পা রাখার জায়গা পেলেন।

বৈরাম খানকে কান্দাহারের শাসক নিযুক্ত করে হুমায়ুন কাবুল গেলেন। পথে

তাঁর ভাই মীর্জা হিন্দালের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল এবং হিন্দাল এবার হুমায়ুনের পক্ষে যোগ দিলেন। পূর্বেই বৈরামের কূটনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ফলে কাবুলের শাসক কামরানের শিবিরে ভাঙন ধরেছিল। হুমায়ুনের সঙ্গে এঁটে ওঠা সেই মুহূর্তে সম্ভবপর নয় জেনে কামরান সিন্ধুতে পালিয়ে গেলেন। ১৫৪৫এর ১৮ই নভেম্বর তারিখে হুমায়ুন বিনা বাধায় কাবুল দখল করলেন। ১৫৪৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে হুমায়ুন উত্তর আফগানিস্তানের বাদকশানে আক্রমণ চালিয়ে সেখানকার শাসক মীর্জা সুলেমানের কাছ থেকে তিরগিরন অঞ্চলটি দখল করেন। এর পর হুমায়ুন কিসিম নামক স্থানে হাজির হন, সেখান থেকে কিলাজাফরে। কিন্তু এই সময় তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁর শিবিরে ব্যাপক দলত্যাগ শুরু হয়।

এই সুযোগে কামরান তাঁর শ্বশুর সিন্ধুর শাহ হুসেনের সহায়তায় গজনী অধিকার করেন এবং কাবুলে উপস্থিত হয়ে ব্যাপক ধ্বংসকার্য চালান। হুমায়ুন তখন কাবুল অবরোধ করেন এবং জয়লাভ অসম্ভব জেনে কামরান বাল্‌খের উজবেগ সর্দার পীর মুহম্মদ খানের আশ্রয় নেন এবং তাঁর সাহায্যে বাদকশানের বেশ কিছুটা অঞ্চল দখল করেন। ফলে ১৫৪৮এর জুন মাসে হুমায়ুন দ্বিতীয়বার বাদকশানে অভিযান করেন। এক্ষেত্রেও তিনি হিন্দালের সাহায্য পান এবং শেষ পর্যন্ত কামরান তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন। হুমায়ুন তাঁকে মার্জনা করেন এবং অক্সাস নদীর উত্তরে কুলাব নামক একটি স্থানের জায়গীর প্রদান করেন। এটুকু অধিকারে কামরান নিশ্চয়ই খুশি হননি। ১৫৪৯-এর ফেব্রুয়ারীতে হুমায়ুন বাল্‌খের উজবেগদের নেতা পীর মুহম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। সাফল্য যখন প্রায় তাঁর করায়ত্ত, সেই সময় পিছন থেকে আক্রমণ চালিয়ে কামরান কাবুল দখল করে নেন। কাবুলে তড়িঘড়ি ফেরার পথে হুমায়ুনের বহু সৈন্যক্ষয় হয়। শেষ পর্যন্ত ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি হুমায়ুন কাবুল পুনর্দখল করেন।

হুমায়ুন কাবুল দখল করলেও কামরান একটি আফগান বাহিনী সংগ্রহ করে কাবুল থেকে সিন্ধু পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় ব্যাপক সন্ত্রাসের সৃষ্টি করলেন। বিব্রত হুমায়ুন তাঁকে সাহায্য করার জন্য কান্দাহার থেকে বৈরাম খানকে ডেকে পাঠালেন। ১৫৫১-র ২০শে নভেম্বর রাত্রিতে কামরান অকস্মাৎ নঙ্গনহরের অন্তর্গত জিরইয়ার নামক স্থানে হুমায়ুনের শিবির আক্রমণ করলেন। হুমায়ুন জয়লাভ করলেও তাঁর ভাই হিন্দাল এই যুদ্ধে নিহত হলেন। হুমায়ুন কামরানকে তাড়া করলে তিনি পাঞ্জাবে সুলতান ইসলাম শাহের আশ্রয় চান কিন্তু ইসলাম তাঁকে নিরাশ করেন। অতঃপর

তিনি গক্কর উপজাতির সর্দার সুলতান আদমের আশ্রয় লাভ করেন, কিন্তু আদম শেষ পর্যন্ত তাঁকে বন্দী করে হুমায়ুনের নিকট পাঠিয়ে দেন। এরপর হুমায়ুনের নির্দেশে কামরানকে অন্ধ করে মক্কায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে হুমায়ুন সসৈন্যে পেশোয়ারে উপস্থিত হন। তিনি লাহোর, দীপালপুর, জলন্ধর ও সিরহিন্দ বৈরাম খানের সহযোগিতায় অতঃপর দখল করেন। পাঞ্জাবের শাসক সিকন্দর শাহ লুধিয়ানা জেলার অন্তর্গত মাচিওয়াড়াতে পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন (মে, ১৫৫৫)। এরপর সিরহিন্দের যুদ্ধে (২২শে জুন ১৫৫৫) আফগান বাহিনী পুনরায় পরাস্ত হয়। সিকন্দর খান শিবালিক পর্বতাঞ্চলে পালিয়ে যান। এরপর হুমায়ুন দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হন এবং ১৫৫৫-র ২৩শে জুলাই সামানা নামক স্থান থেকে দিল্লীতে প্রবেশ করেন। অনুগতদের মধ্যে তিনি তাঁর অধিকৃত অঞ্চলগুলির শাসনকার্যের ভার বণ্টন করে দেন। ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে জানুয়ারী নিজের পাঠগৃহের সিঁড়ি থেকে পদস্খলনের ফলে তাঁর মৃত্যু হয়।

৩॥ শের শাহ (১৫৪০-৪৫)

ভারতবর্ষে বাবুরের যুদ্ধগুলি তাঁর ব্যক্তিগত সাফল্যের পরিচায়ক হলেও সেগুলি কোন স্থায়ী ফল প্রসব করতে পারেনি। ভারতের, বিশেষ করে উত্তর ভারতের আফগানী শক্তি প্রাথমিক বিপর্যয়ের পর পুনরায় সবল হয়ে উঠেছিল এবং প্রায় পঁচিশ বছর উত্তর ভারতে প্রাধান্য বজায় রাখতে পেরেছিল। এই শক্তি যাঁর হাতে সংহত হয়েছিল তাঁর নাম শের শাহ।

শের শাহের আসল নাম ছিল ফরিদ শূর। জন্ম সম্ভবত ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে, জন্মস্থান অজ্ঞাত। তাঁর পিতা হাসান শূর জৌনপুরের শাসক জমাল খানের দাক্ষিণ্যে সাসারাম এবং খবাসপুরের জায়গীরদার হয়েছিলেন। ফরিদ ১৫০১ খ্রীষ্টাব্দে জৌনপুরে এসে বিদ্যাচর্চা করেন, এবং ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দে সাসারামে ফিরে গিয়ে পিতার জায়গীর দেখাশোনা করেন ১৫২২ পর্যন্ত। পারিবারিক অশান্তির কারণে তিনি সাসারাম ত্যাগ করে আগ্রায় যান এবং দৌলত খান নামক এক আমীরের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। এই সময় তাঁর পিতার মৃত্যু হলে ফরিদ সাসারামের জায়গীর প্রাপ্ত হন, কিন্তু তাঁর বিমাতা ও বৈমাত্রেয় ভাই সুলেমান চৌন্দের শক্তিমান জায়গীরদার মুহম্মদ খানের আশ্রয় নিয়ে তাঁর সাহায্যে তাঁকে সাসারাম থেকে উচ্ছেদের চেষ্টা করেন। তখন ফরিদ দক্ষিণ বিহারের শাসক বহর খান লোহানীর অধীনে কর্ম গ্রহণ করেন।

পাণিপথের প্রথম যুদ্ধের পর বহর খান স্বাধীনতা ঘোষণা করে সুলতান মুহম্মদ নাম নিয়েছিলেন। শিকারে তিনি এককভাবে একটি বাঘ মেরেছিলেন বলে বহর খান তাঁকে শের খান উপাধি দিয়েছিলেন, যে নামে তিনি পরবর্তী জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। শের বহর খানের নাবালক পুত্র জালাল খানের গৃহশিক্ষকও ছিলেন।

এদিকে শেরের বৈমাত্রেয় ভাই সুলেমান তাঁর মুরুব্বি চৌন্দের জায়গীরদার মুহম্মদ খানের নেপথ্য ক্রিয়াকলাপের সাহায্যে তাঁকে সাসারামের জায়গীর থেকে বঞ্চিত করেন। বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হয়ে শের খান তখন বাবুরের অধীনে কর্ম গ্রহণ করেন ও তাঁর পূর্বাঞ্চলীয় অভিযানে সহায়তা করেন (১৫২৭)। এর ফলে তিনি তাঁর সাসারামের জায়গীর পুনরায় ফিরে পান (১৫২৮)। ১৫২৮ খ্রীষ্টাব্দে বহর খান লোহানীর মৃত্যু হলে, তাঁর নাবালক পুত্র জালাল খানের অভিভাবক হিসাবে তাঁর বিধবা স্ত্রী দুদু দক্ষিণ বিহারের শাসনকার্যের দায়িত্ব নেন। কিন্তু ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে দুদু মারা গেলে এই দায়িত্ব শের খানের উপর বর্তায়। প্রশাসনিক দক্ষতার জন্য তিনি অচিরেই শক্তিমান হয়ে ওঠেন। এছাড়া ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে চুনার দুর্গের অধিকারিণী তাজ খানের সন্তানহীনা বিধবা লাদ-মালিকাকে বিবাহ করে তিনি চুনার দুর্গ ও সন্নিহিত অঞ্চলের অধিকারী হন। ওই বছরেই তিনি গাজীপুরের নাসির খান লোহানীর সন্তানহীনা বিধবা গৌহর গোসাঈনকে বিবাহ করে বিপুল ধনসম্পত্তির মালিক হন।

এদিকে প্রাক্তন দিল্লীর সুলতান ইব্রাহিম লোদীর ভাই মাহমুদ লোদীর অনুরোধে শের খান ১৫৩১ খ্রীষ্টাব্দে মুঘল বিরোধী আফগান শক্তিজোটে যোগদান করেন। ওই বছরের সেপ্টেম্বর মাসে দদরাহর যুদ্ধে হুমায়ুনের হাতে আফগান জোট পরাজিত হয়। এই যুদ্ধে শের খান কিন্তু অংশগ্রহণ করেননি, বরং কিছুটা বিশ্বাসঘাতকতা পূর্বক নিজেকে সরিয়ে এনেছিলেন। বিজয়ী হুমায়ুন কিন্তু চাননি যে চুনারের মত গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ একজন আফগানের হাতে থাকুক, ফলে তিনি চুনার দুর্গ অবরোধ করেন, কিন্তু গুজরাতের বাহাদুর শাহের প্রতিকূল ক্রিয়াকলাপের খবর পেয়ে তিনি অবরোধ তুলে নিয়ে আগ্রা ফিরে যান। শের খান অবশ্য তখন হুমায়ুনের নিকট আনুষ্ঠানিক বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন।

এদিকে শের খানের ক্ষমতাবৃদ্ধি লোহানী প্রধানদের সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল এবং তাঁরা শেরের হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্য বঙ্গদেশের সুলতান মাহমুদ শাহের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। বঙ্গদেশের বিদ্রোহী সামন্তরাজা হাজিপুরের শাসক মখডুমের সহায়তায় শের আকস্মিকভাবে বঙ্গদেশ আক্রমণ করে সুরজগড় পর্যন্ত অঞ্চল

অধিকার করে নিয়েছিলেন। দক্ষিণ বিহারে সুলতান জালাল খান শেরের অভি-ভাবকত্বে অসহিষ্ণু হয়ে লোহানী প্রধানগণ সহ বঙ্গদেশে আশ্রয় নেন। বঙ্গদেশের সুলতান মাহমুদ ইব্রাহিম খানের নেতৃত্বে ১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দে শের খানের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন। সুরজগড়ের যুদ্ধে এই বাহিনী পরাজিত হয় এবং শের খান মুঙ্গের থেকে চুনার পর্যন্ত এলাকার অধিকারী হন। ১৫৩৫ খ্রীষ্টাব্দে হুমায়ুন গুজরাতে ব্যস্ত থাকার সুযোগে শের খান বঙ্গদেশের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক অভিযান করে ভাগলপুর দখল করেন। ১৫৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বঙ্গের রাজধানী গৌড় অভিমুখে অভিযান করেন, এবং পোর্তুগীজ গোলন্দাজদের দ্বারা রক্ষিত বঙ্গের সেনাবাহিনীকে পাশ কাটিয়ে গৌড়ে উপস্থিত হন। সুলতান মাহমুদ হতবুদ্ধি হয়ে সন্ধি করেন এবং এতে শের খানের তের লক্ষ সুবর্ণমুদ্রা এবং কিউল থেকে সক্রিগলি পর্যন্ত এলাকা লাভ হয়। ১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পুনরায় বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন ও গৌড় অবরোধ করেন।

শের খানের এই ক্রিয়াকলাপে শঙ্কিত হয়ে হুমায়ুন তাঁকে দমন করতে এগিয়ে আসেন। কিন্তু সোজা বঙ্গদেশে গিয়ে সুলতান মাহমুদকে উদ্ধার না করে তিনি চুনার দুর্গ অবরোধ করে অনর্থক কালহরণ করেন। ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে হুমায়ুন চুনার দুর্গ দখল করেন। এদিকে শের খান ওই একই সময়ে বিশ্বাসঘাতকতা-পূর্বক রোটাসের সুরক্ষিত দুর্গ দখল করে নিয়েছিলেন। এদিকে তাঁর লোকেরা অবরুদ্ধ গৌড় দখল করে ফেলেছিল এবং সুলতান মাহমুদ পলায়ন করে হুমায়ুনের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। হুমায়ুন গৌড়ের পলাতক সুলতানের পক্ষ অবলম্বন করে গৌড়ের দিকে অগ্রসর হলেন। ততদিনে শের খান পরিকল্পনা অনুযায়ী গৌড় ত্যাগ করে গোপনে রোটাসে চলে এসেছিলেন। ১৫৩৮-এর জুন মাসে হুমায়ুন বিনা বাধায় গৌড় দখল করলেন, এবং সেখানে নয় মাস আনন্দে কাল কাটালেন। ইত্যবসরে শের খান বিহার ও উত্তর প্রদেশ থেকে মুঘলদের বিতাড়ন করে হুমায়ুনের প্রত্যাবর্তনের পথ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত হুমায়ুন আগ্রায় প্রত্যাবর্তনের কালে এবং প্রত্যাবর্তনের পর যথাক্রমে চৌসা ও বিল্বগ্রামের যুদ্ধে পরাজিত হলেন। সে কাহিনী পূর্বেই বলা হয়েছে। অতঃপর শের খান তাঁর সেনাপতি ব্রহ্মজিৎ গৌড়কে হুমায়ুনের পশ্চাদ্ধাবনের কাজে লাগিয়ে অধিকৃত কনৌজের শাসনের বন্দোবস্ত করে, আগ্রায় হাজির হলেন। এই স্থানটি পূর্বেই ব্রহ্মজিৎ কর্তৃক বিজিত হয়েছিল। সেনাপতি সুজাত খানকে তিনি গোয়ালিয়র দখল করতে পাঠালেন। এরপর

সেনাপতি নাসির খান তাঁর জন্য দিল্লী দখল করে রেখেছিলেন। দিল্লী থেকে শের খান হুমায়ুনের সন্ধানে গেলেন। ধীরে ধীরে পাঞ্জাবের উপর তিনি প্রভুত্ব বিস্তার করলেন। ঝিলম এবং সিন্ধুর মধ্যবর্তী অঞ্চলের বিদ্রোহী গক্করদের তিনি দমন করলেন এবং সেখানে একটি দুর্গের ভিত্তিস্থাপন করলেন। বিহারের রোটাস দুর্গের নামানুসারে তিনি এটিরও নামকরণ করলেন রোটাস।

১৫৪১-এ গৌড়ের শাসক খিজির খানের বিদ্রোহের মতলব বুঝতে পেরে তিনি দ্রুত গৌড়ে এসে তাঁকে বন্দী করলেন। ১৫৪২-এ মালব তাঁর অধিকারে এল। তাঁর সেনাপতি হায়বৎ খান নিয়াজী পাঞ্জাবের মণ্টোগোমরী জেলার বিদ্রোহী ফথ খান জাঠকে শায়েস্তা করেন, এবং পরে মুলতান দখল করেন। ১৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধুর ভক্কর ও সেহওয়ান দুর্গদ্বয় তাঁর অধিকারে আসে। মালব থেকে আগ্রায় প্রত্যাবর্তনের পথে শের খান রণথম্ভোর দুর্গ জয় করেন। ১৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দেই চান্দেরী ও রাইসিন দুর্গ তাঁর হস্তগত হয়। ওই বছরেই তিনি মারবার আক্রমণ করেন ও যোধপুর অধিকার করেন। ১৫৪৮ খ্রীষ্টাব্দে মেবারের রাজধানী চিতোরের পতন হয়। শের খান তাঁর শেষ যুদ্ধ করেন বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত কালঞ্জরে। এই যুদ্ধ চলাকালীন একটি বারুদের স্তূপে আগুন লাগার ফলে তাঁর আকস্মিক মৃত্যু ঘটে (২২শে মে ১৫৪৫)। কালঞ্জরের দুর্গ অধিকৃত হয়েছে মৃত্যুর পূর্বে এই খবর তিনি জেনে যান।

গুজরাত ও আসাম বাদ দিয়ে সমগ্র উত্তর ভারতই শের খানের অধীনে এসেছিল। রাজা হিসাবে তিনি শের শাহ নাম গ্রহণ করেছিলেন। অল্পস্থায়ী জীবন এবং তারও সবটাই প্রায় যুদ্ধবিগ্রহে অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও শের শাহ একটি পরিকল্পিত শাসন ব্যবস্থা প্রচলন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এটাই ছিল তাঁর দুর্লভ কৃতিত্ব। শের শাহ প্রবর্তিত শাসন ব্যবস্থা গুণগতভাবে পূর্ববর্তী ব্যবস্থার চেয়ে পৃথক ছিল। কেন্দ্রীয় শাসনকার্যে পূর্ববর্তী সুলতানী আমলের বিভিন্ন দপ্তর তিনি বজায় রেখেছিলেন যে দপ্তরগুলি ছিল দিওয়ান-ই-উইজারৎ (অর্থ ও সাধারণ প্রশাসন), দিওয়ান-ই-রিসালত (ধর্মীয় ও জনকল্যাণমূলক ক্রিয়াকলাপের দপ্তর), দিওয়ান-ই-আরজ (সমর দপ্তর), দিওয়ান-ই-ইনসা (যোগাযোগ দপ্তর) প্রভৃতি। প্রতিটি দপ্তরেরই ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ও কর্মচারীরা ছিলেন, পদাধিকারীদের নাম প্রাক্তন সুলতানী আমলে যা ছিল তাই।

প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে শের শাহ আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন। পূর্ববর্তী

সুলতানদের আমলে প্রাদেশিক শাসনকর্তারা সচরাচর সময় নায়ক হতেন। তাঁরা সামরিক শক্তির জোরেই শাসন করতেন এবং সুবিধা হলেই কেন্দ্রের দুর্বলতার সুযোগে বিদ্রোহ করতেন বা স্বাধীনতা ঘোষণা করতেন। শের শাহ প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা অসামরিক ভিত্তির উপর স্থাপন করার চেষ্টা করেছিলেন। প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থার শীর্ষে ছিলেন একজন অসামরিক রাজপ্রতিনিধি বা ভাইসরয় যাঁর উপাধি ছিল আমিন-ই-বাঙ্গলা। প্রত্যেকটি প্রদেশ কয়েকটি সরকারে বিভক্ত ছিল এবং প্রত্যেকটি সরকার কয়েকটি পরগণায়। প্রত্যেকটি সরকার ছিল একজন প্রধান শিকদার (শিকদার-ই-শিকদারন), একজন প্রধান মুন্সিফ (মুন্সিফ-ই-মুন্সিফান) ও একজন প্রধান কাজীর দ্বারা পরিচালিত। প্রধান শিকদারের কাজ ছিল মুখ্যত আইন ও শৃংখলা রক্ষা করা এবং তিনি একটি সামরিক বাহিনীর সাহায্য পেতেন। প্রধান মুন্সিফের কাজ ছিল দেওয়ানী মামলাসমূহের বিচার ও রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যাপারে পরগণা আমিনদের কাজের তদারকি। প্রতিটি পরগণায় একজন শিকদার, একজন আমিন, একজন ফোতদার ও দু'জন কারকুন থাকতেন। শিকদারের কাজ ছিল আইনশৃংখলা রক্ষা, আমিনের কাজ ছিল জমি জরিপ করা ও রাজস্ব নির্ধারণ, ফোতদার ছিলেন কোষাধ্যক্ষ, কারকুনরা করতেন করণিকের কাজ। পাছে কোন কায়েমী স্বার্থ গড়ে ওঠে এই আশংকায় শের শাহ প্রতিটি কর্মচারীকে মাঝে মাঝে বদলি করতে হবে এমন নির্দেশ দিয়েছিলেন।

শের শাহের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কীর্তি ভূমি ব্যবস্থার সংস্কার ও মুদ্রা এবং শুল্ক ব্যবস্থার সংস্কার। নিজে জায়গীরদার হবার জন্য শের শাহ কৃষকদের মূল অসুবিধাগুলি বুঝতেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল একটি সুসম ভূমিরাজস্বনীতি প্রণয়ন। এই উদ্দেশ্যে তিনি কৃষকদের জমির পরিমাণ ও স্বত্ব নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন যাতে তাদের বেআইনীভাবে উৎখাত না করা যায় এবং যাতে নিয়মিত রাজস্ব আদায় সম্ভব হয়। কৃষকের কাছ থেকে একটি কবুলিয়ত সরকার গ্রহণ করতেন যাতে তার স্বত্ব, অধিকার ও প্রদেয় রাজস্বের বিষয় লিখিত থাকত, এবং সরকারের তরফ থেকে কৃষককে একটি পাট্টা দেওয়া হত যেটা ছিল তার অধিকার সমূহের গ্যারান্টি। উৎপন্ন ফসলের এক চতুর্থাংশ তিনি সচরাচর রাজস্ব হিসাবে গ্রহণ করতেন। এছাড়া জিজিয়া, জাকাৎ প্রভৃতি প্রচলিত করগুলিও তাঁর রাজস্বের উৎস ছিল। তখনকার দিনে বহু ধরনের ও বিভিন্ন মাপ ও ওজনের মুদ্রা প্রচলিত ছিল। শের শাহ এইগুলির মধ্যে সমতা আনয়ন করেন। সর্বনিম্ন মুদ্রা ছিল দাম বা তামার পয়সা এবং রৌপ্যমুদ্রার সঙ্গে

তার অনুপাত ছিল ৬৪ : ১। মধ্যের স্তরগুলি ছিল আনি, দু'আনি, সিকি ও আধুলি এবং এই ধরণটি প্রায় সেদিন পর্যন্ত বহাল ছিল। বিভিন্ন মুদ্রায় কতটা পরিমাণ ধাতু ব্যবহৃত হবে তা তিনি নির্দিষ্ট করেছিলেন। ওজন ও মাপের ক্ষেত্রে যাতে সমতা থাকে সেই রকম নির্দেশ দিয়েছিলেন।

মুদ্রাব্যবস্থা সংস্কারের ফলে বাণিজ্যের উন্নতি হয়, এবং বণিকদের অযথা হয়রানির হাত থেকে রেহাই দেবার জন্য তিনি বাণিজ্যিক আইন কানুন সমূহ সরল করে দেন। জনকল্যাণমূলক কাজের দিকেও তাঁর দৃষ্টি ছিল। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য তিনি কয়েকটি দীর্ঘ রাজপথ নির্মাণ করেছিলেন। একটি ছিল সোনার গাঁ থেকে আগ্রা হয়ে দিল্লী এবং সেখান থেকে সিন্ধু পর্যন্ত, দ্বিতীয়টি ছিল আগ্রা থেকে যোধপুর এবং চিতোর পর্যন্ত, তৃতীয়টী ছিল আগ্রা থেকে বুরহানপুর এবং চতুর্থটি ছিল লাহোর থেকে মুলতান। পথপার্শ্বে তিনি বৃক্ষ রোপণ ও সরাইখানা স্থাপন করেছিলেন। এই সরাইগুলি ডাক চৌকির কাজ করত, অর্থাৎ এগুলি চিঠিপত্র দেওয়া নেওয়ার কেন্দ্র ছিল এবং আঞ্চলিক থানারও কাজ করত। এই দপ্তরগুলি যাদের হাতে থাকত তাদের বলা হত দারোগা-ই-ডাক-চৌকি। শের শাহের কাজকর্মের মধ্যে কোন সাম্প্রদায়িকতার পরিচয় পাওয়া যায় না।

৪॥ ইসলাম শাহ (১৫৪৫-৫৪)

শের শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র জালাল খান ইসলাম শাহ নাম নিয়ে অভিষিক্ত হন। সিংহাসনে আরোহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই বড় ভাই আদিল খানের সঙ্গে তাঁর বিরোধ বাধে, এবং ইসলাম শাহ তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। আগ্রার নিকট একটি যুদ্ধে আদিল খান পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন, তাঁর অনুগামী আমীররাও পরাজিত হয়ে পালিয়ে যান। আমীরদের মধ্যে অনেকে আদিল খানের সমর্থক সন্দেহ করে ইসলাম শাহ বেশ কয়েকজন আমীরকে প্রাণদণ্ড দিয়ে অপ্রিয়-ভাজন হওয়া সত্ত্বেও দৃঢ়ভাবে শাসন চালিয়ে যান, এবং নিজ আত্মীয়স্বজনকে নানা গুরুত্বপূর্ণ পদে বসিয়ে দেন। সেনাপতি হিসাবেও তিনি দক্ষ ছিলেন এবং মুঘল বাহিনীর, বিশেষ করে হুমায়ুনের গতিবিধির উপর বিশেষ লক্ষ্য রেখেছিলেন। পাঞ্জাবের নিরাপত্তার জন্য তিনি শিবালিক পর্বতমালার উপর মানকোট দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর পিতা প্রবর্তিত শাসন ব্যবস্থা তিনি দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করতেন। ব্যক্তিগত ভাবে গোঁড়া সুন্নি মুসলমান হলেও তিনি রাজনীতি ও শাসনের ক্ষেত্রে পুরোপুরি ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন।

৫ ॥ আদিল শাহ (১৫৫৪-৫৬) : আফগান শক্তির পতন

১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে নভেম্বর ইসলাম শাহের মৃত্যু হলে তাঁর নাবালক পুত্র ফিরুজ সিংহাসনে বসেন। কিন্তু তাঁর মাতুল মুবারিজ খান, যিনি আবার শের শাহের ছোট ভাই নিজামের পুত্র ছিলেন, তাঁকে হত্যা করে মুহম্মদ আদিল শাহ নাম নিয়ে ক্ষমতায় আসীন হন। বৈধ উত্তরাধিকারীকে হত্যার জন্য বিক্ষুব্ধ আমীরদের তিনি ধনরত্ন ও উপাধি বিতরণ করে শান্ত করার চেষ্টা করেন। আদিল শাহ দুর্বল ও অপদার্থ ছিলেন, কিন্তু হেমচন্দ্র নামক একজন বিচক্ষণ ব্যক্তিকে উজির পদে নিয়োগ করেছিলেন।

আদিল শাহের সিংহাসন লাভের পর আগ্রার শাসক ইব্রাহিম খান শূর, লাহোরের শাসক সিকন্দর শূর, বঙ্গদেশের শাসক মুহম্মদ খান শূর প্রভৃতিরা বিদ্রোহী হন। এঁরা শুধু আদিল শাহর বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করেননি, নিজেদের মধ্যেও পারস্পরিক যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হয়েছিলেন। এই সুযোগে হুমায়ুন পাঞ্জাব অঞ্চলে কর্তৃত্ব পুনরুদ্ধারে সমর্থ হয়েছিলেন। আফগানদের পারস্পরিক সংঘাত ও বিদ্রোহের যুগে হেমচন্দ্র আদিল শাহের পক্ষে বাইশটি যুদ্ধ করেছিলেন এবং সব কটি যুদ্ধেই সফল হয়েছিলেন। আগ্রার শাসক ইব্রাহিমকে হেমচন্দ্র দুবার পরাজিত করেছিলেন, কাল্পি ও খানুয়ায়। তিনি বয়ান দুর্গে আশ্রয় নিলে হেমচন্দ্র তিন মাস ওই দুর্গ অবরোধ করে রাখেন। এদিকে বাংলার শাসক মুহম্মদ শাহ কাল্পি অভিযান করলে ছপরঘট্টার যুদ্ধে হেমচন্দ্র তাঁকে পরাজিত করেন।

১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে হুমায়ুনের মৃত্যুর সুযোগে হেমচন্দ্র গোয়ালিয়র থেকে রওনা হয়ে আগ্রা দখল করেন। আগ্রার শাসক ইসকান্দার খান উজবেক দিল্লী পালিয়ে যান, এরপর হেমচন্দ্র দিল্লীর শাসক তর্দী বেগ খানকে পরাজিত করে দিল্লী অধিকার করেন।

হেমচন্দ্র অতঃপর স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং রাজা বিক্রমাদিত্য উপাধি গ্রহণ করেন। আফগান প্রধানরা তাঁর পক্ষ অবলম্বন করেন। তাঁর সঙ্গে অগ্রসরমান মুঘলবাহিনীর সংঘর্ষ অতঃপর অনিবার্য হয়ে পড়ে। বৈরাম খানের অভিভাবকত্বে আকবর তখন দিল্লী ও আগ্রা পুনরাধিকারের জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই নভেম্বর তারিখে পানিপথ প্রান্তরে উভয় বাহিনীর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধের গতি হেমচন্দ্রের অনুকূলে থাকলেও আকস্মিকভাবে একটি তীরের আঘাতে তিনি আহত অবস্থায় ধৃত হন এবং বৈরামের নির্দেশে আকবর তাঁকে নিহত করেন।

পানিপথের এই দ্বিতীয় যুদ্ধই মুঘলদের ভাগ্য খুলে দেয়। আকবর ও বৈরাম খান পাঞ্জাব থেকে সিকন্দরকে উচ্ছেদ করার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর পশ্চিমে আফগান প্রাধান্যের অবসান হয়। এদিকে ১৫৫৭ খ্রীষ্টাব্দে চুনারে বঙ্গদেশের শাসক খিজির খান শূরের নিকট আদিল শাহ পরাজিত ও নিহত হন। আগ্রার শাসক ইব্রাহিম শূর উড়িষ্যায় আশ্রয় নেন, এবং তাঁর রাজনৈতিক জীবন কার্যত শেষ হয়ে যায়। শূরদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের আফগান শক্তিরও পতন ঘটে।

৬॥ গুজরাত

গুজরাতের সুলতান মুজফ্‌ফর ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে মারা যাবার পর তাঁর পুত্র সিকন্দর মাত্র ছয় সপ্তাহ রাজত্ব করে আততায়ীর হস্তে নিহত হলে মুজফ্‌ফরের একটি নাবালক পুত্রকে দ্বিতীয় মাহমুদ নাম দিয়ে সিংহাসনে বসানো হয়, কিন্তু এই সময়কার পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে মুজফ্‌ফরের পলাতক পুত্র বাহাদুর শাহ ক্ষমতা দখল করেন এবং নিকট ও দূর সম্ভাব্য প্রতিটি শত্রুকেই তিনি নিহত করেন।

১৫২৮-২৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি খান্দেশ ও বেরারের শাসকদের অনুরোধে আহমদনগর ও বিদরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং দৌলতাবাদ দুর্গ অবরোধ করেন। এই যুদ্ধ থেকে তাঁর কোন সুনির্দিষ্ট ফললাভ হয়নি। ১৫৩১ খ্রীষ্টাব্দে বাহাদুর শাহ মালব আক্রমণ করেন এবং মালবের সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদের কাছ থেকে প্রায় বিনা বাধায় মাণ্ডু অধিকার করেন। ১৫৩১ খ্রীষ্টাব্দে পোর্তুগীজরা দিউ আক্রমণ করলে বাহাদুর জোরাল প্রতিরোধ করেন, ফলে পোর্তুগীজ সেনাপতি নুনো দা কুনহা গোয়ায় ফিরে যেতে বাধ্য হন। এর পর বাহাদুর সিলহ্‌দি নামক হিন্দু রাজার অধীনস্থ মালবের অন্তর্গত রাইসেন ও ভীলসা দখল করেন। ১৫৩৩-এ তিনি গাগ্‌রাউন ও মান্দাসোর অধিকার করে চিতোর অবরোধ করেন। তাঁর এই মেবার অভিযানে তিনি মেবার অধিকৃত মালবের কিছু অঞ্চল ও তৎসহ রণথম্ভোর আজমের ও নগর অধিকার করেন। কিন্তু পোর্তুগীজ আক্রমণে তাঁর উচ্চাশা প্রচণ্ড ভাবে আহত হয়। ১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দে তারা দমন অধিকার করে, এবং পরাজিত বাহাদুর পোর্তুগীজদের সঙ্গে সন্ধি করেন বেসিন ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলগুলি তাদের হাতে তুলে দিয়ে।

১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দে হুমায়ুনের বিদ্রোহী আমীর জমান মীর্জাকে রাজনৈতিক আশ্রয় দিয়ে বাহাদুর হুমায়ুনের অপ্রিয়ভাজন হন। হুমায়ুন যখন পূর্বাঞ্চলে যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন

বাহাদুর তখন তাতার খানকে রণথম্ভোর থেকে আগ্রায় হামলা করতে পাঠান। এরপর তিনি চিতোর জয়ের অভিপ্রায় নিয়ে চিতোর আক্রমণ করেন। ইত্যবসরে হুমায়ুন ১৫৩৫-এর ফেব্রুয়ারি নাগাদ রাইসেন দখল করে মালবের সারঙ্গপুরে উপস্থিত হন। বাহাদুরের চিতোরে ব্যস্ত থাকার সুযোগে হুমায়ুন উজ্জয়িনী জয় করেন। ওদিকে ১৫৩৫-এর ৮ই মার্চ চিতোর জয় সমাধা করে প্রত্যাবর্তনের পথে হুমায়ুনের সঙ্গে বাহাদুরের সৈন্যবাহিনীর সাক্ষাৎ হয় মান্দাসোরে। হুমায়ুনের বাহিনী কর্তৃক অবরুদ্ধ হয়ে বাহাদুর ২৫শে এপ্রিল তারিখে মাণ্ডু পালিয়ে যান, সেখান থেকে চাম্পানের এবং সেখান থেকে অবশেষে দিউ।

দিউতে বাহাদুর পোর্তুগীজদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। সেখানে একটি দুর্গ নির্মাণ করার অনুমতির বিনিময়ে পোর্তুগীজরা বাহাদুরকে সাহায্য করতে রাজি হয়। এদিকে হুমায়ুন কয়েকটি ভুল পদক্ষেপ করে গুজরাতে নিজেকে অপ্রিয় করে তোলেন, এবং বাহাদুরের পক্ষের আমীরগণের লোকবলের পাল্টা আক্রমণের ধাক্কায় শেষপর্যন্ত মুঘলরা গুজরাত ও মালব ত্যাগ করে যায় ১৫৩৬-এর মাঝামাঝি নাগাদ। পোর্তুগীজদের সঙ্গে দিউ-সংক্রান্ত অধিকারের কয়েকটি বিষয় নিয়ে বোঝাপড়া করার জন্য বাহাদুর তাদের জাহাজে যখন উপস্থিত ছিলেন তখন অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিত বিশ্বাসঘাতকতা করে পোর্তুগীজরা তাঁকে নিহত করে ১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে।

বাহাদুরের মৃত্যুর পর তাঁর ভাইপো তৃতীয় মাহমুদ শাহ নাবালক অবস্থায় ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর সময় গুজরাতের তরফ থেকে পোর্তুগীজদের কাছ থেকে দিউ উদ্ধারের প্রচেষ্টা হয়। বাহাদুর শাহ পোর্তুগীজদের বিরুদ্ধে তুরস্কের সম্রাট সুলেমানের সাহায্য চেয়েছিলেন, কিন্তু সেই সাহায্য আসে তাঁর মৃত্যুর পর। তুর্কী বাহিনী পোর্তুগীজদের হাতে পরাজিত হয়ে ফিরে যায়। ১৫৪৬ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয়বার এবং ১৫৪৮ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয়বার মাহমুদ দিউ দখল করতে ব্যর্থ হন। ১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দে মাহমুদ নিহত হলে তাঁর জ্ঞাতি তৃতীয় আহমদ কোনক্রমে ১৫৬১ পর্যন্ত রাজত্ব করে মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর চক্রান্তকারী আমীররা নাথু নামক একটি বালককে তৃতীয় মাহমুদের পুত্র বলে পরিচিত করে তৃতীয় মুজফ্‌ফর নাম দিয়ে সিংহাসনে বসিয়ে দেয়। কিন্তু সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয় ইতিমাদ খান নামক জনৈক আমীরের হাতে। তাঁর প্রতিনিধি চিঙ্গিজ খান তাঁকে বিতাড়িত করলে ইতিমাদ মুঘল বাদশাহ আকবরের শরণাপন্ন হন। চিঙ্গিজ খানও তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের

হস্তে নিহত হন। অতঃপর ইতিমাদ পুনরায় ক্ষমতায় আসেন কিন্তু ব্রোচ, সুরাট, বরোদা ও চাম্পানের মীর্জাগণ কর্তৃক অধিকৃত হয়। কচ্ছের রাও এবং নবনগরের জাম স্বাধীনতা ঘোষণা করেন, এবং হিন্দু সামন্ত-রাজারাও তাঁদের পথ অনুসরণ করেন। ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে আকবর কার্যত বিনা বাধাতেই গুজরাত দখল করে নেন। সুলতান তৃতীয় মুজফ্‌ফর ধৃত হন ও তাঁকে একটি সামান্য বার্ষিক বৃত্তি মঞ্জুর করা হয়।

৭॥ কাশ্মীর

আমরা দেখেছি যে ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে মুহম্মদ শাহ চতুর্থবার কাশ্মীরের সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। ১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত কাশ্মীরে ক্ষমতালাভের জন্য বিভিন্ন গোষ্ঠীর গৃহযুদ্ধ চলেছিল। এরই মধ্যে দু'বার মুঘল আক্রমণ ঘটেছিল। প্রথমটি ১৫৩১ খ্রীষ্টাব্দে কামরানের আক্রমণ, দ্বিতীয়টি ১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দে মীর্জা হায়দারের আক্রমণ। দুটি আক্রমণই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। মুহম্মদ শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সামসুদ্দীন ১৫৪০ পর্যন্ত রাজত্ব করেন এবং তাঁর উত্তরাধিকারী হন নজুক শাহ।

১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে কনৌজের বিল্বগ্রামে হুমায়ুনের পরাজয়ের পর মুঘল প্রধানরা লাহোরে সমবেত হয়ে যথাকর্তব্য নির্ধারণকালে মীর্জা হায়দার কাশ্মীর আক্রমণের প্রস্তাব করেন। হুমায়ুন নিজে কাশ্মীর আক্রমণে উৎসাহী ছিলেন না, কিন্তু মীর্জা হায়দারকে ব্যক্তিগতভাবে কাশ্মীর অভিযানের অধিকার দিয়েছিলেন। মীর্জা প্রায় বিনা বাধাতেই কাশ্মীর অধিকার করেন। তিনি নজুক শাহকে সিংহাসনে বজায় রেখে পিছন থেকে সর্বক্ষমতার নিয়ামক হতে চেয়েছিলেন। কাশ্মীরের পরাক্রান্ত আমীর কাজী চক শের শাহের সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে ১৫৪১ খ্রীষ্টাব্দে দু'বার মীর্জাকে কাশ্মীর থেকে উৎখাত করতে গিয়ে ব্যর্থ হন। ১৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দে হুমায়ুন কান্দাহার ও কাবুল অধিকার করলে মীর্জা হায়দার তাঁর বশ্যতা স্বীকার করায় কাশ্মীরীরা ক্রুদ্ধ হয়। ১৫৫১ খ্রীষ্টাব্দে গৃহযুদ্ধের ফলে মীর্জা হায়দার নিহত হওয়ায় কাশ্মীর থেকে মুঘল প্রভাব বিলুপ্ত হয়।

এই ঘটনার পর আমীররা নজুক খানকেই সুলতান বলে মেনে নেন। কিন্তু ক্ষমতার চাবিকাঠি থাকে প্রধানমন্ত্রী ইদি রায়নার হাতে। ১৫৫২ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাবের আফগান শাসক হায়বৎ খান নিয়াজী কাশ্মীর আক্রমণ করলে ইদি রায়না, দৌলত চক এবং হুসেন মকৃরি এই তিন কাশ্মীরী আমীর একত্র হয়ে তাঁকে পরাজিত ও নিহত করেন। কিন্তু শীঘ্রই কাশ্মীরে ইদি রায়না ও দৌলত চকের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয় এবং

দৌলত চক বিজয়ী হয়ে সুলতান নজুক শাহকে বিতাড়িত করে এবং ১৫৫২ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান পদে মুহম্মদ শাহের অপর পুত্র ইব্রাহিমকে প্রতিষ্ঠিত করে নিজে প্রধান মন্ত্রী হন। কিন্তু দৌলত চক তাঁর সম্পর্কিত ভাই গাজী চক কর্তৃক বন্দী ও অন্ধ হন। অতঃপর গাজী নিজেই প্রধানমন্ত্রী হন এবং সুলতান ইব্রাহিমকে পদচ্যুত করে তাঁর ভাই ইসমাইলকে সুলতান করেন। ১৫৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ইসমাইলের মৃত্যু হলে গাজী ইসমাইলের পুত্র হবিবকে রাজা করেন। গাজীর প্রধানমন্ত্রিত্বের আমলে বিক্ষুব্ধ আমীররা আকবরের সভাসদ আবুল মালির নেতৃত্বে ১৫৫৮ খ্রীষ্টাব্দের গাজীর হাত থেকে কাশ্মীর দখলের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। আরও একদল আমীর মীর্জা হায়দারের সেনাপতি কারা বাহাদুরের সাহায্যে অনুরূপ প্রচেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। ১৫৬১ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান হবিবকে পদচ্যুত করে গাজী স্বয়ং সুলতান হন। ১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর ভাই হুসেন তাঁকে অপসারিত করে এবং তাঁর পুত্র আহমদকে অন্ধ করে নিজেই সুলতান হন।

এর পরের কাশ্মীরের ইতিহাস সিংহাসনের জন্য বক্তারক্তি ও গৃহযুদ্ধের পূর্ব ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। হুসেন তাঁর ভাই আলি শাহ কর্তৃক ১৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দে পদচ্যুত হন। আলি শাহ ১৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দে আকবরের আনুষ্ঠানিক অধীনতা স্বীকার করে নেন। ১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দে আলি শাহ দুর্ঘটনায় মারা গেলে তাঁর পুত্র ইউসুফ আলি শাহের ভাই আবদালকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করে সিংহাসন দখল করেন। ইউসুফ দু'মাস রাজত্ব করার পর আমীররা তাঁকে বিতাড়ন করে মন্ত্রী সৈয়দ মুবারককে সিংহাসনে বসায়। কয়েক মাস পরে মুবারক বন্দী হন এবং কিছু আমীরের চেষ্টায় লোহার চক নামক এক ব্যক্তি সিংহাসন লাভ করে।

এদিকে পদচ্যুত ইউসুফ লাহোরে মানসিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন যিনি তাঁকে ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে আকবরের সভায় নিয়ে যান। আকবর তাঁকে সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দিলে তিনি একটি বাহিনী সহ কাশ্মীরে আসেন, এবং মুঘল বাহিনীর উপস্থিতিতে ভীত হয়ে কাশ্মীরের আমীরগণ তাঁর সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসেন। ইউসুফ এরপর মুঘল সাহায্য ব্যতিরেকেই কাশ্মীরের সিংহাসন দখল করেন। সুলতান লোহার চককে বন্দী ও অন্ধ করা হয়। ১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট আকবর তাঁর সভায় ইউসুফের উপস্থিতি কামনা করলে ইউসুফ তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র ইয়াকুবকে প্রেরণ করেন। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে আকবর ভগবান দাসকে কাশ্মীর দখল করতে পাঠান। ইউসুফ কোন প্রতিরোধ না করেই আত্মসমর্পণ করেন (২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৫৮৬)। কিন্তু

ইউসুফের পুত্র ইয়াকুব মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যান, তবে শেষ পর্যন্ত সন্ধি করতে বাধ্য হন। কিন্তু ইয়াকুব আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ব্যর্থ হওয়ায় বিক্ষুব্ধ কিছু আমীর কাশ্মীরে আকবরকে হস্তক্ষেপ করতে অনুরোধ করেন। ফলে পূর্বের চুক্তি লঙ্ঘন করেই আকবর কাশিম খানকে কাশ্মীর দখল করতে পাঠান (৮ই জুলাই ১৫৮৬)। কাশিম খান কাশ্মীরকে ভীতচকিত করলেও কাশ্মীর দখল করতে পারেননি। তাঁর জায়গায় মীর্জা ইউসুফ প্রেরিত হন। শেষ পর্যন্ত ইয়াকুব পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণ করলে (১৫৮৯) কাশ্মীর মুঘল সাম্রাজ্যের অংশে পরিণত হয়।

৮॥ দাক্ষিণাত্যের রাজ্য পঞ্চক

ষোড়শ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত দাক্ষিণাত্যে কোন মুঘল প্রভাব অনুপ্রবেশ করেনি। বহমনী রাজ্যের পতনের পর সেখানে পাঁচটি স্বাধীন সুলতানী গড়ে উঠেছিল যেগুলি ছিল আহমদনগরের নিজামশাহী, বিজাপুরের আদিলশাহী, গোলকুণ্ডার কুতবশাহী, বিদরের বারিদশাহী ও বেরারের ইমাদশাহী।

আহমদনগর : ১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দে জুন্নারের শাসক মালিক আহমদ বহমনী আনুগত্য ছিন্ন করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং সিনা নদীর তীরে আহমদনগর শহরটির পত্তন করেন। তিনি দৌলতাবাদ দুর্গ ও তৎসহ খান্দেশের অন্তর্গত আন্তর দুর্গ জয় করেছিলেন। বাগলানের রাজা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন। ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র প্রথম বুরহান নিজাম শাহ আহমদনগরের সুলতান হন। ১৫২৪ খ্রীষ্টাব্দে বুরহান বিজাপুরের অধিকার থেকে শোলাপুর দখল করতে ব্যর্থ হন। ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে বিজাপুরের সঙ্গে তাঁর পুনরায় সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়, কিন্তু পরবৎসর বেরার, খান্দেশ ও গুজরাতের সম্মিলিত আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য তিনি বিজাপুরের সঙ্গে মিত্রতা করে একযোগে যুদ্ধ করেন, কিন্তু পরাজিত হয়ে গুজরাতের আনুষ্ঠানিক অধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য হন। ১৫৩১ খ্রীষ্টাব্দে কল্যাণী ও কান্দাহারের (আফগানিস্তানের বিখ্যাত কান্দাহার নয়) অধিকার নিয়ে বিদর ও বিজাপুরের মধ্যে সংঘর্ষ হলে বুরহান বিদরের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করে পরাজিত হন। ১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দে বুরহান শিয়া ধর্ম অবলম্বন করলে বিজাপুরের সুলতান ইব্রাহিম আদিল শাহ গুজরাত ও খান্দেশের সুলতানদের সহযোগিতায় আহমদনগর দখল করতে ব্যর্থ হন। ১৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দে বুরহান গোলকুণ্ডা, বিদর ও বিজয়নগরের সহায়তায় বিজাপুর আক্রমণ করেন, কিন্তু নিজেদের মধ্যে নানা স্বার্থের বিরোধের জন্য এই প্রচেষ্টা

ফলবতী হয়নি। এরপর বুরহান বিজয়নগরের সহযোগিতায় বিজাপুরকে পরাজিত করেন এবং কল্যাণী অধিকার করেন। পুনরায় আর একটি যুদ্ধে বিজয়নগরের সহায়তায় তিনি বিজাপুরের অধিকার থেকে শোলাপুর দখল করেন। ১৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দে বিজাপুরকে পুরোপুরি ধ্বংস করার অভিপ্রায়ে তিনি বিজয়নগরের সঙ্গে একযোগে বিজাপুর দুর্গ পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন, কিন্তু এই সময় আকস্মিক অসুস্থতার ফলে তাঁর মৃত্যু হয়।

বুরহানের মৃত্যুর পর প্রথম হুসেন নিজাম শাহ আহমদনগরের সিংহাসনে আরোহণ করলে, তাঁর ভাই আলিকে আহমদনগরের সিংহাসনে বসানোর অভিপ্রায়ে ১৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দে বিজাপুরের ইব্রাহিম আদিল শাহ হুসেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন, কিন্তু তাঁর এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১৫৫৭ খ্রীষ্টাব্দে হুসেন গোলকুণ্ডার সুলতানের সহযোগে বিজাপুরের হাত থেকে গুলবর্গা দখল করার অভিপ্রায়ে একটি অভিযান প্রেরণ করলে বিজয়নগরের রামরাজা বিজাপুরের পক্ষ অবলম্বন করেন, এবং শেষ পর্যন্ত তাঁরই প্রচেষ্টায় সকলের দ্বারা একটি শান্তি চুক্তি গৃহীত হয়। ওই বছরেই আলি আদিল শাহ বিজাপুরের সুলতান হলে হুসেন গোলকুণ্ডার সহযোগে বিজাপুর আক্রমণ করেন, কিন্তু বিজয়নগরের রামরাজার সাহায্যে বিজাপুর আহমদ-নগরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। সন্ধির শর্তানুযায়ী কল্যাণী বিজা-পুরের অধীনে আসে এবং আহমদনগর রামরাজার আনুষ্ঠানিক আনুগত্য স্বীকার করে। ১৫৬১ খ্রীষ্টাব্দে গোলকুণ্ডার সহায়তায় হুসেন কল্যাণী অবরোধ করেন, এবং এক্ষেত্রেও রামরাজার হস্তক্ষেপে হুসেনকে ব্যর্থ হতে হয়। রামরাজার ক্রমবর্ধমান শক্তি এবং দাক্ষিণাত্যের পাঁচটি সুলতানীর উপর তাঁর প্রভাব শেষ পর্যন্ত এই সুলতানদের মধ্যে একটি ভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। গোলকুণ্ডার ইব্রাহিম কুতবশাহের দৌত্যগিরির ফলে চিরশত্রু বিজাপুর ও আহমদনগর বিজয়নগরের বিরুদ্ধে একজোট হয়। গোলকুণ্ডা ও বিদরও এই জোটের শরিক হয়, বেরার নিরপেক্ষ থাকে। এই চারটি রাজ্যের সম্মিলিত বাহিনী ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী তারিখে তালিকোটা বা রাক্ষসী-তঙ্গাদির যুদ্ধে বিজয়নগরকে পরাজিত করে ওই বছরেরই হুসেন নিজাম শাহ মারা যান।

বিজাপুর: ১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দে ইউসুফ আদিল খান স্বাধীন বিজাপুর রাজ্যের পত্তন করেন। বিলুপ্তপ্রায় বহমনী রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কাশিম বারিদের আক্রমণ, বিজয়নগরের প্রবল চাপ, পোর্তুগীজ হামলা প্রভৃতি বহু ঝড়ঝাপ্টা সহ্য করে তিনি

১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে মারা যান। পরবর্তী সুলতান ইসমাইল আদিল খান ১৫৩৪ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর আমলে ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে গোয়া পাকাপাকিভাবে পোর্তুগীজদের অধিকারে চলে যায়। বিজয়নগরের কৃষ্ণদেব রায়ের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি বারবার পরাজিত হলে কৃষ্ণদেবের মৃত্যুর পর ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রায়চুর ও মুদ্গল দুর্গদ্বয় অধিকার করেন। পরবর্তী সুলতান মল্লু আদিল খানের আমলে, যিনি মাত্র এক বছর রাজত্ব করেছিলেন, বিজয়নগরের অচ্যুতরায় রায়চুর দখল করে নেন। তাঁর উত্তরাধিকারী ইব্রাহিম আদিল শাহ ১৫৩৫ খ্রীষ্টাব্দে বিজয়নগরের অচ্যুতরায় ও রামরাজার বিরোধের সুযোগ নিয়ে বিজয়নগর অক্রমণ করে নগলপুর শহর ধ্বংস করেছিলেন। তাঁর আমলে আহমদনগরের সঙ্গে বিজাপুরের দীর্ঘস্থায়ী শত্রুতার সৃষ্টি হয়। তাঁর আমলে আহমদনগরের সঙ্গে বিজাপুরের যে কটি যুদ্ধ হয় সেক্ষেত্রে বিজয়নগর তাঁর বিপক্ষে ছিল, যদিও তাঁর উত্তরাধিকারীর আমলে বিজয়নগর বিজাপুরের পক্ষে আসে। তাঁর সিংহাসনের প্রতিদ্বন্দ্বী আবদুল্লাকে আশ্রয় দেবার ফলে গোয়ার পোর্তুগীজদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ বাধে, কিন্তু পোর্তুগীজদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করতে তিনি ব্যর্থ হন। ইব্রাহিম আদিল শাহ ১৫৫৭ খ্রীষ্টাব্দে মারা যান।

বেরার: ১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দে ফথ-উল্লা ইমাদ-উল-মুল্ক বহমনী প্রভুত্ব অস্বীকার করে বেরারে একটি স্বাধীন রাজ্যের পত্তন করেন। ১৫০৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মারা যাবার পর তাঁর পুত্র আলাউদ্দীন ইমাদ শাহের আমলে আহমদনগরের সঙ্গে বেরারের দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ ঘটে, পাথরি ও মাহুর নামক দুটি স্থানের অধিকার নিয়ে। প্রথম ও দ্বিতীয় যুদ্ধ ঘটে যথাক্রমে ১৫১০ ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দে, তৃতীয় ও চতুর্থ যুদ্ধ ঘটে যথাক্রমে ১৫২৭ ও ১৫২৮ খ্রীষ্টাব্দে। যুদ্ধগুলির কোন স্থায়ী ফল হয় নি, যদিও দাক্ষিণাত্যের অপর তিনটি শক্তিও এই যুদ্ধগুলিতে সামিল হয়েছিল, ও গুজরাতের বাহাদুর শাহও এতে হস্তক্ষেপ করেছিলেন। ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে আলাউদ্দীন ইমাদ শাহ মারা গেলে তাঁর পুত্র দরিয়া ইমাদ শাহ বেরারের সুলতান হন। বিজাপুরের সঙ্গে আহমদনগরের যুদ্ধে তিনি একবার বিজাপুরের অপরবার আহমদনগরের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন।

বিদর: বহমনী সুলতান মুহম্মদ শাহের রাজত্বকালে (১৪৮২-১৫১৮) তাঁর প্রধান মন্ত্রী কাশিম বারিদ বহমনী রাজ্যের সর্বময় কর্তা ছিলেন। ১৫০৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু ঘটলে তাঁর পুত্র আমীর বারিদ পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দে মুহম্মদ শাহ মারা গেলে আরও তিন জন সুলতান কিছুকাল বহমনী রাজ্যের নামমাত্র অধীশ্বর

ছিলেন। ১৫২৮ খ্রীষ্টাব্দে আমীর বারিদ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন, যদিও তিনি কখনও শাহ উপাধি গ্রহণ করেননি। ১৫২৯ খ্রীষ্টাব্দে বিজাপুরের ইসমাইল আদিল খান আমীর বারিদকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে বিদরের বেশির ভাগ অঞ্চল দখল করে নেন। পরবৎসরও ইসমাইল আদিল খান তাঁকে পরাজিত করে অপমানজনক শর্তে সন্ধি করতে বাধ্য করেন। আমীর বারিদ ১৫৪২-এর কিছু আগে গোলকুণ্ডার সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়লে তিনি বিজাপুরের সাহায্য পান। পরে তিনি বিজাপুরের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে আহমদনগরের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন।' ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে আমীর বারিদ মারা গেলে তাঁর পুত্র আলি বারিদ ১৫৮০ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। আলি বারিদই প্রথম শাহ উপাধি গ্রহণ করেছিলেন।

গোলকুণ্ডা: গোলকুণ্ডায় কুলী কুতব-উল-মুল্ক ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন, যদিও তিনি শাহ উপাধি গ্রহণ করেন নি। তেলুগুভাষী এলাকাগুলি দখল করার অভিপ্রায়ে তিনি স্থানীয় শক্তিগুলির বিরুদ্ধে অনেকগুলি যুদ্ধ করেছিলেন। উড়িষ্যার প্রতাপরুদ্র গজপতির অধিকার থেকে তিনি কোণ্ডপল্লী, এলোর এবং রাজমহেন্দ্রী দখল করেন, কিন্তু বিজয়নগরের অধিকারাধীন কোণ্ডবিড়ু দুর্গ দখল করতে গিয়ে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। বিজাপুর ও বিদরের সঙ্গেও তাঁর সংঘর্ষ হয়েছিল। আটানব্বই বছর বয়সে ১৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর পুত্র জামসিদ নিযুক্ত আততায়ীর হস্তে তিনি নিহত হন। এর পর জামসিদ সিংহাসনে আরোহণ করলে তাঁর ভাই ইব্রাহিম বিদরে পালিয়ে আসেন। বিদরের আলি বারিদ শাহ ইব্রাহিমের পক্ষ নিয়ে জামসিদের বিরুদ্ধে অভিযান করেন এবং গোলকুণ্ডা দুর্গ পর্যন্ত অগ্রসর হন। জামসিদ তখন আহমদনগরের বুরহান নিজাম শাহের সাহায্যে সেই আক্রমণ প্রতিহত করেন। জামসিদ বিজাপুরের সঙ্গে আহমদনগরের সংঘর্ষের সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক ভূমিকা গ্রহণ করে গোলকুণ্ডায় মর্যাদা বৃদ্ধি করেছিলেন। ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মারা গেলে তাঁর নাবালক পুত্র সুভান কুলিকে সরিয়ে তাঁর ভাই ইব্রাহিম কুতব শাহ যিনি পূর্ববর্তী পরাজয়ের পর এতদিন বিজয়নগরে আশ্রিত ছিলেন, গোলকুণ্ডার সিংহাসন দখল করে নেন এবং শাহ উপাধি গ্রহণ করেন।

৯॥ বিজয়নগর

১৫২৯ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণদেব রায়ের মৃত্যুর পর তাঁরই ইচ্ছানুযায়ী তাঁর নাবালক পুত্রের পরিবর্তে তাঁর সম্পর্কিত ভাই অচ্যুতদেব রায় বিজয়নগরের সিংহাসনে আরোহণ

করেন। কিন্তু কৃষ্ণদেবের জামাতা রাম রায় বা রামরাজা কৃষ্ণদেবের নাবালক পুত্রকে সিংহাসনে বসিয়ে তাঁর অভিভাবক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এইভাবে বিজয়নগরের সিংহাসন নিয়ে গৃহবিবাদ শুরু হয় যার ফলে রাজ্যের প্রধানরা ও সামন্তরাজারা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যান। এই অবস্থা চলে ১৫৩৫ পর্যন্ত যখন উভয়ের বিরোধের সুযোগ নিয়ে বিজাপুরের ইব্রাহিম আদিল শাহ বিজয়নগর আক্রমণ করেন, এবং শেষ পর্যন্ত তাঁরই ব্যবস্থাপনায় স্থির হয় যে রামরাজার নিজস্ব এলাকা-গুলিতে রামরাজা স্বাধীন ও সার্বভৌম থাকবেন, অবশিষ্ট এলাকায় অচ্যুত স্বাধীন ও সার্বভৌম থাকবেন। দু'তরফই এই প্রস্তাব মেনে নেন। কৃষ্ণদেব রায়ের নাবালক পুত্রটি ইতিমধ্যে মারা যাওয়ায় এই রকম ব্যবস্থা হতে কোন অসুবিধা হয়নি।

১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে অচ্যুত মারা গেলে তাঁর নাবালক পুত্র প্রথম বেঙ্কট রাজা হন, কিন্তু তাঁর মাতুল তিরুমল কার্যত রাজ্যের প্রধান হয়ে দাঁড়ান। তিরুমলের মতলব ছিল ভাগ্নেকে হত্যা করে নিজেই রাজা হবার। এদিকে রামরাজা অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছিলেন। তিনি গুত্তি নামক দুর্গে বন্দী অচ্যুতের ভাইপো সদাশিবকে মুক্ত করে তাকে বিজয়নগরের রাজা বলে ঘোষণা করেন, এবং বিজাপুরের ইব্রাহিম আদিল শাহের নিকট সাহায্যের জন্য আবেদন করেন। তৎক্ষণাৎ আদিল বিজয়নগরে সৈন্যবাহিনী নিয়ে হাজির হন কিন্তু তিরুমল তাঁকে পরাজিত করে পলায়ন করতে বাধ্য করেন। অতঃপর তিরুমল তাঁর ভাগ্নে প্রথম বেঙ্কটকে হত্যা করে নিজেই ক্ষমতা গ্রহণ করেন এবং বিজয়নগরে ত্রাসের রাজত্ব প্রবর্তন করেন। সুযোগ বুঝে রামরাজা তিরুমলকে পরাজিত ও নিহত করেন, এবং সদাশিবকে সিংহাসনে বসিয়ে দেন (১৫৪৩)।

সদাশিবের আমলে রামরাজাই ছিলেন সর্বময় কর্তা, তদুপরি ১৫৫২ খ্রীষ্টাব্দে সদাশিব রামরাজাকে উপরাজা হিসাবে সরকারীভাবে মেনে নিয়েছিলেন। ১৫৪৩-৪৪ খ্রীষ্টাব্দে রামরাজা চিন্ন তিম্মের নেতৃত্বে বিদ্রোহী সামন্তদের শায়েস্তা করার জন্য বাহিনী প্রেরণ করেন। এই অভিযান সম্পূর্ণ সফল হয় এবং কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত বিজয়নগরের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৫৪৭ খ্রীষ্টাব্দে রামরাজা পোর্তুগীজদের সঙ্গে একটি সন্ধি করেন, কিন্তু ১৫৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তারা সন্ধির শর্তাবলী ভঙ্গ করলে রামরাজা পোর্তুগীজদের বিরুদ্ধে দ্বিমুখী আক্রমণ চালিয়ে পূর্বে সান থোমে (সেণ্ট টমাস) ও পশ্চিমে পাঙ্গিমে পোর্তুগীজদের পরাজিত করেন এবং উভয় স্থানে ব্যাপক লুণ্ঠন চালান। এই ঘটনার পর পোর্তুগীজরা বিজয়নগরকে ঘাঁটাতে আর সাহস করেনি।

রামরাজা দাক্ষিণাত্যের পাঁচটি সুলতানীর পারস্পরিক যুদ্ধ বিগ্রহে হস্তক্ষেপ করতে অত্যন্ত অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন। এই পাঁচটির মধ্যে মুখ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল বিজাপুরের সঙ্গে আহমদনগরের, বাকি তিনটি কখনও এ পক্ষে কখনও ওপক্ষে যোগ দিত। রামরাজার লক্ষ্য ছিল দাক্ষিণাত্যে শক্তিসাম্য বজায় রাখা। ঐতিহাসিকদের মতে রামরাজার ক্রমবর্ধমান শক্তি ও প্রতিপত্তিতে ভীত হয়ে দাক্ষিণাত্যের বেরার বাদ দিয়ে বাকি চারটি রাজ্যের সুলতানরা একজোট হয়ে তালিকোটা বা রাক্ষসী তঙ্গাদির যুদ্ধে বিজয়নগরকে পরাজিত ও ধ্বংস করে। কিন্তু অভিযানের প্রকৃত কারণটি এখনও অজ্ঞাত। তালিকোটার যুদ্ধ হয়েছিল ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারি তারিখে। এই যুদ্ধে রামরাজা নিহত হন, এবং বিজয়নগর শহরটি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়। এই যুদ্ধের পরও বিজয়নগর রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল, কিন্তু দক্ষিণের প্রধানতম শক্তি হিসাবে তার যে ভূমিকা তা একেবারেই লুপ্ত হয়েছিল।

১০॥ পোর্তুগীজ অধিকার

১৫১২ খ্রীষ্টাব্দে আলবুকার্ক বিজাপুরের কাছ থেকে গোয়া পাকাপাকি ভাবে অধিকার করেছিলেন। তিনি স্থানীয় শক্তিগুলির সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের নীতি গ্রহণ করেছিলেন এবং পোর্তুগীজদের এতদ্দেশীয় মহিলাদের বিবাহ করতে উৎসাহ দিয়েছিলেন। তাছাড়া ভারতীয়দের নিয়ে একটি সামরিক বাহিনীও গঠন করেছিলেন। নুনো-দা-কুনহা যখন এদেশে পোর্তুগীজ রাজপ্রতিনিধি হিসাবে বর্তমান ছিলেন (১৫২৯-৩৮), সেই সময় মাদ্রাজের সান থোম ও বঙ্গদেশের হুগলীতে পোর্তুগীজদের বসতি গড়ে ওঠে। ১৫৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দিউ অধিকার করেন এবং ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাত ও তুরস্কের একটি সম্মিলিত বাহিনীকে নৌযুদ্ধে পরাজিত করেন। জোয়া-দে-কাস্ত্রো যখন রাজপ্রতিনিধি (১৫৪৫-৪৮) তখন পোর্তুগীজ বাহিনীর হস্তে বিজাপুর গোয়ার নিকটে পরাজিত হয়। বিজয়নগরের সঙ্গে পোর্তুগীজদের সম্পর্ক মোটের উপর ভাল ছিল। রামরাজার সময়ে সেই সম্পর্কে কিছুটা ফাটল ধরার পরিণতি কী হয়েছিল তা পূর্বে বলা হয়েছে।

একাদশ অধ্যায়

মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা

১।। আকবরের রাজ্যলাভ ঃ অভিভাবকত্বের কাল

১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারী মাত্র তের বছর বয়সে আকবর সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজ্যলাভের পর কয়েক বছর তিনি বৈরাম খানের অধীনে থাকেন। পাঞ্জাব ও আগ্রার শূর বংশীয় শাসকদের দিন তখন শেষ হয়ে গেছে। উদীয়মান মুঘল শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বী তখন আদিল শাহের প্রধান মন্ত্রী ও সেনাপতি হেমচন্দ্র যিনি দিল্লীর মুঘল শাসক তর্দি বেগকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে দিল্লী দখল করেছেন, রাজা বিক্রমাদিত্য উপাধি নিয়েছেন, এবং হিমু শাহ হিসাবে আফগানদের নিজ পতাকাতলে সমবেত করতে পেরেছেন।

যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়ে বৈরাম হিমুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ১৫৫৬-এর ৫ই নভেম্বর পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে জয়ের মুখে আকস্মিক ভাবে হিমু মারাত্মকভাবে আহত হওয়ায় শেষ পর্যন্ত মুঘলদের জয় হয়। অতঃপর আকবর দিল্লীতে প্রবেশ করেন। বৈরাম খান তাঁর অনুচর পীর মুহম্মদকে আলোয়ার অধিকার করতে প্রেরণ করেন। এদিকে পাঞ্জাবের প্রাক্তন আফগান শাসক সিকন্দর শূর মুঘল খিজর খাজা খানকে পরাস্ত করে নিজের হৃতরাজ্যের অনেকটা উদ্ধার করেন। সিকন্দর মানকোট দুর্গে আশ্রয় নেন এবং প্রায় ছয় মাস মুঘলদের প্রতিহত করেন। কিন্তু অন্য জায়গা থেকে আফগান সাহায্য না আসার দরুন শেষ পর্যন্ত সিকন্দর ১৫৫৭র ২৫ শে জুলাই তারিখে মুঘলদের হস্তে মানকোট দুর্গ অর্পণ করে বিহারে ও পরে বঙ্গদেশে চলে যান। আলোয়ারের প্রাক্তন শাসক আজমীরে পালিয়ে যান এবং সেখান থেকে হিসার অভিমুখে অভিযান করেন। তাঁর সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য বৈরাম পীর মুহম্মদকে হিসারে প্রেরণ করেন। হাজী খান গুজরাতে পালিয়ে গেলে আজমীর মুঘলদের অধিকারে আসে ১৫৫৮ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে। ১৫৫৯এ গোয়ালিয়র দুর্গ মুঘলগণ কর্তৃক অধিকৃত হয়। ওই বছরেই বৈরামের নির্দেশে রণথম্ভোর দুর্গ ও মালব অধিকারের জন্য মুঘল বাহিনী প্রেরিত হয়। কিন্তু বৈরামের আকস্মিক পদচ্যুতির জন্য দুটি অভিযানই প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

১৫৫৬ থেকে ১৫৫৯ পর্যন্ত বৈরাম খানই নবগঠিত মুঘল রাষ্ট্রের কর্ণধার ছিলেন, এবং একথা ঠিক যে তাঁর বিচক্ষণতা ব্যতিরেকে মুঘলদের এত দ্রুত শক্তিবৃদ্ধি হত না। কিন্তু বৈরাম উদ্ধত ও স্বেচ্ছাচারী ছিলেন। যাকে তিনি তাঁর সম্ভাব্য বিরোধী মনে করতেন তাকেই তিনি মৃত্যুদণ্ড দিতেন। পূর্বোক্ত পীর মুহম্মদকে তিনি আকবরের শিক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন।[৪] আকবরের উপর তাঁর ক্রমবর্ধমান প্রভাব দেখে বৈরাম তাঁকে বরখাস্ত করে মক্কায় পাঠিয়ে দেন। আকবর তাঁর অভিভাবকত্বে অসহিষ্ণু হয়ে উঠছিলেন। নিজের লোকদের দ্বারা বৈরাম সমস্ত দপ্তর পূর্ণ করেছিলেন। ফলে বৈরাম বিরোধী একটি চক্র রাজপ্রাসাদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল। এই চক্রে ছিলেন মাহম্ আনাঘা যিনি আকবরের ধাত্রীমাতা ছিলেন এবং যিনি কাবুলে কামরানের হাত থেকে আকবরকে রক্ষার জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়েছিলেন, তাঁর পুত্র আধম খান, দিল্লীর শাসক শিহাবুদ্দীন আহমদ খান, এমন কি খোদ সম্রাটের জননী হামিদাবানু। ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে আকবর আগ্রা থেকে দিল্লী গিয়ে সেখান থেকে বৈরামের পদচ্যুতির আদেশ দেন। বৈরাম বিরোধী ব্যক্তিরা তাঁদের লোকজন নিয়ে আকবরের পক্ষে যোগদান করেন। পীর মুহম্মদ তখনও মক্কায় যাননি, গুজরাতে অবস্থান করছিলেন। তিনিও একটি সৈন্যবাহিনী নিয়ে আকবরের পক্ষে হাজির হন। জলন্ধর জেলার গুণাবাউর নামক স্থানে বৈরাম পরাজিত হন এবং তিলওয়ারা দুর্গে আশ্রয় নেন। কিছুকাল অবরুদ্ধ থাকার পর বৈরাম আকবরের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। বৈরামকে কাল্পি ও চান্দেরীর জায়গীর প্রদান করা হয় এবং তাঁকে মক্কায় তীর্থযাত্রা করতে অনুমতি দেওয়া হয়। মক্কা যাবার প্রাক্কালে গুজরাতে পাটন নামক স্থানে যখন বৈরাম অপেক্ষা করছিলেন সেই সময় তিনি একজন আততায়ীর দ্বারা নিহত হন (৩১শে জানুয়ারি ১৫৬১)।

বৈরাম অপসৃত হলেও রাজ অন্তঃপুরের যে চক্রান্তকারীদের সহায়তায় আকবর তা করতে পেরেছিলেন, তারা এবার আকবরের উপর কর্তৃত্ব করার চেষ্টা করে। তবে তাদের চেষ্টা বিশেষ সফল হয়নি কেননা ইতিমধ্যেই আকবর স্বাধীন ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে চলছিলেন। ১৫৬১র মার্চ মাসে মাহম আনাঘার পুত্র আধম খান ও পীর মুহম্মদের নেতৃত্বে মালব, খান্দেশ ও বেরারে মুঘল অভিযান প্রেরিত হয়। এই সকল স্থানে উভয়ে সীমাহীন নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করেছিলেন। নারী ও শিশুদের দলে দলে হত্যা করা হয়েছিল এমন কি কোরাণ নকলরত ধার্মিক পণ্ডিতরাও রেহাই পাননি। ওই বছরেই খান জামান ও তাঁর ভাই বাহাদুর খান জৌনপুরে আফগান

বাহিনীকে পরাজিত করেছিলেন এবং নিষ্ঠুরতার চূড়ান্ত করেছিলেন। আকবর এই নিষ্ঠুরতা অনুমোদন করেননি। আধম খানকে তিনি শাস্তি দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মাহম আনাঘার অনুরোধে নিবৃত্ত হন। ১৫৬১-র নভেম্বরে তিনি মাহম আনাঘার মতের বিরুদ্ধে আতগা খানকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। ১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দে আকবর আজমীরে খাজা মইনুদ্দীন চিশতীর সমাধি পরিদর্শন করতে যান। পথে অম্বরের রাজা বিহারীমল তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন এবং নিজ কন্যার সঙ্গে আকবরের বিবাহ দেন। এই কন্যাই জাহাঙ্গীরের গর্ভধারিণী। অম্বর থেকেই মানসিংহ আকবরের অধীনে চাকুরি গ্রহণ করেন। এই ঘটনাটি আকবরের জীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা এখান থেকেই তৈরী হয়েছিল।

আতগা খানকে প্রধানমন্ত্রীর পদে নিয়োগ করায় অন্তঃপুরের মাহম আনাঘা গোষ্ঠী ক্রুদ্ধ হয় এবং আধম খান আকবরকে খতম করার পরিকল্পনা করেন। ১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ মে রাত্রিতে আধম খান আকবরের অনুগত সামসুদ্দীনকে প্রকাশ্যে হত্যা করেন, এবং আকবরকে হত্যার উদ্দেশ্যে তাঁর শয়নকক্ষে প্রবেশ করেন। আকবর তাঁকে মুষ্ট্যাঘাতে ভূতলশায়ী করেন এবং তার আদেশে আধমকে দোতলার বারান্দা থেকে মাটিতে ফেলে হত্যা করা হয়। এই ঘটনার চল্লিশ দিন পরে মাহম আনাঘাও মারা যান। সম্ভাব্য চক্রান্তকারীদের আকবর বিদ্রোহী গক্করদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য পাঠিয়ে দেন। অতঃপর তিনি সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতে গ্রহণ করেন। ১৫৬২তে তিনি যুদ্ধবন্দীদের ক্রীতদাসরূপে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ করেন। ওই বছরেই তিনি ইসলাম শাহ শূর নামক একজন যোগ্য ব্যক্তির হাতে শাসনকার্যে ত্রুটিবিচ্যুতি অনুসন্ধান ও দুর্নীতি দমনের দায়িত্ব দেন। ১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হিন্দুদের উপর তীর্থ কর তুলে দেন এবং ১৫৬৪তে তিনি জিজিয়া কর প্রত্যাহার করেন। মাত্র আট বছরের মধ্যে আকবর যে কতখানি স্বাতন্ত্র ও প্রভূত্বের অধিকারী হয়েছিলেন, এগুলি তারই নিদর্শন।

২ ॥ রাজ্যবিস্তার : প্রথম পর্যায়

১৫৬২-র মধ্যে আজমীর, গোয়ালিয়র, জৌনপুর এবং মালব আকবরের অধীনে এসেছিল। ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দে আকবর আসফ খানকে গণ্ডোয়ানা জয়ের জন্য প্রেরণ করেন। এই দেশটি ছিল বর্তমান মধ্যপ্রদেশের পূর্বদিকে অবস্থিত। এখানে মহোবার চন্দেল বংশীয় বীর নারায়ণ ছিলেন শাসক, যিনি নাবালক হবার দরুন তাঁর

মা দুর্গাবতীর অভিভাবকত্বে রাজত্ব করছিলেন। রাণী দুর্গাবতী বিপুল বিক্রমে মুঘলদের প্রতিরোধ করেছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়ে তিনি আত্মঘাতী হন। এই যুদ্ধটি ঘটেছিল নারহি নামক স্থানে। আসফ খান গণ্ডোয়ানার রাজধানী চৌরাগড়ে আরও একটি যুদ্ধে বীর নারায়ণকে পরাস্ত করেন।

ওই বছরেই আকবরকে উজবেক আমীরদের বিদ্রোহের সম্মুখীন হতে হয়। প্রথম বিদ্রোহ করেন মালবের আবদুল্লা খান। ১৫৬৪-র জুলাই মাসে নারওয়ারের মধ্য দিয়ে মাণ্ডুতে আসেন এবং আবদুল্লা গুজরাতে পালিয়ে যান।. আকবর কারা বাহাদুর খানকে মালবের শাসক নিযুক্ত করে ৯ই অক্টোবর তারিখে আগ্রা ফিরে আসেন। এরপর তিনজন শক্তিশালী উজবেগ আমীর খান জমান, ইস্কিন্দার খান ও ইব্রাহিম খান পরিকল্পিত উপায়ে ১৫৬৫-র গোড়ার দিকে কনৌজ অভিযান করেন এবং সীতাপুর জেলার নিমখার নামক স্থানে মুঘল বাহিনীকে পরাজিত করেন। ২৪শে মে তারিখে আকবর কনৌজে উপস্থিত হন এবং সেখান থেকে লখনউ অভিমুখে তিনি অগ্রসর হলে ইস্কিন্দার খান লখনউ ছেড়ে পালিয়ে যান। খান জমানও মানিকপুরের অবরোধ উঠিয়ে নিয়ে পূর্বদিকে পলায়ন করেন এবং অপরাপর বিদ্রোহী উজবেকদের সঙ্গে হাজিপুরে মিলিত হন এবং সেখান থেকে রোটাসের আফগানদের ও বঙ্গদেশের সুলেমান করনানীর সাহায্য প্রার্থনা করেন। আকবর জৌনপুর চলে আসেন এবং সেখান থেকে উড়িষ্যার রাজা মুকুন্দদেবকে অনুরোধ করেন যদি সুলেমান করনানী বিদ্রোহীদের সাহায্য করেন তাহলে যেন তিনি তদ্দণ্ডে সুলেমানকে আক্রমণ করেন। শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহী উজবেকরা আকবরের বশ্যতা স্বীকার করে। ১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দে উজবেকরা আবার বিদ্রোহী হয় এবং কাবুলের শাসককে ভারত আক্রমণে উদ্বুদ্ধ করে। ১৫৬৬র নভেম্বরে যখন আকবর পাঞ্জাবে নিজ ভ্রাতা মীর্জা হাকিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন সেই সুযোগে খান জমান কনৌজের নিকটবর্তী শেরগড় দুর্গ অবরোধ করেন। অপর উজবেক বিদ্রোহী বাহাদুর খান মানিকপুরে মুঘল সেনাপতিদ্বয় আসফ খান ও মজনুন খানকে আক্রমণ করেন, এবং ইস্কান্দার ও ইব্রাহিম অবধ দখল করতে এগিয়ে যান। আকবর রাজা ভগবান দাস ও মুজফ্‌ফর খানের সহায়তায় এই উজবেগ বিদ্রোহীদের নানাস্থানে পরাজিত করেন। খান জমান নিহত হন, বাহাদুর শাহ ও অপরাপর নেতাদের প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। উজবেগ বিদ্রোহ দমন করে আকবর ১৫৬৭তে আগ্রায় ফিরে আসেন। এরপর আকবরকে মীর্জাগোষ্ঠীর কয়েকটি বিদ্রোহ দমন করতে হয়। এই গোষ্ঠী

তৈমুরবংশীয়দের দ্বারা গঠিত ছিল, এবং এদের নেতা ছিলেন মুহম্মদ সুলতান মীর্জা। এই বিদ্রোহীদের প্রধান কেন্দ্র ছিল মালব। ১৫৬৭র সেপ্টেম্বরে এই বিদ্রোহ দমিত হয়। বিদ্রোহীরা গুজরাতে পলায়ন করে।

ওই বছরই আকবর চিতোর অভিযান করেন। ১৫৬৭র ২৩শে অক্টোবর তারিখে আকবর চিতোরের নিকটে সৈন্য সমাবেশ করেন। মেবারের রাণা আরাবল্লী পাহাড়ের দুর্গম স্থানে আত্মগোপন করেন, বেন্দোলের জয়মলের অধীনে চিতোর রক্ষার দায়িত্ব দিয়ে। প্রায় চার মাস চিতোর দুর্গ দখলের ব্যর্থ চেষ্টার পর, একদিন আকস্মিকভাবে আকবরের গুলিতে জয়মলের মৃত্যু ঘটলে চিতোরের প্রতি-রক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে (২৩শে ফেব্রুয়ারি)। এরপর কৈলওয়ার পত্ত চিতোর রক্ষার দায়িত্ব নেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মুঘল বাহিনী চিতোরে প্রবেশ করে এবং প্রায় তিরিশ হাজার নাগরিককে নিহত করে। মেবারের শাসনভার আসফ খানের উপর ন্যস্ত করে আকবর ২৮শে ফেব্রুয়ারি তারিখে চিতোর পরিত্যাগ করেন, এবং আজমীর হয়ে আগ্রা ফিরে আসেন ১লা এপ্রিল তারিখে।

১৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আকবর রণথম্ভোর দুর্গ অধিকারের জন্য সেখানে সৈন্য সমাবেশ করেন। এই দুর্গটি বুন্দি সর্দার রায় সুর্জন হারের অধীন ছিল। একমাস অবরুদ্ধ থাকার পর সুর্জন আকবরের অধীনতা স্বীকার করেন। তাঁকে দু'হাজারী মনসবদারের পদ দেওয়া হয় এবং প্রথমে গণ্ডোয়ানা ও পরে বারানসীর শাসক নিযুক্ত করা হয়। প্রত্যাবর্তনের পথে আকবর তাঁর সেনাপতি মজনুন খানকে কালঞ্জর দুর্গ অধিকার করার জন্য পাঠান। দুর্গাধিপতি রাজা রামচাঁদ বাঘেল প্রায় বিনাযুদ্ধেই বশ্যতা স্বীকার করেন। তাঁকে এলাহাবাদে একটি জায়গীর দেওয়া হয়, কালঞ্জরের ভারপ্রাপ্ত হন মজনুন খান স্বয়ং। ১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে আকবর যখন নগোরে অবস্থান করছিলেন যোধপুরের রাজা মালদেবের পুত্র চন্দ্রসেন, বিকানীরের রাজা কল্যাণমল ও তাঁর পুত্র রাই সিং এবং জয়শলমীরের রাজা রাওয়াল হর রাই স্বেচ্ছায় তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন। মালবের পলাতক প্রাক্তন শাসক বাজ বাহাদুরও তাঁর আনুগত্য স্বীকার করেন। ১৫৭১-এ আকবর ফতেপুর সিক্রীতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন।

মালব ও রাজস্থান অধিকার করার পর স্বাভাবিকভাবেই আকবরের দৃষ্টি গুজরাতের উপর পতিত হয়। সেখানকার সুলতান তৃতীয় মুজফ্‌ফর শাহ ক্ষমতালোভী আমীরদের হাতের ক্রীড়ণকে পরিণত হয়েছিলেন। আকবরের গুজরাত অভিযানের

কয়েকটি কারণ ছিল। প্রথমত বিদ্রোহী মীর্জারা গুজরাতে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল যাদের দমন করার প্রয়োজন ছিল। দ্বিতীয়ত গুজরাত ছিল সমুদ্রপথে ভারতের সঙ্গে বাইরের দেশের যোগাযোগের ক্ষেত্র। তৃতীয়ত পোর্তুগীজদের ক্রিয়াকলাপের উপর নজর রাখার জন্য গুজরাত মুঘল অধিকারে থাকার প্রয়োজন ছিল। এবং চতুর্থত গুজরাতের কিছু আমীর আকবরের হস্তক্ষেপ চাইছিলেন। ১৫৭২এর ৭ই নভেম্বর তিনি পাটন পৌঁছান এবং সেখান থেকে আমেদাবাদ। প্রায় বিনা বাধাতেই এই সকল স্থান অধিকৃত হয়। ৮ই ডিসেম্বর আমেদাবাদ ত্যাগ করে তিনি ক্যাম্বেতে হাজির হন। এখান থেকে তিনি বিদ্রোহী মীর্জাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। এই বিদ্রোহীদের মধ্যে ইব্রাহিম হুসেন বরোদায়, মুহম্মদ হুসেন সুরাটে এবং শাহ মীর্জা চাম্পানেরে ঘাঁটি করেছিলেন। ১৫৭৩-এর জানুয়ারির মধ্যে এই বিরোধী শক্তিগুলি পরাজিত হয়। গুজরাতের শাসনভার খান আজমের উপর ন্যস্ত করে তিনি প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু কয়েকমাস পরেই গুজরাত আবার অশান্ত হয়ে ওঠে। পলাতক বিদ্রোহীরা বিক্ষুব্ধ আমীরদের সহায়তায় সুরাট, ব্রোচ, ক্যাম্বে ও আমেদাবাদ দখল করে নেয়। আগস্ট থেকে অক্টোবর পর্যন্ত এই সকল বিদ্রোহ দমন করার জন্য আকবরকে ব্যস্ত থাকতে হয়। গুজরাতের মত একটি বাণিজ্যনির্ভর দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পাকা করার জন্য আকবর তোডরমলকে সেখানে প্রেরণ করেন।

এরপর প্রায় এক বছর আকবর শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের কাজে ব্যস্ত ছিলেন, এবং তাঁর সবচেয়ে প্রয়োজন ছিল অধিকৃত সাম্রাজ্যের সংহতি আনয়ন। কিন্তু এদিকে পূর্বদিকে অশান্তির সূত্রপাত ঘটে। ১৫৭২ পর্যন্ত বঙ্গদেশের সুলতান সুলেমান করনানী আকবরের অনুগত ছিলেন, কিন্তু ওই বছরে তিনি মারা গেলে তাঁর পুত্র দাউদ মুঘল অধিকার অস্বীকার করে গাজিপুর জেলার জমানিয়া দুর্গ দখল করেন। আকবর দাউদের বিরুদ্ধে মুনিম খানকে পাটনায় প্রেরণ করেন কারণ দাউদ পাটনায় ঘাঁটি করেছিলেন। আকবর আর একটি বাহিনী পাঠিয়ে পাটনার অপর তীরের হাজিপুর দখল করেন। পাটনায় থাকা নিরাপদ নয় বুঝে দাউদ উড়িষ্যায় পলায়ন করেন। ১৫৭৪-এর আগস্ট মাসে পাটনা, সুরজগড়, মুঙ্গের, ভাগলপুর ও কোলাগাঙ্গ মুঘলদের অধীনে আসে এবং মুনিম খান তেলিয়াগরহির মধ্য দিয়ে দাউদের রাজধানী তান্দায় হাজির হন ২৫শে সেপ্টেম্বর। এরপর ঘোড়াঘাট (দিনাজপুর-বগুড়া), সাতগাঁ (হুগলী) এবং বর্ধমান মুঘলদের অধীনে আসে। মুঘলবাহিনী, বিশেষ করে মুনিম খান, আর অগ্রসর হতে রাজি হন না। পক্ষান্তরে তোডরমল বিপরীত মত

পোষণ করেন, এবং তাঁরই উৎসাহে মুঘলবাহিনী দাউদের অন্বেষণে যাত্রা করে। মেদিনীপুরের দাঁতনের নয় মাইল দক্ষিণ পূর্বে তুকারোই নামক স্থানে দাউদের সঙ্গে মুঘলদের তুমুল যুদ্ধ হয় ১৫৭৫-এর ৩রা মার্চ তারিখে। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে দাউদ কটকে পলায়ন করেন এবং সেখান থেকে ১২ই এপ্রিল তারিখে মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার করেন। এদিকে মুনিম খান জলা-জায়গা তান্দা থেকে বাঙ্গলার রাজধানী গৌড়ে স্থানান্তরিত করেন, কিন্তু সেখানকার জলবায়ু মুঘলদের সহ্য না হওয়ার দরুন মড়ক দেখা দেয়, স্বয়ং মুনিম খানও মারা যান, এবং মুঘলবাহিনী ভাগলপুরে পলায়ন করে। এই সুযোগে দাউদ পুনরায় বঙ্গদেশ দখল করেন। তখন আকবর পাঞ্জাবের শাসক খান জাহান ও তোড়রমলকে বঙ্গদেশে পাঠান। ১৫৭৬-এর ১২ই জুলাই তারিখে রাজমহলের যুদ্ধে দাউদ মুঘলদের হাতে পরাজিত ও নিহত হন।

এদিকে মেবারের রাণা উদয়সিংহের পুত্র প্রতাপসিংহ উদয়পুর, কুম্ভলগড় ও গোগুণ্ডায় ক্ষমতা সঞ্চয় করেছিলেন এবং চিতোর পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনা করেছিলেন। তাঁকে বাড়তে না দেবার অভিপ্রায়ে আকবর ১৫৭৬-এর এপ্রিলে রাজা মানসিংহ ও আসফ খানকে তাঁর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। মুঘল বাহিনী মণ্ডলগড়ের মধ্য দিয়ে গোগুণ্ডা পর্যন্ত অগ্রসর হবার মুখে হলদিঘাট নামক গিরিপথে প্রতাপসিংহ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয়। ২১শে জুন তারিখে উভয় বাহিনীর মধ্যে তুমুল সংগ্রামের পর প্রতাপ পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন। গোগুণ্ডা মুঘল অধিকারে আসে। সিরোহি, ইদার, বনস্‌ওয়ারা, ডুঙ্গরপুর, ওর্ছা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজপুত রাজ্যগুলি মানসিংহের প্রচেষ্টায় মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার করে। ১৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে আকবর সাহবাজ খানকে প্রতাপসিংহের বিরুদ্ধে পুনরায় প্রেরণ করেন। মুঘলবাহিনী কেলওয়ারা, কুম্ভলগড় ও গোগুণ্ডায় প্রবেশ করলে রাণা চবন্দ নামক স্থানে আত্মগোপন করেন। অতঃপর সুযোগ বুঝে তিনি কুম্ভলগড় পুনরুদ্ধার করেন এবং বনসওয়ারা ও ডুঙ্গর-পুরের উপর কর্তৃত্ব বিস্তার করেন। সাহবাজ খান তাঁকে দমন করতে ব্যর্থ হন। ১৫৮৪ খ্রীষ্টাব্দে আকবর রাণার বিরুদ্ধে জাফর বেগ ও জগন্নাথকে প্রেরণ করেন, কিন্তু তাঁরাও ব্যর্থ হন। ১৫৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পূর্বে রাণা প্রতাপ আজমীর, চিতোর ও মণ্ডলগড় ছাড়া তাঁর হৃতরাজ্যের সবটাই পুনরুদ্ধার করেছিলেন। ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে আকবর রাজকুমার সলিম ও রাজা মানসিংহকে প্রতাপের উত্তরাধিকারী অমর সিংহের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। মুঘল বাহিনী জয়লাভ করলেও এই অভিযান মধ্য পথে পরিত্যক্ত হয়।

৩॥ আকবরের উত্তর ভারতে প্রতিষ্ঠা

ষোড়শ শতকের সপ্তম দশকের মধ্যেই আকবর উত্তর ভারতের সবটাই দখল করেছিলেন এতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু দখল করা এক জিনিস ও তা বজায় রাখা আর এক জিনিস। বঙ্গদেশ, কাবুল ও গুজরাত বারবার বিদ্রোহী হয়েছিল। আকবর বঙ্গদেশে মুজফ্‌ফর খান তুর্বতীকে শাসক হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁর অবিবেচক শাসনে মুঘল পদাধিকারীরাই বঙ্গদেশ ও বিহারে বিদ্রোহ করে। তারা আকবরকে বিধর্মী বলে ঘোষণা করে এবং তান্দা অধিকার করে'। মুজফ্‌ফরকে তারা বন্দী ও নিহত করে। রাজকীয় বাহিনী ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে এই বিদ্রোহ দমন করে। রোটাসের মুহিব আলি খান তিরহুত থেকে বিদ্রোহী বাহাদুর বদকশীকে বিতাড়িত করেন। তোডরমল মুঙ্গের থেকে বিদ্রোহীদের উৎখাত করেন, সাহাবাজ খান অবধ পুনর্দখল করেন। ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে যখন খান আজম বঙ্গদেশের শাসনকর্তা তখন একটি বিদ্রোহী গোষ্ঠী হাজিপুর দখল করে। ১৫৮৩-র মার্চ মাসে খান আজম হাজিপুর পুনর্দখল করেন। বঙ্গদেশের পরবর্তী মুঘল শাসক শাহবাজ খান বিদ্রোহী মাসুম কাবুলিকে পরাজিত করে বিক্রমপুর পর্যন্ত তাড়া করেন, কিন্তু সেখানকার স্থানীয় শাসক ইসা খান মুঘলবাহিনীকে ১৫৮৪ খ্রীষ্টাব্দে পরাজিত করে তান্দায় ফেরত পাঠিয়ে দেন। ১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দে আকবর ইসা খানকে দমনের জন্য একটি বিরাট বাহিনী পাঠান কিন্তু সেনাপতিদের পারস্পরিক বিরোধের জন্য সেই অভিযান বিশেষ কার্যকর হয়নি। এদিকে উড়িষ্যা থেকে সুযোগ বুঝে বিদ্রোহীরা আবার তৎপর হয়, এবং বিদ্রোহী নেতা দস্তম কাকশাল ঘোরাঘাট অবরোধ করেন। ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে শাহবাজ খান কূটনীতির প্রয়োগে বিদ্রোহীদের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করেন এবং ইসা খানকে অপরদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেন। বাধ্য হয়ে ইসা খান মুঘলদের সঙ্গে সন্ধি করেন। অপর বিদ্রোহী মাসুদ কাবুলি নিজ পুত্রকে মুঘল দরবারে পাঠিয়ে দিয়ে মক্কা যাত্রা করেন। ১৫৮৬-র মধ্যে বঙ্গদেশের বিদ্রোহ দমিত হয়।

কাবুল নিয়ে আকবরকে প্রচুর ঝামেলা পোহাতে হয়। আকবরের ভাই মীর্জা হকীম উত্তরাধিকার সূত্রে কাবুলের অধিকার পেয়েছিলেন, ও তাঁর শ্বশুর মীর্জা সুলেমানের হাতের ক্রীড়নক হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু সুলেমান নিজেই রাজক্ষমতা দখলের জন্য কাবুল অভিযান করেন, এবং বাধ্য হয়েই মীর্জা হকীম আকবরের সাহায্য চান। খান কলানের নেতৃত্বে আকবরের বাহিনী তাঁকে ১৫৬৬ খ্রীষ্টাব্দে কাবুলে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে। ১৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দে আকবর মীর্জা হকীমের আনুগত্য চেয়ে কাবুলে দূত পাঠান,

কিন্তু হকীম তাতে কোন সাড়া দেননি। উপরন্তু বঙ্গদেশের বিদ্রোহীদের কাছ থেকে অনুরোধ পেয়ে, এবং আগ্রা-দিল্লীতে আকবর-বিরোধী তাঁর কিছু সমর্থক আছে জেনে তিনি ১৫৮০-৮১ খ্রীষ্টাব্দে তিনবার পাঞ্জাব আক্রমণ করেন কিন্তু মানসিংহের নিকট পরাজিত হয়ে ফিরে যান।

এদিকে ১৫৮১-র ফেব্রুয়ারিতে আকবর হকীমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন এবং সিরহিন্দে পৌঁছে খবর পান যে হকীম কাবুলে প্রত্যাবর্তন করেছেন। অতঃপর মানসিংহের অধীনে একটি বিরাট বাহিনী কাবুল অভিমুখে প্রেরিত হয় এবং আকবর স্বয়ং আর একটি বাহিনীর নেতৃত্ব নেন। মানসিংহের বাহিনী খুর্দ নামক স্থানে হকীমকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করলে তিনি ঘুরবন্দে পালিয়ে যান। ১৫৮১-র ১০ই আগস্ট আকবর কাবুলে প্রবেশ করেন। হকীমকে তিনি মার্জনা করে কাবুলের শাসক নিযুক্ত করেন। কাবুল নিয়ে পরেও আকবরের অশান্তি হয়েছিল। ১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দে হকীম মারা গেলে কাবুল হিন্দুস্থানের বাদশাহীর সঙ্গে সংযুক্ত হয়।

গুজরাতেও মুঘলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু হয়। প্রাক্তন সুলতান তৃতীয় মুজফ্‌ফর ১৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দে মুঘল বন্দীশালা থেকে পালিয়ে আসেন এবং গুজরাতী সামরিক পদাধিকারীদের সহযোগিতায় ব্যাপক বিদ্রোহের সৃষ্টি করেন। ১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আমেদাবাদ দখল করেন। এরপর ব্রোচ তাঁর করতলগত হয়। গুজরাতের জনসাধারণও তাঁর পক্ষে যোগ দেয়। ১৫৮৪ খ্রীষ্টাব্দে আকবর গুজরাত পুনর্দখলের জন্য মীর্জা খানকে প্রেরণ করেন। নান্দোদে মীর্জা খান মুজফ্‌ফরকে পরাজিত করলেও দশ বছর মুজফ্‌ফর পালিয়ে বেড়ান। শেষ পর্যন্ত ১৫৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কচ্ছে ধরা পড়েন, কিন্তু আত্মসমর্পণ না করে আত্মহত্যা করে সম্মান বাঁচান।

আকবরের কাশ্মীর জয়ের কথা পূর্বে বলা হয়েছে। ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে কাশ্মীরের সিংহাসনের বিতাড়িত দাবিদার ইউসুফের সমর্থনে আকবর একটি বাহিনী প্রেরণ করেন, কিন্তু ইউসুফ নিজ শক্তিতেই কাশ্মীর দখল করতে সমর্থ হন। এটা আকবরের পছন্দ হয়নি। ১৫৮১তে কাবুল থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে আকবর মীর্জা তাহির ও শালি আকিলকে কাশ্মীরে দূত হিসাবে পাঠান। ইউসুফ তাঁদের রাজকীয় সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করেন এবং নিজপুত্র হায়দারকে আকবরের রাজসভায় প্রেরণ করেন। ১৫৮৪ খ্রীষ্টাব্দে আকবর ইউসুফকে তাঁর রাজসভায় হাজির হতে বলেন, কিন্তু ইউসুফ তাঁর পুত্র ইয়াকুবকে পরিবর্ত হিসাবে প্রেরণ করেন। সম্ভবত ইউসুফ আকবরের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হয়েছিলেন। ১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিনে আকবর রাজা ভগবান

দাস ও মীর্জা শাহ্ রুকের নেতৃত্বে একটি বাহিনী কাশ্মীর দখলের জন্য পাঠান। ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে ফেব্রুয়ারি ইউসুফ রাজা ভগবান দাসের নিকট বশ্যতা স্বীকার করেন। কিন্তু তাঁর পুত্র ইয়াকুব বশ্যতা স্বীকারে রাজি না হয়ে অনুগতদের সাহায্যে মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে পরাজিত হন এবং আকবরের আনুষ্ঠানিক আনুগত্য মানতে রাজি হন। ইউসুফ ভগবান দাসের সঙ্গে আকবরের রাজসভায় আসেন, এবং তাঁর নিরপত্তার প্রতিশ্রুতি সত্বেও আকবর তাঁকে বন্দী করে রাখার নির্দেশ দেন। ইয়াকুবের বিরুদ্ধে মুঘল বাহিনী পুনরায় প্রেরিত হয়। ১৫৮৯ পর্যন্ত ব্যর্থ প্রতিরোধ করে ইয়াকুব আত্মসমর্পণ করেন ও কাশ্মীর মুঘল সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত হয়।

মীর্জা হকীমের মৃত্যুর পর কাবুল আকবরের রাজ্যভূক্ত হলে আকবর উত্তর পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের উপজাতীয়দের বশীভূত করার চেষ্টা করেন। মূলত সোয়াট ও বাজৌর অঞ্চলের বিভিন্ন উপজাতি, বিশেষ করে রোশনাই, মন্দার, ইউসুফজাই প্রভৃতিরা, কাবুল ও ভারতের মধ্যবর্তী অঞ্চলে নানা ধরনের অশান্তির সৃষ্টি করেছিল। এদের বিরুদ্ধে জৈন খান, রাজা বীরবল ও হকীম আবুল ফথ ১৫৮৫-৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ব্যর্থ হন ও বীরবল নিহত হন। শেষ পর্যন্ত আকবর তোডরমল ও মানসিংহকে প্রেরণ করেন। তাঁরা কয়েকটি যুদ্ধে জয়লাভ করলেও ১৬০২ পর্যন্ত সীমান্ত সমস্যা থেকেই গিয়েছিল। ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে আকবরের নির্দেশে মুলতানের শাসক খান খানান আবদুর রহিম সিন্ধুদেশ আক্রমণ করেন। ১৫৯১-এর অক্টোবরে তিনি সেহওয়ান জয় করেন, এবং তারপর তট্টা। সিন্ধুর সুলতান জানি বেগ আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন, এবং ১৫৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ব্যক্তিগত ভাবে মুঘল দরবারে হাজির হন। তিনি আকবর প্রবর্তিত দীন-ই-ইলাহী ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে বালুচিস্তান আকবরের অধীনে আসে।

১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যা জয়ের জন্য মুঘলবাহিনী ভাগলপুর ও বর্ধমানের মধ্য দিয়ে হুগলীর জাহানাবাদ বা আরামবাগে উপস্থিত হয়। উত্তর উড়িষ্যার শাসক কুতলু খান লোহানী মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহকে পরাজিত করেন। কিন্তু কুতলুর আকস্মিক মৃত্যুর ফলে এবং আফগানদের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের জন্য তাঁর নাবালক পুত্র নাসির খানের তরফ থেকে আকবরের নিকট বশ্যতা স্বীকার করা হয়। কিন্তু ওই বছরেই নাসির খান মারা গেলে আফগানরা মুঘলদের সঙ্গে সন্ধির শর্তাবলী প্রত্যাখ্যান করে জগন্নাথ মন্দিরসহ পুরী দখল করে। ১৫৯২র ১৮ই এপ্রিল মান-সিংহের হাতে বেনাপুরের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পলায়ন তারা করে। মুঘল বাহিনী

কটক দখল করে। উড়িষ্যার সামন্তরাজারা আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন। একমাত্র খুরদার রাজা রামচন্দ্রদেব শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করে ১৫৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মানসিংহের বশ্যতা স্বীকার করেন।

৪॥ আকবরের দাক্ষিণাত্য অভিযান

১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দে খান্দেশের দ্বিতীয় মুবারক শাহ মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন। পরবর্তী সুলতান দ্বিতীয় মুহম্মদও (১৫৬৬-৭৬) এই ধারা বজায় রাখেন। ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে খান্দেশের সুলতান রাজা আলি খান মুঘলদের অধিকার অস্বীকার করেন ও শাহ উপাধি গ্রহণ করেন। আকবর তাঁর বিরুদ্ধে শিহাবুদ্দীন আহমদ খানকে প্রেরণ করেন, এবং রাজা আলি খান ভীত হয়ে আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন।

আহমদনগরের সুলতান মুর্তাজা নিজাম শাহের মন্ত্রী সলাবৎ খানের স্বেচ্ছাচারিতায় উত্যক্ত হয়ে কয়েকজন আমীর আকবরের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেন। ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে আকবর বেরার আক্রমণ করে ইলিচপুর লুণ্ঠন করেন, কিন্তু চন্দুরের যুদ্ধে খান্দেশের রাজা আলি খান ও আহমদনগরের নিজাম শাহের যুগ্মবাহিনীর নিকট ব্যর্থ হয়ে প্রত্যাবর্তনে বাধ্য হন।

১৫৮৮র ১৪ই জুন আহমদনগরের মুর্তাজা নিজাম শাহ নিজপুত্র হুসেন কর্তৃক নিহত হন। হুসেন ১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল আমীরগণ কর্তৃক নিহত হন যাঁরা আকবরের রাজসভায় আশ্রিত মুর্তাজা নিজামের ভাই বুরহানউদ্দীনের পুত্র ইসমাইলকে সুলতান হিসাবে ঘোষণা করেন। এখন বুরহানের স্বয়ং সুলতান হবার পথ হয়, এবং আকবরের সহায়তায় তিনি সিংহাসন দখল করেন এবং বুরহান নিজাম শাহ উপাধি গ্রহণ করেন (মে, ১৫৯১)। ইসমাইল বন্দী হন।

কিন্তু বুরহান মুঘলদের অধীনতা অস্বীকার করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১৫৯৩ খ্রীষ্টাব্দে আকবর খান্দেশ, আহমদনগর, বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সুলতানদের কাছে বশ্যতা চেয়ে দূত পাঠান, আহমদনগর বাদে সকল রাজ্যই তাঁর দাবি মোটামুটি মেনে নেয়। তখন আকবর খান খানান, সুলতান মুরাদ, শাহ রুক এবং শাহবাজ খানের নেতৃত্বে আহমদনগরের বিরুদ্ধে একটি বাহিনী পাঠান। কিন্তু এই প্রধানরা নিজেদের মধ্যে বিরোধ করায় আহমদনগর আক্রমণে যথেষ্ট বিলম্ব ঘটে।

এদিকে আহমদনগরে বুরহান নিজাম শাহ ১৫৯৫-র এপ্রিলে মারা যান। তাঁর

জ্যেষ্ঠপুত্র ইব্রাহিমও কয়েক মাসের মধ্যে মারা যান। ইব্রাহিমের নাবালক সন্তান বাহাদুরকে মিয়াঁ মনঝু নামক আমীর গোষ্ঠীর একজন নেতা বন্দী করে আহমদ নামক এক যুবককে সুলতান বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু আহমদনগরের প্রাক্তন সুলতান প্রথম হুসেন নিজাম শাহের কন্যা চাঁদ সুলতান, যিনি বিজাপুরের সুলতান প্রথম আলি আদিল শাহের বিধবা ছিলেন, নাবালক ও বৈধ সুলতান বাহাদুরের পক্ষ অবলম্বন করেন। মিয়াঁ মনঝু তখন গুজরাতের মুঘল শাসক সুলতান মুরাদের সাহায্য চান। মুরাদ আহমদনগরের ষাট মাইল দূরে চন্দুরে হাজির হন এবং এখানে খান খানান এবং খান্দেশের রাজা আলি খান (অনিচ্ছুক চিত্তে) তাঁর সঙ্গে মিলিত হন। ১৫৯৫র ২৬শে ডিসেম্বর মুঘলবাহিনী আহমদনগর অবরোধ করে।

আহমদনগরের এই সংকট পূর্ণ মুহূর্তে চাঁদ সুলতান হাল ধরেন। তাঁর আবেদনে আমীররা এবং স্থানীয় শাসকেরা তাঁর পক্ষ অবলম্বন করেন। খান্দেশের রাজা আলি খান গোপনে তাঁকে সাহায্য করতে শুরু করেন। চাঁদ সুলতানের পক্ষ নিয়ে দৌলতাবাদ থেকে ইখলাস খান একটি বাহিনী নিয়ে আসেন কিন্তু সেই বাহিনী পৈঠানে মুঘলদের হস্তে পরাজিত হয়। অনুরূপভাবে দক্ষিণ থেকে আভঙ্গ খানের বাহিনীও বিপর্যস্ত হয়। এই সময় বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সুলতানদ্বয় আহমদগরের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসেন। বাধ্য হয়ে মুরাদ আহমদনগরের সঙ্গে সন্ধি করেন ১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে মার্চ তারিখে। সন্ধির শর্ত অনুযায়ী বেরার রাজ্যটি মুঘলদের হস্তে অর্পণ করা হয়, এবং মুঘলবাহিনী সেখানে আশ্রয় নেয়।

এদিকে চাঁদ সুলতান গোলকুণ্ডা ও বিজাপুরের বাহিনীর সাহায্যে বেরার থেকে মুঘলদের উৎখাত করার চেষ্টা করেন। সোনপেতের নিকট আস্তি নামক স্থানে ১৫৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই ও ৯ই ফেব্রুয়ারি উভয় পক্ষের তুমুল যুদ্ধে মুঘলরা জয়লাভ করলেও কিছু লাভ করতে পারেনি। ১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দে কয়েকটি খণ্ড যুদ্ধের দ্বারা মুঘলরা বেরারের অন্তর্গত গাউইল, নর্নাল, খেরলা প্রভৃতি কয়েকটি দুর্গ অধিকার করে। ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাতের শাসক রাজকুমার মুরাদ মারা যান এবং রাজকুমার দানিয়েল তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি ঢিমে তেতালা প্রকৃতির লোক হবার দরুন আহমদ নগরের মুঘল ক্রিয়াকলাপ প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। আহমদনগরের বাহিনী মুঘলদের পরাজিত করে বেরারের অন্তর্গত বির দুর্গ দখল করে।

এদিকে আহমদনগরেও প্রচণ্ড অন্তর্বিরোধ দেখা দিয়েছিল। আভঙ্গ খান চাঁদ সুলতানের বিপক্ষ হয়েছিলেন এবং অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে আভঙ্গকে বিতাড়িত

করার শর্তে চাঁদ সুলতান মুঘলদের বশ্যতা স্বীকারে রাজি হয়েছিলেন। ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারিতে রাজকুমার দানিয়েল খান্দেশের বুরহানপুরে বাহিনী নিয়ে আসেন। খান্দেশের সুলতান বাহাদুর আসিরগড় দুর্গে আশ্রয় নেন। ৮ই এপ্রিল তারিখে স্বয়ং আকবর মালব থেকে খান্দেশের বুরহানপুরে আসেন এবং পরদিনই তিনি আসিরগড় দুর্গ অবরোধ করার নির্দেশ দেন। আভঙ্গ খান মুঘল বাহিনীকে রুখতে গিয়ে পরাস্ত হয়ে জুন্নারে পালিয়ে যান। চাঁদ সুলতান মুঘলদের সঙ্গে সন্ধির পক্ষপাতী বলে একটি গোষ্ঠী তাঁকে হত্যা করে। ২৮শে আগস্ট তারিখে আহমদনগরের পতন ঘটে। আহমদনগরের পরিণতি দেখে বিজাপুরের সুলতান দ্বিতীয় ইব্রাহিম আদিল শাহ আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন। খান্দেশের সুলতান বাহাদুর আসিরগড় দুর্গ থেকে বেশ কিছুকাল মুঘলদের প্রতিরোধ করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ১৬০১ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারি তিনি আত্মসমর্পণ করেন। আসিরগড় দুর্গ অধিকার করতে আকবর বিশ্বাসঘাতকতার পথ অবলম্বন করেছিলেন। সন্ধির শর্ত আলোচনার নামে বাহাদুরকে নিজ শিবিরে ডাকিয়ে এনে জোর করে তাঁকে দিয়ে আসিরগড় দুর্গ সমর্পণের নির্দেশ লিখিয়ে নিয়েছিলেন।

খান্দেশ, বেরার ও আহমদনগরের কিছু অংশ নিয়ে আকবর দাক্ষিণাত্য প্রদেশ গঠন করেন। আহমদনগরের অপর অংশ নিজামশাহী বংশের দ্বিতীয় মুর্তাজা নিজাম শাহের হাতে থাকে।

৫॥ সলিমের বিদ্রোহ ও আকবরের মৃত্যু

শেষ জীবনে আকবর তাঁর পুত্র সলিমের বিদ্রোহের সম্মুখীন হয়েছিলেন। দাক্ষিণাত্যে আকবর ব্যস্ত থাকার সুযোগে সলিম ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাব ও আগ্রা দখল করার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাতে ব্যর্থ হয়ে বিহারে চলে যান এবং সেখানকার শাসন ক্ষমতা দখল করেন। আকবর দাক্ষিণাত্য থেকে প্রত্যাবর্তন করে সলিমের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে চান, কিন্তু এলাহাবাদ থেকে, যেখানে তিনি ঘাঁটি করেছিলেন, তিনি আকবরের সমস্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। শুধু তাই নয় স্বাধীনতা ঘোষণা করে সলিম নিজ নামে মুদ্রা প্রচলিত করেন। আকবর তখন আবুল ফজলকে সলিমের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। ১৬০২ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে আগস্ট সলিম বিদ্রোহী বুন্দেল প্রধান বীর সিংহের সহায়তায় আকস্মিকভাবে মুঘল বাহিনী-কে পরাজিত করে আবুল ফজলকে নিহত করেন। আবুল ফজলের মৃত্যুতে আকবর

শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন এবং সলিমকে যেভাবেই হোক না কেন ধরে আনার এবং চরম শাস্তি দেবার নির্দেশ দেন। শেষ পর্যন্ত নিজ স্ত্রীর মধ্যস্থতায় তিনি সলিমকে ক্ষমা করেন এবং ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবরে সলিমকে মেবারের রাণার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন, কিন্তু সলিম সে আদেশ অমান্য করে এলাহাবাদে চলে এসে মদ্য ও অহিফেনে ডুবে থাকেন। আকবরের অপর পুত্র দানিয়েল ১৬০৪ খ্রীষ্টাব্দে অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে মারা যান। আকবর সলিমকে শাস্তি দেবার জন্য এলাহাবাদ রওনা হন, কিন্তু তাঁর মাতার গুরুতর অসুখের সংবাদ শুনে এলাহাবাদ অভিযান বাতিল করে ফিরে আসেন। আকবরের মা ওই বৎসরই মারা যান। এদিকে আকবরের সেনাপতি মীর সদর জাহানের উপদেশে, এবং নিজপুত্র খুস্‌রব কর্তৃক ক্ষমতা দখল হয়ে যেতে পারে এই আশংকায় সলিম ১৫০৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই নভেম্বর আকবরের নিকট আত্ম-সমর্পণ করেন। তাঁকে দশ দিনের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৫-২৬ অক্টোবরের মধ্য রাত্রিতে আকবর মারা যান। মৃত্যুর পূর্বে তিনি সলিমকেই উত্তরাধিকারী করেছিলেন, যদিও মানসিংহ, খান আজম প্রভৃতি আমীররা সলিমের পুত্র খুস্‌রবের পক্ষপাতী ছিলেন।

৬॥ আকবরের শাসনব্যবস্থা, ধর্মনীতি ও বৈদেশিক নীতি

আকবরের গোটা জীবনটা যুদ্ধবিগ্রহে কাটলেও সুশৃংখল শাসনব্যবস্থা চালাবার জন্য তিনি নানা প্রচেষ্টা করেছিলেন। ১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইসলাম খান শূর নামক একজন যোগ্য ব্যক্তিকে খালিস বা সংরক্ষিত ও খাস জমিসমূহের উৎপন্ন ফসলের মালিকানা ও বিক্রয় প্রভৃতির ব্যাপারে প্রচলিত নানা দুর্নীতির তদন্ত ও প্রতিকার করার নির্দেশ দেন। ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মুজফ্‌ফর আলি তুর্বতীকে অর্থমন্ত্রীর পদে নিয়োগ করেন। এই ব্যক্তিটি বৈরাম খানের সময়ে বিভিন্ন পরগণার রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে আকবর বিভিন্ন প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থায় নানা পরিবর্তন ঘটান। ১৫৭৩-এ ভূমি ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আকবর পুরাতন ব্যবস্থার বদল ঘটান। পুরাতন জায়গীরদারী প্রথার পরিবর্তে আকবর মনসবদারী প্রথার প্রবর্তন করেন যার ফলে একটি সুগঠিত আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার প্রত্যক্ষ ভাবে সকল ক্ষমতার মূল উৎস হয়ে ওঠে। অর্থনৈতিক সংস্কারের ক্ষেত্রে আকবর তোডরমলের বিশেষ সহায়তা পেয়েছিলেন। তবে পূর্ববর্তী যুগের মত গোটা মুঘল যুগের অর্থনীতি ছিল ভূমিনির্ভর, এবং সেই

হিসাবে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাঠামো ছিল সামন্ততান্ত্রিক, যদিও অপূর্ণ। আকবর এই সামন্ততন্ত্রকে অনিবার্য কারণেই মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন, কেননা উৎপাদন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে মুঘল আমলে এমন কোন গুণগত পরিবর্তন আসেনি যা অন্য কোন নূতন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সূচনা করতে পারত। আকবর এক্ষেত্রে যা করতে পেরেছিলেন তা ছিল স্থানীয় সামন্তরাজা, ভূম্যধিকারী বা জায়গীরদারদের সামরিক ক্ষমতার হ্রাস এবং তাদের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের অধিকতর প্রভাবের বিস্তার।

ধর্ম সম্পর্কে আকবরের প্রবল ব্যক্তিগত অনুসন্ধিৎসা ছিল। তাঁর পূর্ববর্তী অনেক সুলতানই শাসনের সঙ্গে ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাসকে জড়িয়ে ফেলেন নি, এবং অ-মুসলমানদের তথা অমুস্লীদের ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে কোন বাধা না দিয়ে রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁদের সঙ্গে আকবরের তফাৎ ছিল এই যে পরধর্মের প্রতি আকবরের সহিষ্ণুতা কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের উপায় ছিল না, এই সহিষ্ণুতা তাঁর ব্যক্তিগত ধর্মবোধ সঞ্জাত। যৌবনে ইসলাম ধর্মের সুফী মতবাদের প্রভাবে তিনি পরমসত্তার সঙ্গে ব্যক্তির মানসিক সম্পর্কে স্থাপন এবং তজ্জনিত অদ্বয়-বোধকেই শ্রেষ্ঠ ধর্মাচরণ বলে মানতেন, এবং এঁর ফলে তিনি খ্রীষ্টীয় জরথুষ্ট্রীয়, হিন্দু, শিখ ও জৈনধর্ম সম্পর্কে রীতিমত উৎসাহী ছিলেন। পোর্তুগীজ জেসুইট ফাদাররা তাঁকে খ্রীষ্টধর্মের অনুরাগী হিসাবে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সেটা ঠিক নয়, যদিও কয়েকজন মুঘল রাজকুমার আনুষ্ঠানিকভাবে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। ধর্ম সম্পর্কে আকবরের ব্যক্তিগত চেতনা সকলের সঙ্গে খাপ খেত, এবং এটাও ঠিক কথা যে সকল ধর্মের মূল তত্ত্বটি প্রায় একই ধরনের, যা তাঁর ইবাদৎখানার পণ্ডিতেরাও স্বীকার করতেন। কিন্তু এই সরল তত্ত্বের উপর নির্ভর করে আকবর যখন দীন-ই-ইলাহী মতের প্রতিষ্ঠা করেন, খুব অল্প লোকই তা গ্রহণ করেছিলেন, যদিও সম্রাটের মহৎ উদ্দেশ্য সম্পর্কে কারোরই সন্দেহ ছিল না। আসলে ধর্মতত্ত্ব ও ধর্মের প্রচলিত রূপের মধ্যে একটা বড় ফারাক সর্বদাই বর্তমান। যে কোন ধর্মের অন্তর্গত লোকই অপর ধর্মের পরমতত্ত্বকে শ্রদ্ধা করতে পারে, তার উপর আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে, কিন্তু যে ধর্মব্যবস্থার আওতায় সে বর্ধিত হয়েছে, তার আচার, অনুষ্ঠান ক্রিয়াকলাপ, প্রভৃতি তাকে এমনভাবে গ্রাস করে রাখে যে নিছক বৌদ্ধিক প্রেরণাতেই তার পক্ষে অন্যপথে পদক্ষেপ করা কঠিন। এই কারণেই দীন-ই-ইলাহীর প্রবর্তন সাফল্যলাভ করেনি।

কান্দাহার নিয়ে মুঘলদের সঙ্গে পারসিকদের চিরকালের সংঘর্ষ ছিল। ১৫৫৮

খ্রীষ্টাব্দে পারসিক বাহিনী সুলতান হুসেন মীর্জার নেতৃত্বে কান্দাহার অধিকার করে। ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে কাবুল অধিকার কালে খোরাসানের উজবেগরা পারস্যের পক্ষে ভীতির কারণ হয়ে উঠেছিল, এবং আকবরও ভেবেছিলেন যে কান্দাহার অধিকার করতে না পারলে কাবুল থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত অঞ্চল উজবেকদের হাতে বিপন্ন হবে। ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে আকবর আবদুর রহমানকে কান্দাহার অভিযানের নির্দেশ দেন, কিন্তু সেই নির্দেশ নানা কারণে প্রতিপালিত করা সম্ভব হয়নি। এদিকে উজবেক আক্রমণের ভয়ে ভীত কান্দাহারের শাসক মুজফ্ফর হুসেন মীর্জা পারস্যের শাহের নিকট সাহায্য চেয়ে ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত ১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দে কান্দাহার আকবরের হাতে সমর্পণ করে দেন। আকবর শিয়াদের প্রতি সদয় থাকার দরুন পারস্যের সুলতান তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। পারস্য ও উজবেকিস্তান পরস্পরের বিরুদ্ধে ভীত ছিল এবং দু তরফই একে অপরের বিরুদ্ধে আকবরের সাহায্যলাভের আশায় তাঁর সঙ্গে সন্ধি করেছিল। কাবুল ও ভারতের মধ্যবর্তী বাদকশান ১৫৮৪ খ্রীষ্টাব্দে উজবেগদের দ্বারা অধিকৃত হয় এবং তা আকবরের মাথা ব্যথার কারণ হয়। কিন্তু উজবেগ সুলতান আবদুল্লা খান পারস্যের ভয়ে ভীত থাকার দরুন আকবরের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রেখেছিলেন, এবং আকবরও তাঁকে বিশেষ ঘাটাননি। ১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দে আবদুল্লা খান মারা গেলে আকবরের উজবেগ আতঙ্ক দূর হয়। সভাসদদের আগ্রহ সত্ত্বেও কিন্তু আকবর বাদকশান ও ট্রান্স অক্সানিয়া, তাঁর পিতৃপুরুষদের বাসভূমি, জয়ের কোন চেষ্টা করেননি, সুযোগ থাকা সত্ত্বেও। তুরস্কের সুলতান মুসলিম জগতের নেতাস্থানীয় ছিলেন যা বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী মহান মুঘল আকবরের পক্ষে ছিল অসম্মানজনক। তিনি তুরস্কের সুলতানের বিরুদ্ধে পোর্তুগালের সম্রাট ও ইরাণের শাহের সঙ্গে একটি আনুষ্ঠানিক শক্তিজোট গঠন করেছিলেন, কিন্তু যুদ্ধের কোন সম্ভাবনাই কখনও ছিল না। পোর্তুগীজ ও অপরাপর বৈদেশিক শক্তিদের সঙ্গে আকবরের সম্পর্ক পরে আলোচিত হবে।

৭॥ আকবরের সমকালীন দাক্ষিণাত্য

আহমদনগর : ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে আহমদনগরের সুলতান প্রথম হুসেন নিজাম শাহ মারা গেলে তাঁর পুত্র প্রথম মুর্তাজা নিজাম শাহ সুলতান হন। তিনি নাবালক থাকাকালীন তাঁর মা হুমায়ুন সুলতানা রাজ্যের পরিচালিকা হিসাবে বিজাপুরের সঙ্গে কয়েকটি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। সাবালক হবার পর মুর্তাজা ১৫৬৯-৭০ খ্রীষ্টাব্দে

বিজাপুরের আলি আদিল শাহ ও কালিকটের জামোরিনের সঙ্গে একটি শক্তিজোট গঠন করে পোর্তুগীজ অধিকৃত চাউল দখল করার চেষ্টা করেন। কিন্তু এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বেরার অধিকার করেন। ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে বিজাপুরের সিংহাসনে দ্বিতীয় ইব্রাহিম আদিল শাহ নাবালক অবস্থায় আসীন হলে মুর্তাজা বিজাপুরের বিরুদ্ধে একটি অভিযান করেন, কিন্তু এই অভিযান ব্যর্থ হয়।

১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দে মুর্তাজাকে নিহত করে তাঁর পুত্র দ্বিতীয় হুসেন শাহ নাম নিয়ে সিংহাসনে বসেন, কিন্তু তাঁর রাজত্ব এক বছরও স্থায়ী হয়নি। এরপর সিংহাসনে বসেন তাঁর ভাই ইসমাইল ১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর আমলে আহমদনগর রাজসভার দক্ষিনী আমীরদের নেতা জমাল খান সর্বেসর্বা ছিলেন। বিক্ষুব্ধ আমীররা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে জমাল তাদের পরাজিত করেন। বিজাপুর বিদ্রোহীদের পিছনে ছিল এই কারণে তিনি বিজাপুরের বিরুদ্ধেও যুদ্ধযাত্রা করেন যদিও শেষ পর্যন্ত উভয় তরফে সন্ধি হয়।

এদিকে সুলতান ইসমাইলের পিতা বুরহান, যিনি মুঘল দরবারে যাতায়াত করতেন, পুত্রকে হটিয়ে স্বয়ং সুলতান হবার বাসনা প্রকাশ করেন এবং আকবরের সহযোগিতা লাভ করেন। কিছু বিদ্রোহী আমীরের সহায়তায় তিনি আহমদনগর অধিকৃত বেরার আক্রমণ করেন, কিন্তু পরাজিত হয়ে খান্দেশে পালিয়ে যান। সেখানকার শাসক রাজা আলি খান এবং বিজাপুরের সুলতান দ্বিতীয় ইব্রাহিম আদিল শাহ তাঁকে সহায়তা করতে রাজি হন, এবং তদনুযায়ী দু'দিক থেকে খান্দেশ ও বিজাপুরের বাহিনী আহমদনগর আক্রমণ করে। জমাল খান নিহত হন এবং ইসমাইলকে কারারুদ্ধ করে তাঁর পিতা বুরহান আহমদ নগরের সুলতান হন ১৫৯১ খ্রীষ্টাব্দে।

১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দে বুরহান বিজাপুরের বিরুদ্ধে অভিযান করে শোচনীয় ভাবে ব্যর্থ হন। ওই বছরেই তিনি পোর্তুগীজ অধিকৃত চাউল দুর্গ দখল করতে গিয়ে শোচনীয় ক্ষতির সম্মুখীন হন। ১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দে বুরহান মারা গেলে তাঁর পুত্র ইব্রাহিম নিজাম শাহ সিংহাসনে বসেন। তাঁর রাজ্যকালে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী আমীর মিয়াঁ মনঝু এবং ইখলাস খানের কলহ আহমদনগরের পক্ষে কালস্বরূপ হয়। ইখলাস খানের প্ররোচনায়, মিয়াঁ মনঝুর প্রচণ্ড বাধা সত্ত্বেও, ইব্রাহিম নিজাম শাহ বিজাপুর আক্রমণ করেন, কিন্তু তিনি স্বয়ং যুদ্ধে নিহত হন। এর পরেই আহমদনগর প্রচণ্ড বিশৃংখলার উদ্ভব হয়। আমীরদের মধ্যে চারটি দল গড়ে ওঠে। প্রথম দলের নেত্রী ছিলেন চাঁদ

সুলতান যিনি পরলোকগত সুলতানের পিসী ছিলেন এবং বিজাপুরের প্রাক্তন সুলতান প্রথম আলি আদিল শাহের বিধবা ছিলেন। তিনি ইব্রাহিম নিজাম শাহের নাবালক পুত্র বাহাদুরকে বৈধ সুলতান বলে ঘোষণা করেন। দ্বিতীয় দলের নেতা ছিলেন পূর্বোক্ত ইখলাস খান যিনি মোতি নামক এক বালককে সুলতান বলে ঘোষণা করেন। তৃতীয় দলের নেতা ছিলেন হাবসী আভঙ্গ খান যাঁর মনোনীত সুলতান ছিলেন বুরহানের পুত্র শাহ আলি। চতুর্থ দলের নেতা ছিলেন মিয়াঁ মনঝু যিনি আহমদ নামক এক রাজবংশীয়কে সুলতান হিসাবে বসাবার চেষ্টা করছিলেন।

মিয়াঁ মনঝু চাঁদ সুলতানের মনোনীত বাহাদুরকে কারারুদ্ধ করেছিলেন, এবং পরে যখন দেখা গেল যে তাঁর মনোনীত আহমদ আসলে একটি প্রতারক, ইসলাম খানের গোষ্ঠী মনঝুকে বিতাড়িত করে। মনঝু তখন গুজরাতের মুঘল শাসনকর্তা রাজকুমার মুরাদকে আহমদনগর আক্রমণের আমন্ত্রণ জানালেন। আহমদনগরে হস্তক্ষেপ করার জন্য আকবরের সবুজ সংকেত আগে থেকেই দেওয়া ছিল। রাজকুমার মুরাদ খান্দেশের রাজা আলি শাহ এবং খান খানান আবদুর রহিমকে নিয়ে আহমদনগর অভিমুখে যাত্রা শুরু করলেন।

এদিকে মিয়াঁ মনঝু তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ইখলাস খানকে পরাজিত করতে সক্ষম হলেন। এরপর মুঘলদের ডেকে আনার জন্য তিনি অনুতপ্ত হলেন, এবং মুঘলদের বিরুদ্ধে চাঁদ সুলতানের সঙ্গে সহযোগিতা করলেন। ইখলাস খান এবং আভঙ্গ খানও মুঘলদের বিরুদ্ধে চাঁদ সুলতানের পাশে এসে দাঁড়ালেন। বিজাপুরের সুলতান দ্বিতীয় ইব্রাহিম আদিল শাহ এবং গোলকুণ্ডার সুলতান মুহম্মদ কুলি কুতব শাহ চাঁদের পক্ষে এলেন। এদিকে মুঘল বাহিনীতেও রাজকুমার মুরাদ ও খান খানানের মধ্যে তীব্র মতভেদ দেখা দিল। তা সত্বেও মুঘল বাহিনী আহমদনগর দুর্গ অবরোধ করল। চাঁদ সুলতানও বীরত্বের সঙ্গে মুঘলদের প্রতিরোধ করে চললেন। শেষ পর্যন্ত উভয় তরফেরই রসদ ফুরিয়ে আসতে আহমদনগরের সঙ্গে মুঘলদের সন্ধি হল, এবং সন্ধির শর্তানুযায়ী আহমদনগরের অধিকৃত বেরার মুঘলদের হাতে গেল (মার্চ ১৫৯৬)। অনিচ্ছুক চিত্তেই চাঁদ এই সন্ধি মেনে নিলেন।

মুঘলরা প্রত্যাবর্তন করলে চাঁদের মনোনীত বাহাদুর সুলতান হলেন। প্রধান মন্ত্রীর পদ পেলেন মুহম্মদ খান। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে মিয়াঁ মনঝু চাঁদের বিরুদ্ধে শক্তি পরীক্ষায় অগ্রসর হলেন। চাঁদ বিজাপুরের সুলতান দ্বিতীয় ইব্রাহিম আদিল শাহের কাছে সাহায্যের আবেদন করলে ইব্রাহিম মনঝুকে বিজাপুরে ডেকে পাঠান, এবং

সেখানেই তাঁকে তাঁর অধীনে নিযুক্ত করেন। এদিকে প্রধানমন্ত্রী মুহম্মদ খান চাঁদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছিলেন। চাঁদ বিজাপুরের নিকট পুনরায় সাহায্য চাইলে বিজাপুরের সুলতান সুহাইল খানকে মুহম্মদের বিরুদ্ধে পাঠান। সুহাইল কর্তৃক অবরুদ্ধ মুহম্মদ মুঘলদের কাছে সাহায্যের আবেদন করেন এবং তদ্দণ্ডেই সাড়া পান।

এদিকে মুহম্মদেরই বিক্ষুব্ধ সেনাদল তাঁকে গ্রেপ্তার করে চাঁদের হস্তে সমর্পণ করে। চাঁদ অতঃপর আভঙ্গ খানকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। এদিকে মুঘল বাহিনী আহমদনগর অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছে সংবাদ পেয়ে চাঁদ বিজাপুর ও গোল-কুণ্ডার নিকট সাহায্যের জন্ম আবেদন করেন, এবং প্রত্যাশিত সাহায্যও পাওয়া যায়। আহমদনগর, বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার একটি সম্মিলিত বাহিনী ১৫৯৭ খ্রীষ্টাব্দে গোদাবরীর তীরে সোনপেত নামক স্থানে পরাজিত হয়। কিন্তু তাতে মুঘলদের বিশেষ কিছু লাভ হয় না। মুঘল শিবিরে যুদ্ধ বিষয়ে প্রচণ্ড মতভেদ দেখা যায়, বিশেষ করে রাজকুমার মুরাদ ও খান খানানের মধ্যে। আকবর খান খানানকে ডেকে পাঠান এবং তাঁর জায়গায় প্রেরিত হন আবুল ফজল।

এদিকে চাঁদের শিবিরেও, চাঁদের সঙ্গে আভঙ্গ খানের তীব্র বিরোধ উপস্থিত হয়েছিল। আভঙ্গ চাঁদকে আহমদনগর দুর্গে অবরুদ্ধ করেন, এবং খান খানানের অনুপস্থিতির সুযোগে মুঘল অধিকৃত বির নামক একটি দুর্গ পুনর্দখল করেন। ওদিকে ১৫৯৯-র ১২ই মে রাজকুমার মুরাদ মারা যান। অতঃপর আকবর খান খানান ও রাজকুমার দানিয়েলকে দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করেন, এবং মুঘল বাহিনী তাদের প্রধান কেন্দ্র খান্দেশের বুরহানপুরে উপস্থিত হয়। আভঙ্গ তখন আহমদনগরের দুর্গের অবরোধ তুলে নেন এবং চাঁদের সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাতে সফল না হয়ে তিনি জুন্নারে চলে যান। মুঘল বাহিনী বিনা বাধায় আহমমদনগরে প্রবেশ করে।

এই সঙ্কটপূর্ণ সময়ে চাঁদ মুঘলদের সঙ্গে সন্ধি করার চেষ্টা করেন। সন্ধির শর্ত ছিল যে আহমদনগরের দুর্গ মুঘলদের সমর্পণ করা হবে এবং চাঁদ নাবালক সুলতানকে নিয়ে জুন্নারে চলে যাবেন যেখান থেকে আভঙ্গকে উৎখাতের জন্ম মুঘলবাহিনী তাঁকে সাহায্য করবে। কিন্তু এই বিষয়টি প্রকাশ পাওয়া মাত্রই জিতা খান নামক একজন নপুংসক কর্মচারী কিছু লোক জুটিয়ে চাঁদকে তাঁর নিজ কক্ষে হত্যা করে (জুলাই ১৬০০)। ২৮শে আগষ্ট তারিখে মুঘলবাহিনী আহমদনগর জয় করে নেয়। চাঁদের

মনোনীত সুলতান বাহাদুর নিজাম শাহ গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী অবস্থায় অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন।

বেরার—১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দে বেরারের সুলতান দরিয়া ইমাদ শাহ মারা গেলে তাঁর শিশুপুত্র বুরহান ইমাদ শাহের অভিভাবক মন্ত্রী তুফাল খান বেরারের সর্বক্ষমতার অধিকারী হন। বিজয়নগরের বিরুদ্ধে গঠিত শক্তিজোটের শরিক তিনি হন নি। এছাড়া আরও নানা কারণে বিজাপুর ও আহমদনগরের সঙ্গে তাঁর প্রচণ্ড মনোমালিন্য ঘটে। শেষ পর্যন্ত আহমদনগরের সুলতান মুর্তাজা নিজামশাহের হাতে তাঁর চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে। ১৫৭৪-এর এপ্রিলে নার্নালের দুর্গ আহমদনগর কর্তৃক অধিকৃত হলে বুরহান ইমাদ শাহ ও তুফাল খান উভয়ই বন্দী হন, এবং বেরার আহমদনগরের অধীন হয়।

বিদর—বিদরে আলি বারিদ ১৫৪২ থেকে ১৫৮০ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে আলি বারিদ বিজয়নগরের বিরুদ্ধে গঠিত শক্তিজোটের শরিক হয়েছিলেন। পরবর্তী সুলতান ইব্রাহিম বারিদ শাহ ১৫৮৭ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। ইব্রাহিমের উত্তরাধিকারী হন দ্বিতীয় কাশিম বারিদ শাহ যিনি ১৫৯১ খ্রীষ্টাব্দে মারা গেলে তাঁর শিশুপুত্রকে হটিয়ে তাঁর এক জ্ঞাতি দ্বিতীয় আমীর বারিদ উপাধি নিয়ে ১৬০১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁকে বিতাড়িত করে মীর্জা আলি বারিদ বিদরের সুলতান হন। ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর উত্তরাধিকারী হন তৃতীয় আমীর বারিদ শাহ তিনি ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে মালিক অম্বরের নেতৃত্বে মুঘল বাহিনীর বিরুদ্ধে দাক্ষিণাত্যের আরও তিনটি রাজ্যের সংগ্রামের শরিক হয়েছিলেন। ১৬১৯ খ্রীষ্টাব্দে বিজাপুরের সুলতান দ্বিতীয় ইব্রাহিম আদিল শাহ তাঁকে পরাজিত করে বিদর দখল করেন।

গোলকুণ্ডা—১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে ইব্রাহিম কুতবশাহ গোলকুণ্ডার সুলতান হন। ১৫৬৫তে বিজয়নগরের বিরুদ্ধে গঠিত শক্তিজোটের তিনিও শরিক ছিলেন। ১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিজয়নগর অধিকৃত উদয়গিরি, বিনুকোণ্ড ও কোণ্ডবিড়ুতে হামলা করেন এবং বিজয়নগর রাজ্যের বেশ কিছুটা অংশ দখল করে নেন। ইব্রাহিম কুতব শাহ উদার ও অসম্প্রদায়িক ছিলেন। তাঁর আমলে হিন্দুরা গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী হতে পেরেছিল। তেলুগু সাহিত্যের তিনি ছিলেন খুব বড় একজন পৃষ্ঠপোষক।

১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে ইব্রাহিমের উত্তরাধিকারী হন মুহম্মদ কুলি কুতব শাহ। তাঁর আমলে বিজয়নগরের রাজা দ্বিতীয় বেঙ্কট কোণ্ডবিড়ু পুনরাধিকার করার ব্যর্থ চেষ্টা

করেন যদিও তিনি গন্দিকোট ও আরও কয়েকটি দুর্গ অধিকার করতে পেরেছিলেন। তাঁর কাছে ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে ইরানের সুলতান শাহ আব্বাস দূত প্রেরণ করেন। ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে অপসারিত করে তাঁর ভাই খুদাবান্দাকে গোলকুণ্ডার সিংহাসনে বসাবার একটি চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজদের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মসুলিপতমে একটি কুঠি নির্মাণ করে। মুহম্মদ কুলি কুতব শাহ ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে মারা যান।

বিজাপুর: ১৫৫৭ খ্রীষ্টাব্দে আলি আদিল শাহ (প্রথম) বিজাপুরের সুলতান হন। ১৫৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বিজয়নগরের সহযোগিতায় তিনি আহমদনগরের সুলতান হুসেন নিজাম শাহকে পরাজিত করেন। ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে অবশ্য বিজয়নগরের বিরুদ্ধে গঠিত শক্তিজোটে তিনি ছিলেন একজন প্রধান শরিক। ১৫৬৯-৭০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আহমদনগরের সুলতান ও কালিকটের জামোরিনের সঙ্গে চাউল থেকে পোর্তুগীজদের অপসারণ করতে গিয়ে ব্যর্থ হন। ১৫৭৫-এ পশ্চিম কর্ণাটের কিছু অংশ তিনি দখল করেন। পর বছর তিনি বিজয়নগরে একটি অভিযান করেন, কিন্তু গোলকুণ্ডা ও অপরাপর কয়েকটি শক্তির সাহায্যে বিজয়নগর সেই আক্রমণ প্রতিহত করে।

১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে আলি আদিল শাহের আততায়ীদের হাতে মৃত্যু ঘটলে দ্বিতীয় ইব্রাহিম আদিল শাহ মাত্র নয় বছর বয়সে সিংহাসন লাভ করেন। তাঁর অভিভাবক হন কামিল খান এবং আলি আদিল শাহের বিধবা চাঁদ সুলতান। চাঁদের চক্রান্তে কামিল নিহত হন, এবং চক্রান্তের শরিক কিশবর খান তাঁর অভিভাবক হন। এই অবস্থার সুযোগে আহমদনগর বিজাপুর আক্রমণ করে ধারাসেওর যুদ্ধে পরাজিত হয়। এদিকে কিশবর খান তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী আমীর মুস্তাফাকে হত্যা করেন এবং সাতারার দুর্গে চাঁদকে বন্দী করে রাখেন। কিন্তু কিশবর খানও অন্যান্য আমীদের অপ্রিয়ভাজন হয়ে গোলকুণ্ডায় পালিয়ে যান যেখানে তিনি মুস্তাফার এক আত্মীয় কর্তৃক নিহত হন।

চাঁদ মুক্তি পেলেও আমীরদের দলাদলির নিবৃত্তি হয়নি এবং সেই সুযোগে আহমদনগর ও গোলকুণ্ডা বিজাপুর আক্রমণ করে। দিলাবার খান নামক একজন সেনাপতি গোলকুণ্ডার বাহিনীকে পরাজিত করে জনপ্রিয় হন এবং ক্রমশ তিনি প্রধান মন্ত্রীর পদে উন্নীত হন। ১৫৮২ থেকে ১৫৯০ পর্যন্ত তিনি বিজাপুরে সর্বেসর্বা ছিলেন। কিন্তু ১৫৯১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আহমদনগরের নিকট ধারাসেওর যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আহমদনগরেই পালিয়ে গিয়ে বুরহান নিজাম শাহের অধীনে চাকরী গ্রহণ করেন। বিজা-

পুরের সুলতান ইব্রাহিম আদিল শাহ দিলাবারকে ফেরৎ চাইলে বুরাহান তাতে অস্বীকৃত হন, ফলে ইব্রাহিম বুরহানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং তাঁকে শোচনীয় ভাবে পরাজিত করেন। দিলাবারকে ফেরৎ পাঠানো হয়, এবং ইব্রাহিম তাঁকে অবশিষ্ট জীবন কারারুদ্ধ করে রাখেন।

১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ইব্রাহিমের ভাই ইসমাইল আমীর আইনুল মুল্কের সহায়তায় বিদ্রোহ করলে ইব্রাহিম সেই বিদ্রোহ দমন করেন ও উভয়কে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। আহমদনগরে বুরহান নিজাম শাহের মৃত্যু ঘটলে সেখানকার উত্তরাধিকারের দ্বন্দ্বে এবং আহমদনগরে মুঘল আক্রমণের বিরুদ্ধে তিনি চাঁদ সুলতানকে সাহায্য করেন। চাঁদ তখন আহমদনগরে ছিলেন। চাঁদ আসলে ছিলেন আহমদনগরের সুলতান হুসেন নিজাম শাহের (প্রথম) কন্যা, যাঁর সঙ্গে বিজাপুরের আলি আদিলের বিবাহ হয়েছিল। পরবর্তী পর্যায়ে ইব্রাহিম রাজনৈতিক স্বার্থেই মুঘলদের সাহায্য করেছিলেন। ১৬১৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিদর অধিকার করেন। দ্বিতীয় ইব্রাহিম মারা যান ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন এবং বিজাপুরের সাংস্কৃতিক উন্নতির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন।

৮ ॥ বিজয়নগর

১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তালিকোটা বা রাক্ষসী তঙ্গাদির যুদ্ধে রামরাজার পরাজয়ের পর বিজয়নগরের বিশাল সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে। মাদুরা, তাঞ্জোর ও জিঞ্জির নায়করা স্বাধীনতা ঘোষণা করে, এবং সর্বত্রই ভাঙনের লক্ষণ দেখা যায়। রামরাজার পরবর্তী শাসক তিরুমল কোনক্রমে বিজয়নগরের অস্তিত্ব রক্ষা করেন দাক্ষিণাত্যের পাঁচটি মুসলিম শাসিত রাজ্যের বিরোধের সুযোগ নিয়ে। ১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে পেনুগোণ্ডায় তিনি রাজা উপাধি গ্রহণ করেন, যদিও বিজয়নগরের আসল রাজা সদাশিব, যাঁর হয়ে রামরাজা রাজত্ব চালাতেন, তখনও বর্তমান ছিলেন। ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে তিরুমল মারা গেলে তাঁর পুত্র প্রথম শ্রীরঙ্গ ১৫৮৫ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি বিজাপুরের সুলতান-কে একটি যুদ্ধে পরাজিত করলেও তাঁর সময়ে অন্ধ্রের উপকূল ভাগ ও উত্তর কর্ণাটকের কিছু অংশ গোলকুণ্ডা ও বিজাপুরের হস্তে চলে যায়। পরবর্তী রাজা দ্বিতীয় বেঙ্কট বিজয়নগরের হস্তচ্যুত বহু অঞ্চল পুনরধিকার করেন এবং বিজয়নগরের হৃতগৌরব কিছুটা পরিমাণে পুনরুদ্ধার করেন। দ্বিতীয় বেঙ্কট মারা যান ১৬১৪ খ্রীষ্টাব্দে।

৯ ॥ বৈদেশিক শক্তিসমূহ

ভারতের পশ্চিম উপকূলে ও হুগলীতে পোর্তুগীজ অধিকারের কথা পূর্বে বলা

হয়েছে। ইউরোপে স্পেনের সঙ্গে পোর্তুগালের দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের পর ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে যখন স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ পোর্তুগাল দখল করে নিজেকে স্পেন ও পোর্তুগালের সম্রাট বলে ঘোষণা করেন তখন থেকেই কার্যত ভারতবর্ষে পোর্তুগীজদের অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে যখন আকবর ক্যাম্বে পরিদর্শন করেছিলেন গোয়ার পোর্তুগীজ বণিকেরা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিল। ১৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দে গোয়াস্থ পোর্তুগীজ রাজপ্রতিনিধি কর্তৃক আন্তোনিও কাব্রাল মুঘল রাজসভায় দূত হিসাবে প্রেরিত হন। ১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ফাদার রুডলোফ মুঘল দরবারে আসেন। পোর্তুগীজ জেসুইট মিশনারীদের সঙ্গে আকবরের বরাবর যোগাযোগ ছিল। দাক্ষিণাত্যে অবস্থানকালে আসীরগড় দুর্গ অবরোধের সময় আকবর পোর্তুগীজদের সাহায্য চেয়েছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে পোর্তুগীজদের নূতন প্রতিদ্বন্দ্বী দেখা দিয়েছিল যারা ছিল ওলন্দাজ ও ইংরাজ। ১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ওলন্দাজ বা ডাচ নৌবহর প্রথম উত্তমাশা অন্তরীপ অতিক্রম করে পোর্তুগীজ অধিকারে হস্তক্ষেপ শুরু করে। ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে তারা গোয়া অবরোধ করে। ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দে মিড্‌লটনের নেতৃত্বাধীন ইংরাজ নৌবহর বোম্বাই-এর নিকট পোর্তুগীজদের পরাজিত করে।

দ্বাদশ অধ্যায়

মুঘল সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি

১॥ জাহাঙ্গীর (১৬০৫-২৭)

১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা নভেম্বর রাজকুমার সলিম আগ্রা দুর্গে নুরুদ্দীন মুহম্মদ জাহাঙ্গীর নাম নিয়ে মুঘল সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নিজ পুত্র খুসরবের বিদ্রোহের সম্মুখীন হন। তাঁকে লাহোরে গ্রেপ্তার করা হয়, এবং জাহাঙ্গীর তাঁকে কিছুটা অন্ধ করে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। তাঁর সহযোগী হাসান বেগ ও আবদুর রহমানকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। শিখ গুরু অর্জুন খুসরবকে আশীর্বাদ করেছিলেন ও পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। এই অপরাধে তাঁকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় এবং অর্জুন তা দিতে অস্বীকার করায় তাঁর প্রাণদণ্ড হয়।

১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে জাহাঙ্গীর আসফ খান ও রাজকুমার পরভেজের নেতৃত্বে মেবারের রাণা অমরসিংহের (প্রতাপসিংহের পুত্র) বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন। দেওয়ার নামক স্থানে উভয় পক্ষের যুদ্ধ হয়েছিল, কিন্তু যুদ্ধটি কাদের পক্ষে গিয়েছিল বলা শক্ত। দ্বিতীয় অভিযান প্রেরিত হয়েছিল ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে মহাবৎ খানের নেতৃত্বে। এই অভিযানও সফল হয়নি। ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দে মেবার অভিযানের ক্ষেত্রে বার বার মুঘল নেতৃত্বের পরিবর্তন করা হয়, প্রথমে আবদুল্লা খান, তারপর রাজা বাসু, তারপর খান আজিজ কুকা ও রাজকুমার খুর্‌রম, এবং সর্বশেষে রাজকুমার খুর্‌রম। খুর্‌রমের নিকট পরাজিত হয়ে অমরসিংহ মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার করেন এবং নিজ পুত্রকে মুঘল দরবারে প্রেরণ করেন। জাহাঙ্গীর অমরসিংহকে মুঘল দরবারে হাজিরা দেওয়া থেকে রেহাই দেন এবং তাঁর সঙ্গে মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহার করেন।

আহমদনগরের মালিক অম্বর মুঘল অধিকৃত স্থানগুলি পুনর্দখল করায় ১৬০৮ থেকে ১৬১৫র মধ্যে জাহাঙ্গীর তাঁকে দমন করার জন্য কয়েকটি অভিযান প্রেরণ করেন, কিন্তু মালিক অম্বরের দক্ষতার ফলে সেগুলি ব্যর্থ হয়। ১৬১৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজকুমার খুর্‌রম আহমদনগরের সঙ্গে একটি সন্ধি করেন। তাতে আহমদনগর মুঘলদের নিকট আনুষ্ঠানিক বশ্যতা স্বীকার করলেও সন্ধির শর্তাবলী আহমদনগরের

পক্ষে এসেছিল। ১৬২৬ খ্রীষ্টাব্দে মালিক অম্বর মারা যাবার পরই মুঘল বাহিনী দাক্ষিণাত্যে কার্যত প্রবেশাধিকার পেয়েছিল। বিস্তৃত বিবরণ বর্তমান অধ্যায়ের দাক্ষিণাত্য অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।

১৬১১ খ্রীষ্টাব্দে টোডরমলের পুত্র রাজা কল্যাণ উড়িষ্যার খুরদা দখল করেন। সেখানকার রাজা ১৬১৭ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহ করলে অঞ্চলটি পাকাপাকি ভাবে মুঘল সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত করে নেওয়া হয়। ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে হীরক খনি সমৃদ্ধ খোখর অঞ্চলটি মুঘলদের হাতে আসে। ১৬১৭ খ্রীষ্টাব্দে দুজন কচ্ছী প্রধান, নবনগর ও বহরার জামবয়, জাহাঙ্গীরের বশ্যতা স্বীকার করেন। ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দে কাশ্মীরের দক্ষিণস্থ কিস্তওয়ার জাহাঙ্গীরের অধীন হয়। ১৬১৫ থেকে ১৬২০ এই পাঁচ বছরের প্রচেষ্টায় কাংড়া দুর্গ জাহাঙ্গীরের অধিকারে আসে।

বঙ্গদেশে আফগান শক্তির অবসান একেবারে হয়নি। ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে আকবরের রাজত্বকালে বঙ্গদেশে উসমান খান মানসিংহ কর্তৃক দমিত হলেও, বঙ্গদেশের নানাস্থানেই বিদ্রোহ ও মুঘল প্রাধান্য অস্বীকারের প্রচেষ্টা চলছিল। ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশের মুঘল শাসক আলাউদ্দীন ইসলাম খানের আমলে কোচবিহার মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার করে। ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দে কামরূপ মুঘল অধিকারে আসে। ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে অহোম রাজ্য অধিকার করতে গিয়ে মুঘলদের বিপর্যয় ঘটে।

১৬১০ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমানের জায়গীরদার শের আফগানের বিধবা মেহেরউন্নিসার সঙ্গে জাহাঙ্গীরের বিবাহ হয়, এবং মেহের নুরজাহান নামে পরিচিত হন। জাহাঙ্গীরের উপর তিনি এতই প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে তিনিই প্রকৃত মুঘল সাম্রাজ্যের পরিচালিকা হয়ে উঠেছিলেন। ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে নুরজাহানের ভাই আসফ খানের কন্যা আর্জুমন্দ বানু বেগমের সঙ্গে, যিনি মুমতাজমহল নামে অধিকতর পরিচিত, রাজকুমার খুররমের বিবাহ হয়। জাহাঙ্গীরের উত্তরাধিকারী হিসাবে এর ফলে স্বাভাবিক ভাবেই খুররম নুরজাহানের সমর্থন পান। ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দে নুরজাহানের গর্ভজাত শের আফগানের কন্যা লাডলি বেগমের সঙ্গে জাহাঙ্গীরের অপর পুত্র শাহ্‌রিয়ারের বিবাহ হয়। এরপর নুরজাহান উত্তরাধিকারী হিসাবে শাহ্‌রিয়ারের পক্ষপাতী হলে খুররম মুঘল দরবারের বিশিষ্ট পদাধিকারী মহাবৎ খানের সঙ্গে চক্রান্ত শুরু করেন। তিনি তাঁর বড় ভাই খুসরবকে কারাগার থেকে উদ্ধার করে দাক্ষিণাত্যে নিয়ে যান, এবং বুরহানপুরে সুযোগ বুঝে তাঁকে হত্যা করেন। এদিকে জাহাঙ্গীর খুররমকে কান্দাহার অভিযানের আদেশ দিলে খুররম বিদ্রোহ করেন।

কিন্তু বালোচপুরে রাজকীয় বাহিনীর নিকট ১৬২৩ খ্রীষ্টাব্দে পরাজিত হয়ে তিনি দক্ষিণ ভারতে পলায়ন করেন। আহমদনগরের মালিক অম্বরের সাহায্য চেয়ে ব্যর্থ হয়ে খুর্‌রম বিহারে চলে আসেন এবং রোটাস দুর্গ দখল করেন। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে মুঘলবাহিনী এলাহাবাদে হাজির হলে তিনি জয়লাভ অসম্ভব জেনে পত্রমারফৎ জাহাঙ্গীরের মার্জনাভিক্ষা করেন। আসির ও রোটাস এই দুই দুর্গ জাহাঙ্গীরের নিকট সমর্পণ করে এবং নিজের দুই পুত্র দারা ও ঔরঙ্গজেবকে জামিন রেখে, খুর্‌রম রেহাই পান।

খুর্‌রমের সঙ্গে মহাবৎ খান গোড়ার দিকে দহরম-মহরম করলেও, অবস্থা বুঝে তিনি রাজকীয় পক্ষে এসেছিলেন। এরপর তিনি অপর রাজকুমার পরভেজের পক্ষাবলম্বন করে নুরজাহানের বিরাগভাজন হন। তিনি তাঁর বিরুদ্ধে কতকগুলি অভি-যোগ এনে দূর বাঙলা মুলুকে যাবার নির্দেশ দেন। এই নির্দেশ অমান্য করে মহাবৎ কাবুলের পথে বিশ্রামরত জাহাঙ্গীরকে হঠাৎ বন্দী করেন। সম্রাটের সঙ্গী আসফ খান তাঁর হাতে পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন। বাদশাহের বন্দী অবস্থায় নুরজাহান তাঁর সঙ্গে মিলিত হন। কিন্তু এঁদের নিয়ে মহাবৎ-এর কিছু করার ছিল না, বাধ্য হয়েই তিনি আত্মসমর্পণ করেন। সম্রাট তাঁকে খুর্‌রমের বিরুদ্ধে অভিযানের নির্দেশ দেন, কেননা খুর্‌রম তখন সিন্ধুতে থেকে পুনরায় বিদ্রোহের চেষ্টা করছিলেন। মহাবৎ পুনরায় খুর্‌রমের পক্ষে যোগ দেন ও খুর্‌রম নাসিকে চলে যান। ইতিমধ্যে ১৬২৭-এর ৭ই নভেম্বর লাহোরে জাহাঙ্গীর মারা যান।

জাহাঙ্গীর ও বৈদেশিক শক্তিসমূহ: জাহাঙ্গীর ১৬০৭ ও ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দে গোয়ার পোর্তুগীজদের নিকট দুবার দূত প্রেরণ করেন। ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দে পোর্তুগীজরা সুরাটের নিকট চারটি মুঘল জাহাজ আটক করলে সম্রাট বিরক্ত হন ও সুরাটের শাসক মুকর্‌রব খানকে পোর্তুগীজদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। মুকর্‌রব ইংরাজ নৌসেনাপতি ডাউনটনের সাহায্যে পোর্তুগীজদের নৌযুদ্ধে পরাজিত করেন। পোর্তুগীজদের উপর প্রদত্ত সুযোগসুবিধাগুলি প্রত্যাহার করা হয়, এবং আগ্রা ও লাহোরের গীর্জাগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়। অবশেষে ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে জেসুইট মিশনারীদের প্রচেষ্টায় জাহাঙ্গীর কিছুটা নরম হন। জাহাঙ্গীর খ্রীষ্টধর্মের প্রতি বিরূপ ছিলেন না। তাঁর দুই ভ্রাতুষ্পুত্র (রাজকুমার দানিয়ালের পুত্র) ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন।

ইংরাজদের তরফ থেকে ক্যাপ্টেন হকিন্স ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাজা প্রথম

জেমসের একটি চিঠি নিয়ে মুঘল দরবারে এসেছিলেন। তাঁকে অনুসরণ করেন পল ক্যানিং ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে এবং উইলিয়ম এডওয়ার্ডস ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে। এরপর আসেন স্যার টমাস রো।

ইরানের সঙ্গে জাহাঙ্গীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার প্রয়াস পেয়েছিলেন। তাঁর সিংহাসনারোহনের সময়ে ইরানের তরফ থেকে কান্দাহার দখলের একটি ব্যর্থ চেষ্টা হয়। ১৬১১ থেকে ১৬১৩-র মধ্যে জাহাঙ্গীরের সঙ্গে ইরানের শাহের কয়েকবার দূত বিনিময় হয়। ১৬২১-এর কিছু পরে যখন জাহাঙ্গীর দাক্ষিণাত্যের বিদ্রোহ নিয়ে ব্যস্ত তখন ইরানের শাহ একবার কান্দাহারে অভিযান প্রেরণ করেছিলেন। এটাও লক্ষ্যণীয় যে সেই সময় আহমদনগরের নিজামশাহী সুলতানের দূত জৈশ খানকে কান্দাহার অবরোধের সময় শাহ বিশেষভাবে আপ্যায়িত করেছিলেন। এটা সম্ভব যে আহমদনগরের সঙ্গে ইরানের কোন গোপন বোঝাপড়া হয়েছিল, যা অনুযায়ী দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধকালে জাহাঙ্গীরকে দুর্বল করার জন্যই তিনি কান্দাহার আক্রমণ করেছিলেন। এই ব্যাপারের মধ্যে বোধ হয় রাজকুমার খুর্‌রমও জড়িত ছিলেন, কেননা কান্দাহারে জাহাঙ্গীরকে ব্যস্ত রাখতে পারলে খুর্‌রম নিজের শক্তিকেন্দ্রগুলি ভাল করে গুছিয়ে নিতে পারতেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শাহ জাহাঙ্গীরের সঙ্গে সদ্ভাব রক্ষার গুরুত্ব বুঝেছিলেন, এবং তদনুযায়ী তাঁর সঙ্গে সন্ধি করেছিলেন। নিজ পূর্ব-পুরুষের বাসভূমি মধ্য এশিয়া সম্পর্কে জাহাঙ্গীরের কোন আগ্রহ ছিল না।

২॥ শাহজাহান (১৬২৮-৫৮)

১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে জাহাঙ্গীর মারা গেলে উত্তরাধিকারের দ্বন্দ্বে জয়ী হয়ে রাজকুমার খুর্‌রম শাহজাহান উপাধি নিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে ফেব্রুয়ারি তারিখে। নিজের ভাইদের ও ভাইপোদের তিনি বাঁচিয়ে রাখেন নি, তাঁরা কেউ কোনদিন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে পারেন এই আশংকায়।

রাজত্বের প্রথম বছরেই শাহজাহানকে বুন্দেল রাজা বীর সিং দেওর পুত্র জুঝার সিংহের বিদ্রোহ দমন করতে হয়েছিল। বীর সিং দেও জাহাঙ্গীরকে প্রচুর সাহায্য করেছিলেন, আবুল ফজলকে তিনিই হত্যা করেছিলেন, এবং প্রতিদানে প্রচুর পদ-মর্যাদা ও সম্পদলাভ করেছিলেন। জুঝার কিন্তু বিদ্রোহী হন এবং নিজের ঘাঁটি ওর্ছা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি মহাবৎ খান কর্তৃক পরাজিত হয়ে দাক্ষিণাত্যে একটি ছোট জায়গীর প্রাপ্ত হন। কিছু দিনের মধ্যেই তিনি গরহার ভীমনারায়ণকে

নিহত করে চৌরাগড় দুর্গের মালিক হন। ভীমনারায়ণের পুত্র শাহজাহানের নিকট অভিযোগ করলে তিনি ঔরঙ্গজেবকে জুঝারের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। মুঘলদের দ্বারা তাড়িত হয়ে তিনি গভীর অরণ্যে আশ্রয় নেন, কিন্তু সেখানে গোন্দ উপ-জাতিদের হাতে নিহত হন।

১৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দে মহোবার চম্পৎরাই মুঘলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পূর্বোক্ত বীর সিং দেওর অপর পুত্র পহার সিংহের মধ্যস্থতায় শাহজাহানের বশ্যতা স্বীকার করেন। মৌ-নুরপুরের রাজা বাসু জাহাঙ্গীরের বিশ্বস্ত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর পুত্র জগৎ সিংহও শাহজাহানের কাছ থেকে প্রভূত সম্মান পেয়েছিলেন। কিন্তু পুত্র রাজরূপের প্ররোচনায় তিনি বিদ্রোহ করেন ১৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে। এই বিদ্রোহ সহজেই দমিত হয় এবং জগৎ সিংহ বশ্যতা স্বীকার করেন। এর পর শাহজাহানকে খান জাহান লোদীর বিদ্রোহের মোকাবিলা করতে হয়। খান জাহান বেরার ও খান্দেশের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন এবং তাঁকে দাক্ষিণাত্যে মুঘলদের হৃত অঞ্চলগুলি পুনরুদ্ধারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। আহমদনগরের সুলতান দ্বিতীয় মুর্তাজা নিজাম শাহের সঙ্গে তিনি একটি মুঘলবিরোধী চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছিলেন। শাহজাহান নানাস্থানে তাঁকে তাড়া করে শেষ পর্যন্ত সিন্ধু নদীর তীরে তাঁকে নিহত করেন।

১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দে পোর্তুগীজরা হুগলীতে কুঠি স্থাপন ও সেখান থেকে ব্যবসা করার অধিকার পেয়েছিল। তাদের আসল পেশা ছিল বঙ্গদেশের নানাস্থানে লুণ্ঠন, দাস ব্যবসায় এবং বলপূর্বক সাধারণ মানুষকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করা। জাহাঙ্গীর হুগলীর পোর্তুগীজদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করেন নি। ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে পোর্তুগীজরা ঢাকার নিকট একটি গ্রাম লুণ্ঠন করলে ও কয়েকজন মুঘল মহিলাকে অপহরণ করলে ঢাকার শাসক কাশিম খান বঙ্গদেশ থেকে পোর্তুগীজদের উৎখাত করার সুপারিশ করেন। তদনুযায়ী একটি বিরাট মুঘল বাহিনী হুগলী অভিযান করে পোর্তুগীজদের নির্মূল করে দেয়। পোর্তুগীজ সেনাপতিদের কঠোরভাবে শাস্তি দেওয়া হয়। এই ঘটনার পর বঙ্গদেশ থেকে পোর্তুগীজরা পাকাপাকিভাবে উচ্ছেদ হয়।

শাহজাহানের সময় মুঘলরা অহোম রাজ্য অধিকারের একটি ব্যর্থ চেষ্টা করে ১৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দে। শেষ পর্যন্ত অহোমদের সঙ্গে মুঘলদের একটি সন্ধি হয়। এরপর শাহজাহান ঝাড়খণ্ডের বিদ্রোহী জমিদারদের দমন করেন। পালামৌর বিদ্রোহী রাজা প্রতাব ১৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে বশ্যতা স্বীকার করেন। রাজত্বের শেষ দিকে শাহজাহান

কুমায়ুন-গাহরবাল অঞ্চলের উপজাতিদের বিদ্রোহ দমনে বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন।

কান্দাহারে ইতিমধ্যে ইরানীয় অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কান্দাহারের শাসক আলি মর্দান খান ইরানকে প্রদেয় রাজস্ব বাকি ফেললে ইরানের সম্রাট শাহ সফি তাঁকে ডেকে পাঠান। আলি মর্দান ইরানে না গিয়ে মোটা টাকার বিনিময়ে শাহ-জাহানকে কান্দাহারের অধিকার সমর্পণ করেন ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে। ইরানের সম্রাট শাহ সফি অন্যত্র যুদ্ধে ব্যস্ত থাকায় কান্দাহার পুনরুদ্ধারের জন্য কোন ব্যবস্থা নেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

আলি মর্দান কর্তৃক কান্দাহার সমর্পণের অব্যবহিত পরেই শাহজাহান রাজকুমার সুজা ও খান দৌরনের নেতৃত্বে কাবুলে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। বুখারার শাসক ইমাম কুলি অন্ধত্বের জন্য সিংহাসন পরিত্যাগ করলে তাঁর ভাই নজর মুহম্মদ বুখারার সিংহাসন দখলের চেষ্টা করেন যার ফলে সেখানে বিদ্রোহ ও গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত হয়। এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে মুঘলবাহিনী ১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে কহ্‌মরদ এবং ১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দে কুন্দুজ দখল করে। এর কিছুদিন পরেই বালখ্‌ মুঘলদের হাতে আসে ও নজর মুহম্মদ ইরানে পালিয়ে যান। এদিকে অপরিচিত পরিবেশে মুঘলবাহিনী বিপন্ন হয়ে পড়ে। অপরদিকে নজর মুহম্মদ সৈন্যবাহিনী সংগ্রহ করে বালখ পুনরুদ্ধারের জন্য এগিয়ে আসেন। অবস্থা সামাল দেওয়া অসম্ভব বিবেচনা করে বালখে তৎকালীন মুঘলবাহিনীর ভারপ্রাপ্ত রাজকুমার ঔরঙ্গজেব ১৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দে নজর মুহম্মদের সঙ্গে একটা সন্ধি করে বাহিনীসহ ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। পথে প্রাকৃতিক বিপর্যয়, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে মুঘল বাহিনী খতম হয়ে যায়। এই অবস্থার সুযোগে ইরানের নূতন সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আব্বাস ১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে কান্দাহার দখল করে নেন। শাহজাহান ১৬৪৯, ১৬৫২ ও ১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনবার কান্দাহার পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন।

শাহজাহানের দাক্ষিণাত্য নীতি পরবর্তী অনুচ্ছেদে বর্ণিত হবে। এখানে এইটুকুই বলে রাখা ভাল যে শাহজাহান দাক্ষিণাত্যের প্রধান তিনটি রাজ্যকে পুরোদস্তুর গ্রাস করতে চেয়েছিলেন, এবং কিয়দংশে সফলও হয়েছিলেন।

উত্তরাধিকারের দ্বন্দ্ব : শাহজাহান ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং জ্যেষ্ঠপুত্র দারাকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। ৪৩ বছর বয়স্ক, পরম বিদ্বান, উদার হৃদয় কিন্তু তোষামোদপ্রিয় ও আত্মগর্বী দারা পিতার নিকটেই থাকতেন এবং পিতারই প্রতিনিধিত্ব করতেন। শাহজাহানের অসুস্থতার

সংবাদ পাওয়া মাত্র তাঁর দ্বিতীয় পুত্র সুজা নিজেকে বাদশাহ হিসাবে ঘোষণা করেন এবং সসৈন্যে বঙ্গদেশ থেকে আগ্রা অভিমুখে রওনা হন। ওদিকে সম্রাটের অপর দুই পুত্র মুরাদ ও ঔরঙ্গজেবের মধ্যে একটি চুক্তি হয় যে রাজ্য দখল হলে তাঁরা উভয়ে ভাগাভাগি করে নেবেন, এবং তদনুযায়ী মুরাদ ১৬৫৮-র ৭ই মার্চ আমেদাবাদ থেকে সসৈন্যে যাত্রা করেন এবং ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে দীপালপুরে মিলিত হন ২৪শে এপ্রিল তারিখে। প্রসঙ্গত এ কথা বলা দরকার যে তাঁর অপর তিন ভাই-এর তুলনায় ঔরঙ্গজেব সিংহাসন দখলের ব্যাপারে গোড়ার দিকে নিস্পৃহতা দেখিয়েছিলেন। ধর্মাট ও সামুগড়ের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে দারা লাহোরে পলায়ন করেন। ১৬৫৮-র ২১শে জুলাই তারিখে আগ্রা দুর্গে শাহজাহানকে বন্দী করার পর ঔরঙ্গজেব দিল্লীতে সম্রাট হিসাবে অভিষিক্ত হন।

সিংহাসন দখল করার পর ঔরঙ্গজেব দারার অনুসরণে শতদ্রু নদী অতিক্রম করলে ভীত দারা ১৮ই আগস্ট তারিখে মুলতানে পলায়ন করেন এবং সেখান থেকে সিন্ধুদেশের মধ্য দিয়ে গুজরাত অভিমুখে রওনা হন। ওদিকে পূর্বদিক থেকে সুজার অগ্রসর হবার সংবাদ পেয়ে ঔরঙ্গজেব খাজুয়া নামক স্থানে তাঁকে পরাজিত করেন। ঔরঙ্গজেব মীর জুমলা এবং মুহম্মদ সুলতানকে সুজার পশ্চাদ্ধাবনে প্রেরণ করেন। সুজা বারাণসী ও পাটনা হয়ে মুঙ্গেরে আসেন এবং সেখান থেকে সাহেবগঞ্জ ও রাজমহল হয়ে মালদহে। কিছুদিনের জন্য সুজা রাজমহল দখল করতে সক্ষম হয়েছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঔরঙ্গজেবের বাহিনী আসার সংবাদে তিনি আরাকানে পালিয়ে যান। সুজা আরাকান দখল করার একটি চক্রান্ত করেছিলেন যা ফাঁস হয়ে গেলে আরাকানের মগ রাজা তাঁকে হত্যা করেন ১৬৬১-র ফেব্রুয়ারি মাসে।

দারা কোনক্রমে আমেদাবাদে পৌঁছে সেখানকার শাসক শাহ নওয়াজ খানের সাহায্যে বাইশ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী সংগ্রহ করে আগ্রা অভিমুখে রওনা হন, কিন্তু আজমীরের দক্ষিণে দেওরাই নামক স্থানে তিনি ঔরঙ্গজেবের বাহিনী কর্তৃক পরাজিত হন ১৬৫৯-এর মার্চ মাসে, এবং তারপর কচ্ছের রণ অঞ্চল হয়ে সিন্ধুর দক্ষিণ উপকূলে পৌঁছান। ঔরঙ্গজেবের অনুসন্ধানকারী বাহিনীর নজর এড়িয়ে বোলান পাস ও কান্দাহারের মধ্য দিয়ে ইরানে যাওয়া তাঁর মতলব ছিল। বোলান গিরিপথের নয় মাইল পূর্বে তিনি দাদর নামক স্থানে আশ্রয় নিয়েছিলেন সেখানকার প্রধান মালিক জীবনের নিকট। এই লোকটিকে তিনি পূর্বে প্রাণদণ্ড থেকে রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু এই লোকটিই তাঁকে তাঁর পুত্র সিপির এবং দুই কন্যাসহ বন্দী করে

ঔরঙ্গজেবের নিকট পাঠিয়ে দেয়। দারাকে বিধর্মী ঘোষণা করে ৩০ শে আগস্ট ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে হত্যা করা হয় এবং তাঁর ছিন্ন মুণ্ড বন্দী সম্রাট শাহজাহানের নিকট উপহার স্বরূপ প্রেরিত হয়। দারার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুলেমানকে গাহরবাল থেকে ধরে নিয়ে এসে গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী করে রাখা হয়, এবং ১৬৬২র মে মাসে তাঁকে গোপনে হত্যা করা হয়। অবশিষ্ট ভ্রাতা মুরাদকে ঔরঙ্গজেব ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বন্দী করে রেখেছিলেন। একটি বিচারের প্রহসনের দ্বারা তাঁকেও নিহত করা হয় ১৬৬১র ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে।

৩॥ জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের সমকালীন দাক্ষিণাত্য

আহমদনগর : আকবরের আহমদনগর অভিযানের ফলে আহমদনগরের অনেকটাই মুঘলদের করতলগত হয়েছিল এবং আহমদনগরের সুলতান বাহাদুর নিজাম শাহ সমেত সুলতানী পরিবারের অনেকেই গোয়ালিয়র দুর্গে মুঘল হস্তে বন্দী ছিলেন। এই দুর্দিনে মালিক অম্বর নামক একজন আমীর প্রাক্তন নিজাম শাহী বংশের একজনকে মুর্তাজা নিজাম শাহ (দ্বিতীয়) উপাধি দিয়ে মুঘল অনধিকৃত অংশের সুলতান বলে ঘোষণা করেন, এবং হৃত অঞ্চলগুলি মুঘলদের নিকট থেকে পুনরাধিকারে যত্নবান হন। সুলতান দ্বিতীয় মুর্তাজা ১৬০০ থেকে ১৬৩০ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন, যদিও তাঁর আমলে মালিক অম্বরই ছিলেন সর্বেসর্বা।

মালিক অম্বর ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ প্রশাসক, পরিকল্পনাকার ও যোদ্ধা। ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জুন্নারে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। জাহাঙ্গীর যখন খুসরবের বিদ্রোহ ও ইরানের শাহ আব্বাসের কান্দাহার অবরোধের ব্যাপারে ব্যস্ত, সেই সুযোগে অম্বর মুঘল অধিকৃত আহমদনগরের অনেকটা দখল করে নেন। মুঘলদের বিরুদ্ধে তিনি বিজাপুরের সঙ্গে একটি শক্তি জোট গঠন করেন, যদিও বিজাপুর দীর্ঘকাল তাঁর পক্ষে ছিল না। ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মুঘলবাহিনীকে মারাঠাদের দ্বারা দীর্ঘকাল গেরিলা যুদ্ধে উত্যক্ত করে শেষ পর্যন্ত তাদের অপমানজনক সন্ধিতে রাজি করান। আহমদনগর দুর্গ অম্বরের অধিকারে আসে। এরপর তিনি রাজধানী দৌলতাবাদ সরিয়ে নিয়ে আসেন।

১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে মুঘলরা গুজরাতের শাসক আবদুল্লা খান, এবং মানসিংহ ও খান জাহান লোদীর নেতৃত্বে দু'দিক দিয়ে আহমদনগর আক্রমণ করে। অম্বর এই আক্রমণ প্রতিরোধ করেন, এবং দুর্গম খির্কি অঞ্চলে পুনরায় রাজধানী সরিয়ে নেন।

১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে শাহ নওয়াজ খানের নেতৃত্বে মুঘলরা অম্বরকে পরাস্ত করে। ওই সময় দাক্ষিণাত্যের মুঘল শাসক খুর্‌রম আহমদনগরকে অনেকখানি পুনরুদ্ধার করা এলাকা ছেড়ে দিয়ে বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করেন। ১৬১৯ খ্রীষ্টাব্দে যখন জাহাঙ্গীর কাশ্মীরে ব্যস্ত এবং খুর্‌রম বা শাহজাহান কাংড়া অবরোধ করেছেন সেই সুযোগে অম্বর মুঘলদের কাছে ছেড়ে দেওয়া জায়গাগুলি পুনরায় দখল করেন। ইতিমধ্যে নানা কারণে বিজাপুরের সঙ্গে আহমদনগরের সম্পর্কে ফাটল ধরেছিল। ১৬১৯ খ্রীষ্টাব্দে অম্বর বিজাপুরের অধিকার থেকে বিদর দখল করেন, এবং বিজাপুর শহরটি অবরোধ করেন। বিজাপুরের সুলতান দ্বিতীয় ইব্রাহিম তখন বুরহানপুরে অবস্থিত মুঘল বাহিনীর সাহায্য চান। মুঘল বাহিনীর প্রবল আক্রমণে বিজাপুর অবরোধ তুলে নিয়ে অম্বর চলে আসেন এবং ভীষণভাবে তাড়িত হয়ে আহমদনগর দুর্গের দশ মাইল দক্ষিণ পূর্বে ভতবাদি নামক স্থানে কালী নদীর পশ্চিম কূলে উপস্থিত হন। এইখানে তিনি নদীর বাঁধ কেটে দিয়ে মুঘল ও বিজাপুর বাহিনীকে বেকায়দায় ফেলেন, এবং পিছন দিক থেকে আক্রমণ করে মুঘল বাহিনীকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করেন (১৬২৪)। এরপর তিনি আহমদনগর দুর্গ পুনরুদ্ধার করেন এবং বিজাপুরের অধিকার থেকে শোলাপুর দখল করেন (১৬২৫)।

১৬২৬ খ্রীষ্টাব্দে মালিক অম্বরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ফথ খান আহমদনগরের প্রধান-মন্ত্রী হন। পিতার সম্পূর্ণ বিপরীত এই ব্যক্তিটি মুঘলদের সঙ্গে চক্রান্ত করে সুলতান দ্বিতীয় মুর্তাজাকে হত্যা করেন এবং তাঁর নাবালক পুত্র হুসেনকে সিংহাসনে বসান। ১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দে শাহজাহান আহমদনগর অধিকার করেন। সুলতান হুসেন গোয়ালিয়র দুর্গে কারারুদ্ধ হন। ফথ খান মুঘলদের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। ১৬৩৬ খ্রীষ্টাব্দে শিবাজীর পিতা শাহজী বিজাপুরের সহযোগিতায় নিজামশাহী বংশের একজনকে আহমদনগরের সুলতান হিসাবে খাড়া করার চেষ্টা করেন, কিন্তু সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

বিজাপুর : দ্বিতীয় ইব্রাহিম আদিল শাহ ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে লোকান্তরিত হবার পর তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র মুহম্মদ আদিল শাহ তাঁর উত্তরাধিকারী হন। ইব্রাহিমের সময় আহমদনগরের মালিক অম্বরের সঙ্গে বিজাপুরের একটি সহযোগিতা চুক্তি হয়েছিল, এবং উভয় রাজ্যই একত্রে মুঘলদের বিরুদ্ধে কয়েকটি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পরে উভয় রাজ্যের মধ্যে চিরাচরিত শত্রুতার সম্পর্কই পুনঃস্থাপিত হয়। মুহম্মদ আদিল শাহের আমলে ১৬৩১ খ্রীষ্টাব্দে বিজাপুরে মুঘল আক্রমণ হয়েছিল,

কিন্তু উপযুক্ত রসদের অভাবে মুঘল বাহিনী বিজাপুর দুর্গের অবরোধ উঠিয়ে প্রত্যাবর্তন করে। ১৬৩৬-এ শাহজাহান স্বয়ং দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত হন। গোলকুণ্ডা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে, কিন্তু বিজাপুর তা করতে অসম্মত হলে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়। বছরে কুড়ি লক্ষ টাকা কর দিতে মুহম্মদ রাজি হলে শাহজাহান আহমদনগর থেকে অধিকৃত কিছু অঞ্চল বিজাপুরকে উপহার দেন। ১৬৩৭-এ মুহম্মদ দক্ষিণের ইক্কেরি, তারিকেরি ও বাসবপত্তনামে অভিযান চালিয়ে সেখানকার ছোট ছোট শাসকদের তাঁর বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করেন। ১৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দে বিজাপুরের সেনাপতি মুস্তাফা খান বিজয়নগরের তৃতীয় শ্রীরঙ্গের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে কৃষ্ণগিরি ও দেবদুর্গ জয় করেন। ওই বছরেই তিনি ভেলোরে তৎকালীন গোলকুণ্ডার ওয়াজির মীর জুমলার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর সহযোগিতায় বিজয়নগরের অধিকার থেকে কাবেরিপত্তনম, হাসন, কণকগিরি, রত্নগিরি ও অর্জুনকোট দখল করেন। ১৬৪৯-এ জিঞ্জির দুর্গ বিজাপুরের অধিকারে আসে। মাদুরা ও তাঞ্জোরের নায়করাও বিজাপুরের বশ্যতা স্বীকার করেন।

মুহম্মদ আদিল শাহ ১৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দে মারা যান। তাঁর জীবদ্দশাতেই শিবাজী বিজাপুরের বিরুদ্ধে ছোট ছোট যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং তোরণা, কোন্ধন (সিংহগড়) চাকন ও পুরন্দর দুর্গ জয় করেন। এতে অসন্তুষ্ট হয়ে মুহম্মদ আদিল শাহ শিবাজীর পিতা শাহজীকে কারারুদ্ধ করেছিলেন।

গোলকুণ্ডা : মুহম্মদ কুলি কুতব শাহের পর মুহম্মদ কুতব শাহ গোলকুণ্ডার সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ১৬১২ থেকে ১৬২৬ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি মুঘলদের বিরুদ্ধে আহমদনগরের মালিক অম্বরকে সাহায্য করেছিলেন এবং ১৬২৪ খ্রীষ্টাব্দের ভতবাদির যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁর উত্তরাধিকারী আবদুল্লা কুতব শাহ ১৬৩৬ খ্রীষ্টাব্দে শাহজাহানের বশ্যতা স্বীকার করেন। ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিজয়নগরের বিরুদ্ধে অভিযান করে বিজয়নগরের কিছু এলাকা দখল করেছিলেন। তাঁর ওয়াজির মীরজুমলা তাঁর আমলে অতিরিক্ত শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন। দাক্ষিণাত্যের মুঘল শাসক ঔরঙ্গজেবের গোলকুণ্ডার প্রতি লোভ ছিল। তিনি মীরজুমলাকে দলে টানেন। বিপদের গন্ধ পেয়ে আবদুল্লা ১৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দে মীরজুমলার পুত্র মুহম্মদ আমিনকে সপরিবারে বন্দী করেন। এই অজুহাতে ঔরঙ্গজেব ১৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দে গোলকুণ্ডা দখল করে নেন। কিন্তু দিল্লী থেকে দারা শিকোহ ও তাঁর ভগ্নী

জাহানারার পরামর্শে শাহজাহান ঔরঙ্গজেবকে গোলকুণ্ডার দুর্গ অবরোধ প্রত্যাহার করতে নির্দেশ দেন, এবং বার্ষিক করপ্রদানের চুক্তিতে বশ্যতা স্বীকার করে আবদুল্লা রেহাই পান।

৪ ॥ বিজয়নগর

দ্বিতীয় বেঙ্কটের (১৫৮৬-১৬১৪) আমলে বিজয়নগর তার হৃতমর্যাদা কিছুটা ফিরে পেয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর পর চার বছর গৃহযুদ্ধের পর বিজয়নগরের রাজা হন রামদেবরায় (১৬১৮-১৬৩০) এবং তৃতীয় বেঙ্কট (১৬৩০-১৬৪১)। পরবর্তী রাজা তৃতীয় শ্রীরঙ্গের (১৬৪১-১৬৪৯) সময় বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সেনাপতি দ্বয়ের—মুস্তাফা খান ও মীরজুমলার—ক্রমাগত অভিযানে, সামন্তবর্গের বিদ্রোহে এবং মাদুরা, তাঞ্জোর ও জিঞ্জির নায়কদের বিরুদ্ধাচরণে বিজয়নগরের পুরোপুরি পতন ঘটে।

৫ ॥ বৈদেশিক শক্তিসমূহ

জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের সঙ্গে পোর্তুগীজদের সম্পর্ক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে শাহজাহান হুগলীর পোর্তুগীজ বসতি ধ্বংস করেন। চট্টগ্রাম অঞ্চলের পোর্তুগীজরা আরাকান রাজ কর্তৃক পরাজিত হয়। পূর্ববঙ্গের ভুঁইয়াদের মধ্যে কেউ কেউ স্থানীয় অথবা মুঘলদের সঙ্গে যুদ্ধে পোর্তুগীজদের সাহায্য নিয়েছিলেন। তাঁদের কথা পরবর্তী অনুচ্ছেদে বলা হবে। ১৬৬৫র মধ্যে বঙ্গদেশ থেকে পোর্তুগীজরা একেবারেই উৎখাত হয়ে যায়। একমাত্র গোয়াতেই তারা কোনক্রমে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখে।

বাণিজ্যক্ষেত্রে পোর্তুগীজদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে আসে ডাচ বা ওলন্দাজরা। ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে তারা গোয়া অবরোধ করে। তার কিছুকাল পরেই জাভা বা যবদ্বীপ তাদের করায়ত্ত হয়। সুমাত্রা ও জাভার মধ্যবর্তী সুন্দার জলপথ তাদের অধীনে আসে। ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে তারা বাটাভিয়া নগরের পত্তন করে। ১৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে মালাক্কা বন্দর তাদের অধিকারে আসে। ১৬৩৮ থেকে ১৬৫৮র মধ্যে তারা সিংহল থেকে পোর্তুগীজদের বিতাড়িত করে। হল্যাণ্ডে ওলন্দাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী স্থাপিত হয় ১৬০২ খ্রীষ্টাব্দে। ওলন্দাজরা প্রথম কুঠি নির্মাণ করে সুরাটে এবং তারপর মাদ্রাজের উত্তরে পুলিকটে (১৬১০)। মসুলিপতম বন্দরটি তাদের বাণিজ্যের প্রধান

কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। ১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী জেলার অন্তর্গত চুঁচুড়ায় তাদের বাণিজ্য কুঠি স্থাপিত হয়। আরও দুটি কুঠি স্থাপিত হয় কাশিমবাজারে ও পাটনায়। ওলন্দাজদের মূল কর্মকেন্দ্র পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে হওয়ায় ভারতবর্ষে তাদের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। তবে স্থানীয় দ্বন্দ্বসমূহে তারা অংশগ্রহণ করত, বিশেষ করে তাদের প্রতিপক্ষে যদি পোর্তুগীজ বা ইংরাজরা থাকত।

ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী স্থাপিত হয় ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে। ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন উইলিয়ম হকিন্স জাহাঙ্গীরের রাজসভায় হাজির হন, কিন্তু তিনি সুরাটে কুঠি নির্মাণের অনুমতি পাননি। ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন মিডলটন পোর্তুগীজ নৌবাহিনীকে বোম্বাই-এর নিকট পরাজিত করেন। এই যুদ্ধটির পিছনে মুঘলদের সক্রিয় সমর্থন ছিল। এরপর ইংরাজেরা সুরাটে কুঠি নির্মাণ করে (১৬১২)। এছাড়া আহমদাবাদ, বুরহানপুর, আজমীর ও আগ্রাতেও তাদের কুঠি স্থাপিত হয়। স্যার টমাস রো ১৬১৮ খ্রীষ্টাব্দে জাহাঙ্গীরের নিকট থেকে এদেশে বাণিজ্য করার ফরমান আদায় করেন।

১৬১২ থেকে ১৬৬৫ পর্যন্ত পশ্চিম উপকূলে ইংরাজ বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল সুরাট, পরে সেই স্থান দখল করে বোম্বাই। করোমণ্ডল বা পূর্ব উপকূলের পুলিকটে ১৬১১ এবং ১৬১৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজেরা কুঠি স্থাপনের চেষ্টা করে, কিন্তু ওলন্দাজদের প্রবল বাধায় তারা সেখান থেকে সরে গিয়ে মসুলিপতমে কুঠি নির্মাণ করে। কিন্তু সেখানেও ওলন্দাজদের প্রবল বিরুদ্ধাচরণের ফলে ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে তারা মসুলিপতম ত্যাগ করে আরও দক্ষিণে অরুমুগামে চলে যায়। ১৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষ ও প্লেগের ফলে মসুলিপতম পরিত্যক্ত হলে ইংরাজেরা সেখানে ফিরে আসে এবং গোলকুণ্ডার সুলতানের কাছ থেকে সেখানে পাকাপাকি বাণিজ্যকেন্দ্র গড়বার ফরমান পায়। মসুলিপতম কুঠির কর্তা ফ্রান্সিস ডে পোর্তুগীজ কলোনী সান থোমের নিকটবর্তী একটি স্থানে স্থানীয় হিন্দু নায়কের অনুমতিক্রমে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন (১৬৩০) যা সেণ্ট জর্জ দুর্গ নামে পরিচিত। পরে মীরজুমলা ওই অঞ্চলের মালিক হলে সান থোমের পোর্তুগীজদের বিরুদ্ধে তাঁকে সাহায্য করে ইংরাজেরা অধিকতর রাজকীয় আনুকূল্য লাভ করে। ১৬৫২ খ্রীষ্টাব্দে সেণ্ট জর্জ দুর্গ থেকেই মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির সূচনা হয়।

বঙ্গদেশে হরিহরপুর ও বালেশ্বরে ইংরাজদের কুঠি গড়ে ওঠে। শাহজাহানের সময় বঙ্গের শাসনকর্তা রাজকুমার সুজা সমগ্র প্রদেশে ইংরাজদের বাণিজ্য করার বিশেষ

সুযোগ দেন। ১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে হুগলীতে ইংরাজদের প্রধান কুঠি স্থাপিত হয়। বালেশ্বর পাটনা ও কাশিমবাজারের কুঠিগুলি হুগলী কুঠির অধীনে ছিল।

৬॥ জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের আমলে বঙ্গদেশ

জাহাঙ্গীর কর্তৃক ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে ইসলাম খান বঙ্গদেশের সুবাদার নিযুক্ত হন। কার্যত বঙ্গদেশের মুঘল অধিকার বলতে রাজধানী রাজমহল ও সংলগ্ন কিছু এলাকা বোঝাত। তার বাইরে ছোট বড় জমিদার ও আফগান নায়কেরা প্রায় স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করতেন। স্বাধীন বৃহৎ জমিদার সংখ্যায় ছিলেন বারো জন। এই কারণে তাঁদের বলা হত বারো ভুঁইয়া। এঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন ইসা খানের পুত্র মুসা খান, যাঁর জমিদারী ছিল ঢাকা ও ত্রিপুরা জেলার অর্ধেক, প্রায় সমগ্র মৈমনসিং জেলা এবং রংপুর, বগুড়া ও পাবনা জেলার কিয়দংশ, ভূষণার জমিদার সত্রাজিৎ এবং সুসঙ্গের জমিদার রঘুনাথ, যশোহর, খুলনা ও বাখরগঞ্জ জেলার অধিকারী রাজা প্রতাপাদিত্য, বাকলার জমিদার রামচন্দ্র, ভুলুয়ার জমিদার অনন্তমাণিক্য এবং আরও অনেকে। বিদ্রোহী আফগানদের প্রধান কেন্দ্র ছিল শ্রীহট্ট জেলা। এদের নেতা ছিলেন বায়জিদ কাররানী, খাজা উসমান, আনোয়ার খান প্রভৃতি। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গে তিনজন বড় জমিদার প্রায় স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করতেন, যাঁরা ছিলেন মল্লভূম ও বাঁকুড়ার বীর হাম্বীর, পাঞ্চেতের শামস্ খান ও হিজলীর সেলিম খান।

ইসলাম খান মুসা খানকে দমন করার জন্য প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে একটি চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের তিন প্রধান জমিদার—হাম্বীর, শামস্ ও সেলিম—মুঘলদের অল্প প্রতিরোধ করে বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন। ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দে ইসলাম খানের বাহিনী রাজশাহী জেলার অন্তর্গত আলাইপুরে পৌছালে পুঁটিয়ার পীতাম্বর, চিলাজুয়ারের অনন্ত ও আলাইপুরের ইলাহ্ বকস্ তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন। আলাইপুর থেকে ইসলাম খান ভূষণার বিরুদ্ধে বাহিনী প্রেরণ করলে কিছু প্রতিরোধের পর সেখানকার জমিদার সত্রাজিৎ মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার করেন। এরপর তিনি পরিকল্পিত উপায়ে মুসা খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন। কাটাশগড়, ডাকচেরা, যাত্রীপুর, কত্রাভু ও সোনারগাঁওয়ের দুর্গগুলি মুঘলগণ কর্তৃক অধিকৃত হবার পর মুসা খান বশ্যতা স্বীকার করেন ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দে। এরপর ইসলাম খান যশোহরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। মুসা খানের বিরুদ্ধে ইসলাম খানকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতাপ সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছিলেন। ইছামতীর নৌযুদ্ধে এবং পরে

কাতারঘাটার যুদ্ধে প্রতাপ পরাজিত ও বন্দী হন (১৬১২)। এরপর ইসলাম খান শ্রীহট্টের নিকট দৌলম্বাপুরে আফগান উসমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। ইসলাম খান এবারে পরাজিত হলেও উসমান যুদ্ধক্ষেত্রে মারা যাবার ফলে বিদ্রোহী আফগানরা বশ্যতা স্বীকার করে। ইসলাম খান ঢাকায় বঙ্গদেশের রাজধানী স্থানান্তরিত করেন।

ইসলাম খানের মৃত্যুর পর তাঁর ভাই কাশিম খানের আমলে আরাকানের মগ রাজা ও পোর্তুগীজ সিবাস্টিয়ান গঞ্জালেস ভুলুয়া প্রদেশ বিধ্বস্ত করেন (১৬১৪)। তাঁর আমলে আসাম ও চট্টগ্রামে মুঘল অভিযান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় (১৬১৪-১৭)। পরবর্তী সুবাদার ইব্রাহিমের আমলে বিদ্রোহী রাজকুমার খুররম বঙ্গদেশ জয় করেন (১৬২৪)। কিন্তু পরে তিনি বাদশাহী বাহিনীর কাছে পরাজিত হয়ে দাক্ষিণাত্যে চলে যান। ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে খুররম শাহজাহান রূপে মুঘল সম্রাট হবার পর ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী থেকে পোর্তুগীজরা বিতাড়িত হয়। রাজকুমার সুজা অতঃপর বঙ্গদেশের সুবাদার নিযুক্ত হন এবং ১৬৫৯ পর্যন্ত খুবই দক্ষতার সঙ্গে বঙ্গ দেশের শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করেন। ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে বিবাদের কালে সুজা খাজুয়ার যুদ্ধে (জানুয়ারি ১৬৫৯) পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন। মুঘল সেনাপতি মীরজুমলা তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করে ঢাকা নগর দখল করেন (মে ১৬৬০) এবং অতঃপর তিনিই বঙ্গদেশের সুবাদার নিযুক্ত হন।

৭॥ শিখ শক্তির উত্থান

শিখ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা নানক বাবর ও ইব্রাহিম লোদীর সমকালীন ছিলেন। শিখদের বিকাশ হয়েছিল শান্তিপ্রিয় একটি ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসাবে। আকবর শিখ-ধর্মের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

শিখদের পঞ্চম গুরু অর্জুন (১৫৮১-১৬০৬) জাহাঙ্গীরের বিদ্রোহী পুত্র খুসরবকে আশীর্বাদ করেছিলেন। সেই সময় খুসরব তাঁকে বলেন যে তিনি একেবারে নিঃস্ব এবং তাঁর কাবুল যাবার জন্য কিছু অর্থের প্রয়োজন। অর্জুন সরলভাবেই তাঁকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে সাহায্য করেন। জাহাঙ্গীর খুসরবের বিদ্রোহ দমন করে, অর্জুন খুসরবকে সাহায্য করেছিলেন এই অপরাধ দেখিয়ে তাঁর উপর দুলক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য করেন। অর্জুন তা দিতে অস্বীকার করলে তাঁর প্রাণদণ্ড দেওয়া হয় (১৬০৬)। এই ঘটনাটি শিখদের এমনভাবে উত্তেজিত করে যে অতঃপর তাদের জীবনধারা ভিন্ন পথে প্রবাহিত হতে শুরু করে।

পরবর্তী শিখগুরু হরগোবিন্দ (১৬০৬-৪৪) শিখদের সামরিক শক্তি হিসাবে গড়ে তোলার প্রয়াস পান। তিনি অমৃতসরে লোহগড় নামক একটি দুর্গ নির্মাণ করেন, এবং নিছক ধর্মগুরুর কাজ ছাড়াও শিখদের রাজনৈতিক নেতৃত্বও গ্রহণ করেন। হরগোবিন্দের মতিগতি জাহাঙ্গীরের পছন্দ না হওয়ায় তাঁকে তিনি বন্দী করেন। এই বন্দীত্ব হরগোবিন্দের পক্ষে লাভজনকই হয়েছিল, কারণ অন্যান্য অভিজাত সহবন্দীদের কাছ থেকে তিনি মুঘল সাম্রাজ্যের প্রকৃত অবস্থা, তার শক্তি ও দুর্বলতার উৎসগুলি বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি এও বুঝেছিলেন শুধু বীরত্ব ও গোঁয়ার্তুমি রাজনৈতিক সাফল্যের কারণ হতে পারে না, তার জন্য দরকার কূটনীতির প্রয়োগ। ১৬২১ খ্রীষ্টাব্দে মুক্তিলাভের পর তিনি জাহাঙ্গীরের পাঞ্জাব অভিযানে সাহায্য করেন। জাহাঙ্গীরও তাঁকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেন এবং তাঁর কাশ্মীর ভ্রমণকালে তাঁকে সঙ্গে নেন।

শাহজাহান বাদশাহ হবার পর হরগোবিন্দ তাঁর অধীনতা স্বীকার করেন। তাঁর সময় পাঞ্জাবের অভিজাত মুসলমানদের অনেকে শিখধর্ম অবলম্বন করাতে শাহজাহান উদ্বিগ্ন হন। ক্রমশ শাহজাহানের সঙ্গে হরগোবিন্দের সম্পর্ক খুবই তিক্ত হয়ে ওঠে, এবং হরগোবিন্দ সম্রাটের কর্তৃত্ব অস্বীকার করেন। ১৬৩৪ থেকে ১৬৪০ পর্যন্ত হরগোবিন্দ এক নাগাড়ে মুঘলদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যান। গোড়ায় তিনি রীতিমত সাফল্যলাভ করেছিলেন, কিন্তু বিশাল মুঘলবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধরত থেকে এ-সাফল্য টিঁকিয়ে রাখা যাবে না ভেবে তিনি দুর্গম কিরাতপুর অঞ্চলে ঘাঁটি করেন এবং তিব্বত ও খোটান সীমান্তে বহু লোককে শিখধর্মে দীক্ষিত করেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

মুঘল অবক্ষয়ের সূচনা

১॥ ঔরঙ্গজেব : প্রাথমিক বিদ্রোহ দমন ও পূর্ব-ভারত অভিযান

ঔরঙ্গজেব যদিও সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে, ভাইদের পরাজিত করে নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে তাঁর আরও দু'বছর সময় লেগেছিল। তাঁর রাজত্বের শুরুতেই কয়েকটি ছোট খাট বিদ্রোহ হয়েছিল যেগুলি দমন করতে বিশেষ বেগ পেতে হয় নি। ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে বুন্দেলখণ্ডের চম্পৎরাই বিদ্রোহ করেছিলেন। সৌরাষ্ট্রের নবনগরের জাম রাজা ছত্রসালকে রাই সিং নামক একজন ব্যক্তি উৎখাত করেছিল। ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মুঘলবাহিনী ছত্রসালকে স্বপদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে। ওই বছরেই বিকানীরের রাও করণ বিদ্রোহ করেন এবং পরে বশ্যতা স্বীকার করে মার্জনালাভ করেন।

১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে বিহারের মুঘল শাসক দাউদ খান পালামৌ দখল করেন। ১৬৬৫তে লাদাকের শাসক মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার করেন।

ঔরঙ্গজেবের রাজ্যকালের একটি প্রধান ঘটনা মুঘল বাহিনী কর্তৃক অহোমরাজ্য দখল। ইতিপূর্বে মুঘলবাহিনী বহু চেষ্টা সত্ত্বেও অহোম রাজ্য অধিকারে ব্যর্থ হয়েছিল। ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে কোচবিহার ও পশ্চিম ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা মুঘলদের হাতে আসে। ১৬৬১তে মীরজুমলা আসাম অভিযান করেন, এবং ১৬৬২র ১৭ই মার্চ অহোমরাজ্যের রাজধানী গড়গাঁও-এ পৌঁছান। অহোম রাজা জয়ধ্বজ পলায়ন করেন। গড়গাঁও থেকে মুঘল বাহিনী মথুরাপুর যাত্রা করে, কিন্তু সেখানে ব্যাপক মহামারী দেখা দেওয়ায় ওই বাহিনী বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বর্ষা অন্তে মুঘলবাহিনী কামরূপে রাজা জয়ধ্বজের অনুসরণে যাত্রা করে। কিন্তু উভয় পক্ষেরই তখন খুবই কাহিল অবস্থা। অতঃপর জয়ধ্বজের সঙ্গে মীরজুমলার সন্ধি হয়। জয়ধ্বজ দারাং জেলাটি মুঘলদের সমর্পণ করেন এবং বার্ষিক করপ্রদানে প্রতিশ্রুত হন। আসামে থাকতে মীরজুমলা অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। ঢাকায় ১৬৬৩-র ৩১শে মার্চ তারিখে তাঁর মৃত্যু হয়।

১৬৬৭ খ্রীষ্টাব্দে অহোমরাজ চক্রধ্বজ মুঘল অধিকৃত অঞ্চলগুলি পুনরাধিকার করেন

এবং গৌহাটি দখল করেন। রাজা জয়সিংহের পুত্র রাজা রামসিংহ দীর্ঘকাল আসামে অবস্থান করে মুঘল অধিকার ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হন। ১৬৭৬ খ্রীষ্টাব্দে রামসিংহকে সরিয়ে আনা হয়। ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দে মুঘল বাহিনী গৌহাটি দখল করে। কিন্তু অহোমরাজ গদাধর সিংহ ১৬৮১ খ্রীষ্টাব্দে গৌহাটি পুনরুদ্ধার করেন। কামরূপ কার্যত মুঘলদের হাতছাড়া হয়ে যায়।

১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দে কোচবিহার মুঘল বাহিনীকে বিতাড়িত করে স্বাধীন হয়ে গিয়েছিল। ১৬৬৪তে বাংলার সুবাদার শায়েস্তা খান কোচবিহার পুনর্দখলের চেষ্টা করলে কোচবিহারের রাজা মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার করে করপ্রদান করেন। শায়েস্তা খানের সময় চট্টগ্রাম মুঘল অধিকারে আসে। ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বরে মুঘল নৌবাহিনী সন্দীপ দখল করে। স্থানীয় ফিরিঙ্গী বা পোর্তুগীজদের সঙ্গে বোঝাপড়া করে শায়েস্তা খান ১৬৬৬র জানুয়ারিতে আরাকানীদের পরাস্ত করে চট্টগ্রাম দখল করেন।

২॥ ঔরঙ্গজেব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত

উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের আফ্রিদি, ইউসুফজাই, খত্তকি প্রভৃতি উপজাতিরা মুঘল অধিকৃত এলাকায় প্রায়ই হামলা করত। ১৬৭২ খ্রীষ্টাব্দে আফ্রিদি সর্দার অকমল খান আফগানিস্তানের মুঘল শাসক আমিন খানকে শোচনীয় ভাবে পরাজিত করেন। অপরাপর বিদ্রোহী উপজাতিরাও অকমল খানের সামিল হয়ে স্বাধীনতার যুদ্ধ ঘোষণা করে। ঔরঙ্গজেব মহাবৎ খানকে অতঃপর আফগানিস্তানের শাসক করে প্রেরণ করেন, কিন্তু তিনি কিছুই করতে পারেন না। এরপর সুজাত খান বিরাট বাহিনীসহ প্রেরিত হন, কিন্তু তিনি ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে করাপা গিরিপথে পরাজিত ও নিহত হন। এরপর ঔরঙ্গজেব স্বয়ং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অভিমুখে অগ্রসর হন এবং হাসান আবদাল নামক স্থানে ঘাঁটি করেন। সেখানে অবস্থান করে তিনি বহু উপজাতীয় গোষ্ঠীপতিকে অর্থের দ্বারা ক্রয় করতে সমর্থ হন। অধিকতর দুর্বিনীত গোষ্ঠীগুলিকে—যেমন ঘোরাই, খিলজাই, সিরানি, ইউসুফজাই প্রভৃতিকে—তিনি বলপূর্বক ছত্রভঙ্গ করেন। এদিকে অকমল খানের মৃত্যুর পর উপজাতীয়দের মধ্যে বিশৃংখলা দেখা যায়। অবস্থা অনুকূল বুঝে ১৬৭৫-এর শেষের দিকে ঔরঙ্গজেব দিল্লীতে ফিরে আসেন। ১৬৭৭ খ্রীষ্টাব্দে আমীর খান কাবুলের শাসক নিযুক্ত হন। তাঁর কূটনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ফলে ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত উত্তর পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে শান্তি বজায় ছিল।

৩॥ দাক্ষিণাত্য : প্রথম পর্যায় : মারাঠাদের উত্থান : শিবাজী

ঔরঙ্গজেব যখন উত্তর ভারত, বিশেষ করে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ব্যস্ত সেই সময় দাক্ষিণাত্যে নূতন ভাবে রাজনৈতিক শক্তির পুনর্বিন্যাস ঘটছিল। এই বিন্যাসের সূত্রপাত অবশ্য শাহজাহানের রাজত্বের শেষ পর্যায় থেকে।

ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালের গোড়ার দিকে দাক্ষিণাত্যে একজন মুঘল সুবাদার ছিলেন। আহমদনগর পূর্বেই মুঘল অধিকারে চলে এসেছিল। অবশিষ্ট ছিল গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর। কিন্তু আর একটি তৃতীয় শক্তির অভ্যুদয় অলক্ষ্যে ঘটছিল। তা ছিল শিবাজীর নেতৃত্বে একটি নবগঠিত মারাঠা রাজ্য। শিবাজীর পিতা শাহজী ভোঁসলে আহমদনগরের সুলতানের অধীনে একটি ছোট জায়গীরের অধিকারী ছিলেন। ক্রমশঃ তিনি আহমদনগর দরবারের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হয়ে উঠেছিলেন। ১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দে শাহজাহান আহমদনগর অধিকার করার পর ১৬৩৬ খ্রীষ্টাব্দে শাহজী বিজাপুরের সহযোগিতায়, নিজামশাহী বংশের একজনকে আহমদ-নগরের সুলতান হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন, এবং বিজাপুরে সুলতান মুহম্মদ আদিল শাহের অধীনে একজন সেনাপতির পদ গ্রহণ করেন।

শাহজীর পুত্র শিবাজী মহারাষ্ট্রের মাওলি উপজাতিদের সহায়তায় একটি বাহিনী গঠন করে ১৬৪৬ থেকে ১৬৫৬-র মধ্যে বিজাপুরের সুলতান মুহম্মদ আদিলের দীর্ঘ-স্থায়ী অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে তোরনা, কোন্ধানা, রোহিরা, চাকন ও পুরন্দর দুর্গ বিজাপুরের অধিকার থেকে দখল করেন এবং রায়গড় নামে নিজস্ব একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। ১৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মহাবালেশ্বর পর্বতাঞ্চলে অবস্থিত জাবাল নামক একটি ছোট রাজ্য জয় করেন, যেখানে তিনি প্রতাপগড় নামক দুর্গ স্থাপন করেন। অতঃপর তিনি উত্তর কোঙ্কনে বিস্তৃত লুঠতরাজ চালান, বিশেষ করে কল্যাণ ও ভিওয়ান্দি শহরদ্বয়ে, এবং মাহুলি নামক একটি দুর্গ দখল করে উত্তর কোঙ্কনে একটি স্থান করে নেন। ১৬৫৯-এর মধ্যেই সাতারা জেলার দক্ষিণ পর্যন্ত তাঁর অধিকার বিস্তৃত হয়।

১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে মুঘলরা যখন বিজাপুর অভিযানে ব্যস্ত সেই সুযোগে শিবাজী মুঘল অধিকৃত আহমদনগরে হামলা করেন এবং জুন্নার শহরে ব্যাপক লুণ্ঠন করেন। দাক্ষিণাত্যের তৎকালীন মুঘল সুবাদার ঔরঙ্গজেব শিবাজীর শক্তিবৃদ্ধিকে বরদাস্ত করতে রাজি ছিলেন না। ওই বছরেই মুঘল বাহিনীর আক্রমণে শিবাজী পরাজিত হন, এবং বিজাপুরের সঙ্গে মুঘলদের সন্ধি চুক্তি তৈরি হবার সময় শিবাজী মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার করেন। এতে ঔরঙ্গজেব সন্তুষ্ট হন। ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে বিজাপুরের

সুলতান শিবাজীকে দমন করার জন্য আফজল খানকে প্রেরণ করেন। কিন্তু শিবাজী কৌশলে আফজল খানকে হত্যা করেন এবং আকস্মিক আক্রমণে বিজাপুরের বাহিনীকে পর্যুদস্ত করেন। আদিল শাহী সুলতানীর মর্যাদা এতে দারুন ভাবে ঘা খায়। ওই বছরেই শিবাজী দক্ষিণ কোঙ্কণ ও কোলহাপুর দখল করেন। ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে শিবাজী বিজাপুরের সেনাপতি সিদ্দি জৌহর কর্তৃক পানহালা দুর্গে আবদ্ধ হন এবং দুর্গটি সিদ্দিকে সমর্পণ করতে বাধ্য হন।

ইতিমধ্যে ঔরঙ্গজেব মুঘল সিংহাসনে আসীন হয়ে শায়েস্তা খানকে দাক্ষিণাত্যের শাসকপদে নিযুক্ত করেন। শায়েস্তা খান ১৬৬০ সালেই শিবাজীকে চাকন, কল্যাণ ও উত্তর কোঙ্কনের দুর্গগুলি থেকে উৎখাত করেন। কিন্তু ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল অকস্মাৎ একটি নৈশ আক্রমণের দ্বারা শিবাজী শায়েস্তা খানকে আহত করেন, এবং তাঁর পুত্রকে নিহত করেন। ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে শিবাজী সুরাট বন্দর লুণ্ঠন করেন এবং প্রায় এককোটি টাকা মূল্যের সম্পদ আহরণ করেন।

এতে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে ঔরঙ্গজেব শায়েস্তা খানকে বদলী করেন এবং জয়সিংহ ও দিলীর খানকে শিবাজী ও বিজাপুরের দ্বিতীয় আলি আদিল শাহের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। শেষোক্তজন ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বাক্ষরিত মুঘলদের সঙ্গে চুক্তির শর্তাবলী লংঘন করেছিলেন। জয়সিংহ শিবাজীর শত্রুবর্গের সঙ্গে মিত্রতা করে তাঁকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন এবং শিবাজীকে পুরন্দর দুর্গে অবরোধ করেন। মুঘল বাহিনীর সঙ্গে পেরে ওঠা সম্ভবপর নয় জেনে তিনি জয়সিংহের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর সঙ্গে পুরন্দরের সন্ধি সম্পাদন করেন (১২ই জুন ১৬৬৫)। এই সন্ধি অনুযায়ী বারোটি দুর্গ নিজের হাতে রেখে শিবাজী তেইশটি দুর্গ মুঘলদের হাতে সমর্পণ করেন এবং মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার করেন। মুঘলরা এরপর বিজাপুর আক্রমণ করলে শিবাজী সর্বতোভাবে মুঘলদের সাহায্য করেন।

জয়সিংহের উপদেশে শিবাজী আগ্রায় মুঘল দরবারে হাজিরা দেন ১৬৬৬র ১২ই মে তারিখে। সেখানে তাঁকে পাঁচ হাজারী মনসবদারের মর্যাদা দেওয়া হলে তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে প্রতিবাদ করেন এবং উত্তেজনায় অজ্ঞান হয়ে গিয়ে রাজসভায় একটি দৃশ্যের সৃষ্টি করেন। এরপর তাঁকে আগ্রায় নজরবন্দী করে রাখা হয়, কিন্তু তিনমাস পরে ১৬৬৬-র ১৯শে আগস্ট তারিখে তিনি পলায়ন করেন এবং সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখে রায়গড়ে উপস্থিত হন।

এদিকে শিবাজীর সঙ্গে পুরন্দরের সন্ধির পর জয়সিংহ বিজাপুরে অভিযান

করেন। তিনি অনেকগুলি দুর্গ অধিকার করে রাজধানীর বারো মাইলের মধ্যে চলে আসেন, কিন্তু বিজাপুরের সুলতান দ্বিতীয় আলি আদিল শাহের প্রবল প্রতিরোধের ফলে মুঘলবাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হয়, এবং শেষ পর্যন্ত প্রবল ক্ষতি স্বীকার করে ঔরঙ্গাবাদে ফিরে আসে। জয়সিংহকে অতঃপর ঔরঙ্গজেব আগ্রায় তলব করেন, কিন্তু পথে বুরহানপুরে ১৬৬৭-র ২৮শে আগস্ট জয়সিংহ মারা যান।

রায়গড়ে প্রত্যাবর্তনের পর শিবাজী তিন বছর মুঘলদের বিরুদ্ধে কোন আক্রমণাত্মক যুদ্ধ করেননি। ১৬৬৮ খ্রীষ্টাব্দে মুঘলদের সঙ্গে তাঁর আনুষ্ঠানিক একটি সন্ধি হয় এবং ঔরঙ্গজেব তাঁকে রাজা উপাধি দেন। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের সুবাদার শাহ আলম এবং মুঘল সেনাপতি দিলীর খানের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হলে সেই সুযোগে শিবাজী ১৬৭০ খ্রীষ্টাব্দে সিংহগড় দুর্গ দখল করেন এবং কল্যাণ ও উত্তর কোঙ্কণের কয়েকটি স্থান অধিকার করেন। ওই বছরেই তিনি দ্বিতীয়বার সুরাট লুণ্ঠন করেন, ঔরঙ্গাবাদ ও মুঘল অধিকৃত বাগলান, খান্দেশ ও বেরারে হামলা করেন এবং খান্দেশ ও গুজরাতের সীমানায় সালহের দুর্গ অধিকার করেন।

এই সকল ঘটনায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ঔরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যের মুঘল সুবাদার শাহ আলমকে বরখাস্ত করে তাঁর জায়গায় ১৬৭২ খ্রীষ্টাব্দে বাহাদুর খানকে নিযুক্ত করেন। বাহাদুরও দাক্ষিণাত্যে মুঘলদের অবস্থার পরিবর্তন করতে পারেননি। শিবাজী সুরাটের দক্ষিণে জাওহর ও রামনগর নামক দুটি ছোট রাজ্য দখল করেন এবং দাক্ষিণাত্যের নানাস্থান থেকে চৌথ আদায় করতে শুরু করেন। ১৬৭২ খ্রীষ্টাব্দে বিজাপুরের সুলতান দ্বিতীয় আলি আদিল শাহ মারা গেলে যে অরাজকতা দেখা দিয়েছিল তার সুযোগে, এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্তের উপজাতীয় বিদ্রোহ দমন করার জন্য দাক্ষিণাত্য থেকে মুঘল বাহিনীর শ্রেষ্ঠ অংশকে সরিয়ে নিয়ে যাবার সুযোগে শিবাজী নিজের শক্তিকে পুরোদস্তর সংহত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ১৬৭২ থেকে ১৬৭৮ খ্রীষ্টাব্দে মধ্যে মুঘলবাহিনী শিবাজীর বিরুদ্ধে কয়েকটি এলোমেলো ওপরিকল্পনা হীন যুদ্ধ করে নিছক নিজেদের শক্তিক্ষয় করা ভিন্ন আর কিছুই করতে পারেনি।

১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ৬ই জুন তারিখে রায়গড়ে বিরাট জাঁকজমকের সঙ্গে শিবাজীর আনুষ্ঠানিক অভিষেক হয়। ১৬৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গোলকুণ্ডার সঙ্গে সন্ধি করে জিঞ্জি ও ভেলোর এবং তৎসহ তামিলনাড়ু ও মহীশূরের বহু অঞ্চল অধিকার করেন। ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে শিবাজী মারা যান, কিন্তু তিনি যে শক্তিমান মারাঠা রাজ্যের পত্তন করেন ঔরঙ্গজেবের কাছে সারা জীবন তা দুঃস্বপ্নের মতই ছিল।

৪ ॥ বিদ্রোহ দমন ও রাজপুতদের সঙ্গে ঔরঙ্গজেবের যুদ্ধ

ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালের অধিকাংশই নানাস্থানের বিদ্রোহ দমনে ব্যয়িত হয়েছিল। এই সকল বিদ্রোহের কারণ হিসাবে ঔরঙ্গজেবের ধর্মনীতিকে সচরাচর দায়ী করা হয়। ঔরঙ্গজেব নিজে গোঁড়া সুন্নী মুসলমান ছিলেন, এবং হিন্দুদের প্রতি তাঁর আচরণ পক্ষপাতমূলক ছিল এতে কোন সন্দেহ নেই (যদিও পূর্ববর্তী কোন কোন ধর্মান্ধ সুলতানের আমলে অমুসলমানদের ঔরঙ্গজেবের আমলের তুলনায় শতগুণে নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছিল)। এছাড়া জিজিয়া করের পুনঃস্থাপন করে (যদিও তার মধ্যে অযৌক্তিকতা কিছু ছিল না, পূর্বে উল্লিখিত জিজিয়ার মূলনীতিগুলি দ্রষ্টব্য) ঔরঙ্গজেব হিন্দুদের কাছে রীতিমত অপ্রিয় হযেছিলেন। তাঁর নির্দেশে কয়েকটি মন্দিরও ভাঙা হয়েছি। যাতে হিন্দু প্রজাদের মনে যথেষ্ট ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল।

কিন্তু তাঁর ধর্মনীতিই যে তাঁর আমলের দেশজোড়া বিদ্রোহের কারণ, একথা জোর দিয়ে বলা যায় না। তাহলে তাঁর থেকেও উগ্র হিন্দুবিদ্বেষী সুলতানদের আমলে বহুতর বিদ্রোহ হবার সম্ভাবনা ছিল যা কিন্তু বাস্তবে ঘটেনি। বিদ্রোহ গোটা মধ্যযুগের একটি সাধারণ রাজনৈতিক পদ্ধতি ছিল। ঔরঙ্গজেবের পূর্ববর্তী সকল মুঘল সম্রাটই বিদ্রোহের সম্মুখীন হয়েছিলেন। সেযুগে রাজনৈতিক কাঠামোটাই এই রকম ছিল যে প্রায়-স্বাধীন স্থানীয় শক্তিগুলি মাঝে মাঝে বেকায়দায় পড়ে কেন্দ্রীয় শক্তির আনুষ্ঠানিক আনুগত্য স্বীকার করত, আর কেন্দ্রীয় শক্তি বেকায়দায় পড়লেই বিদ্রোহ করে স্বাধীন হবার চেষ্টা করত। কোন বাদশাহই কোন রাজ্যকে পাকাপাকি অধীন করতে পারেননি, একই জায়গায় বরাবর অভিযান চালাতে হয়েছে। ঔরঙ্গজেবের আমলে বিদ্রোহের মাত্রা একটু বেশি ছিল সন্দেহ নেই কেননা মুঘল সাম্রাজ্যের চরম বিস্তৃতি তাঁর সময়ই হয়েছিল, এবং ফলে বাদশাহ এক জায়গায় ব্যস্ত থাকলেই অন্য জায়গার বিদ্রোহ ঘটত। এছাড়া যেহেতু ঔরঙ্গজেব প্রাদেশিক সুবাদারদের বিশ্বাস করতেন না, এবং প্রত্যেককেই দাবিয়ে রাখতেন, তাঁদের এলাকায় কিছু ঘটলে নিজেরা উদ্যোগ নেবার পরিবর্তে তাঁরা গোটা ব্যাপারটাই সম্রাটের উপর ছেড়ে দিতেন। ফলে ঔরঙ্গজেবকে কোথাও না কোথাও সর্বদাই ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। এছাড়া মুঘল পদাধিকারীদের অন্তর্কলহ বিদ্রোহীদের বারবার উৎসাহিত করেছে।

১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে জাঠ কৃষকরা তিলপথের গোকলার নেতৃত্বে বিদ্রোহ করেছিল এবং মথুরার ফৌজদার আবদুল নবীকে হত্যা করেছিল। তারা সাহাবাদ পরগণা ও

আগ্রা জেলার বিস্তৃত এলাকা লুণ্ঠন করেছিল। মনে হয় এই বিদ্রোহের কারণ ছিল অর্থনৈতিক। মুঘল সেনাপতি হাসান আলি খান বিদ্রোহীদের পরাজিত করেন। গোকলাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ১৬৭২ খ্রীষ্টাব্দে নারনৌল ও মেওয়াটের সৎনামীরা বিদ্রোহ করে। সৎনামীরা ছিল কৃষক শ্রেণীর মানুষ, ধর্মমতের দিক থেকে উদারপন্থী ভক্তিবাদী সম্প্রদায়। একটি তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুঘলদের সঙ্গে সৎনামীদের বিরোধ লেগে যায়, এবং বিদ্রোহী সৎনামীরা মুঘলদের হটিয়ে নারনৌল দখল করে। সৎনামীদের বিরুদ্ধে ঔরঙ্গজেব রদন্দাজ খানকে প্রেরণ করেন এবং এই বিদ্রোহ সহজেই দমিত হয়।

রাজপুত রাজ্য মারবার দখল করার অভিপ্রায় বহুদিন থেকেই ঔরঙ্গজেবের ছিল। স্থানটির সামরিক গুরুত্ব ছিল অসাধারণ। মারবার রাজ যশোবন্ত সিংহ মুঘলদের একজন প্রধান সেনাপতি এবং মুঘল দরবারের একজন রীতিমত ক্ষমতাশালী সদস্য ছিলেন। ১৬৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর পেশোয়ার জেলার জামরুদ নামক স্থানে তাঁর অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হলে সেই সুযোগে তিনি মারবার দখলের প্রয়াস পান। তাঁকে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি কেননা রাঠোর সর্দারেরা সেই সময় উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে মুঘলবাহিনীর সঙ্গে অবস্থান করছিলেন। ঔরঙ্গজেব যশোবন্ত সিংহের এক সম্পর্কিত পৌত্র ইন্দ্র সিং রাঠোরকে পুতুল রাজা হিসাবে মারাবারের গদীতে বসিয়ে দেন এবং তাঁকে সাহায্যের অজুহাতে মারবারে অসংখ্য মুঘল পদাধিকারী ও সৈন্য মোতায়েন করেন।

এদিকে যশোবন্ত সিংহের বিধবা ১৬৭৯-এর এপ্রিলে একটি সন্তান প্রসব করেন, যার নাম অজিত সিংহ। যশোবন্তের পরিবারের লোকেরা শিশু অজিতকে নিয়ে দিল্লীতে উপস্থিত হন এবং দাবি করেন যে এই ন্যায়সঙ্গত উত্তরাধিকারীকে মারবারে সিংহাসন দেওয়া হোক। এই বিষয়ে ঔরঙ্গজেবের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে দুটি মত আছে। একটি মত অনুযায়ী ঔরঙ্গজেব তাঁকে মুঘল প্রাসাদে রাখতে চান সাবালক না হওয়া পর্যন্ত, দ্বিতীয় মত অনুযায়ী ঔরঙ্গজেব অজিতকে ইসলাম ধর্ম অবলম্বনের বিনিময়ে মারবারের সিংহাসন দিতে চান। কোনটি সত্য জানা না গেলেও, এটা ঠিক যে দিল্লী অজিতের পক্ষে নিরাপদ ছিল না। কাজেই রাঠোর বীর দুর্গাদাস অনেক ঝুঁকি নিয়েই অজিতকে নিয়ে মারবারে পালিয়ে আসেন। এর-পর মারবারের রাঠোররা মুঘলদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। ঔরঙ্গজেব নিজ পুত্র আকবরকে মারবারের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন (সেপ্টেম্বর ১৬৭৯)। মুঘলবাহিনী

যোধপুর শহর ধ্বংস করে।

এদিকে মেবারের মহারাণা রাজসিংহ বিষয়টির গুরুত্ব বুঝে মারবারকে সাহায্য করতে প্রস্তুত হচ্ছিলেন, কিন্তু তিনি কিছু করার আগেই, এরকম একটা ব্যাপার ঘটতে পারে বুঝে নিয়ে মুঘল বাহিনী অকস্মাৎ মেবার আক্রমণ করে এবং রাজসিংহ পরাজিত হন (২২ শে জানুয়ারি ১৬৮০)। কিন্তু মেবার ও মারবার উভয় স্থানের রাজপুতেরাই গেরিলা পদ্ধতি অবলম্বন করে যুদ্ধ চালিয়ে যায় এবং মুঘলদের রীতিমত ক্ষতি করতে শুরু করে। এদিকে ব্যর্থতার দরুন ক্রমাগত তিরস্কৃত হতে হতে রাজ-কুমার আকবর শেষ পর্যন্ত রাজপুতদের আশ্রয় নেন। মেবারের রাণা রাজসিংহ, এবং তাঁর মৃত্যুর (২২শে অক্টোবর ১৬৮০) পর তাঁর পুত্র জয়সিংহ, ও মারবারের রাঠোর সেনাপতি দুর্গাদাস ঔরঙ্গজেবকে হটিয়ে তাঁকে মুঘল সম্রাট হতে সাহায্য করার প্রতি-শ্রুতি দেন। যার ফলে ১৬৮১র ১লা জানুয়ারি আকবর নিজেকে দিল্লীর বাদশাহ ঘোষণা করে আজমীরে অবস্থানরত ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। ঔরঙ্গ-জেব এতে ভীষণ ভীত হয়ে পড়েন কেন না যুদ্ধ করার মত যথেষ্ট সৈন্যবাহিনী তাঁর তখন ছিল না। অবশেষে তাঁর বিশ্বস্ত ব্যক্তি তহাব্বুর খানের সাহায্যে ঔরঙ্গজেব একটি চিঠি রাজপুতদের পাঠিয়ে দেন যাতে এই রকম ইঙ্গিত দিল যে আকবর আসলে রাজপুতবাহিনীর মধ্যে প্রবেশ করে রাজপুতদের ভাঁওতা দিচ্ছেন এবং ঔরঙ্গজেবেরই কার্য সিদ্ধি করছেন। এই চিঠিতে উদ্বিগ্ন হয়ে মেবার বিশ্বাসঘাতক ভেবে আকবরকে পরিত্যাগ করে। মারবারের রাঠোর সর্দারেরাও অনুরূপ মনোভাব প্রকাশ করে। কিন্তু দুর্গাদাস চিঠিটিকে সঠিকভাবেই জাল বলে মনে করেছিলেন, কিন্তু এককভাবে তাঁর কিছু করার ছিল না। প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়ে তিনি আকবরকে খান্দেশ ও বালগানের মধ্য দিয়ে নিয়ে গিয়ে মারাঠা সম্রাট শম্ভুজীর আশ্রয়ে রেখে আসেন। এদিকে মেবারের সঙ্গে ঔরঙ্গজেবের সন্ধি চুক্তি হয় এবং ঔরঙ্গজেব মেবাবের সিংহাসনে রাজসিংহের পুত্র জয়সিংহকে মেনে নিলে মেবারের সঙ্গে মুঘলদের যুদ্ধ বিরতি হয় (জুন ১৬৮১)। কিন্তু মারবারের সঙ্গে যুদ্ধ এর পরেও সাতাশ বছর ধরে চলেছিল।

৫ ॥ ঔরঙ্গজেব ও শিখশক্তি

হরগোবিন্দের পরবর্তী দুজন শিখ গুরু হর রায় (১৬৪৪-৬১) এবং হরকিষণ (১৬৬১-৬৪) ধর্মীয় বিষয় নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। নবম গুরু তেগবাহাদুরের সময় (১৬৬৪-৭৫) মুঘলদের সঙ্গে শিখদের পুনরায় সংঘর্ষ বাধে। তেগবাহাদুরের বিরুদ্ধে

ঔরঙ্গজেবের অভিযোগ ছিল যে তিনি কাশ্মীরের বিদ্রোহীদের সাহায্য করেছেন এবং অনেক মুসলমানকে শিখ ধর্মে দীক্ষিত করেছেন। তাঁকে দিল্লীতে ডেকে পাঠানো হয় এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়। তিনি এই নির্দেশ মানতে অস্বীকার করায় ১৬৭৫এর ১১ই নভেম্বর তারিখে তাঁকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

দশম ও শেষ গুরু গোবিন্দ সিং (১৬৭৫-১৭০৮) মুঘলদের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁর সংগ্রাম ছিল মূলত ঔরঙ্গজেবের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে, এবং এই সংগ্রামে তিনি বহু মুসলমানের বিশেষ করে পাঠানদের সহায়তা পেয়েছিলেন। সাধৌরার বিখ্যাত মুসলিম সাধক পীর বাহাদুর শাহ তাঁকে সমর্থন করেছিলেন। সইদ বেগ এবং মইমু খান মুঘলদের বিরুদ্ধে তাঁর পক্ষে অস্ত্রধারণ করে-ছিলেন। মুঘলদের আঘাত হানার জন্য গোবিন্দ উপযুক্ত সময় বেছে নিয়েছিলেন। যখন ঔরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যে মারাঠাদের বিরুদ্ধে জীবন মরণ সংগ্রামে লিপ্ত, তখন পাঞ্জাব ছিল রাজকুমার মুয়াজ্জমের শাসনাধীন। লাহোর ও কাংরার শাসকরা গোবিন্দকে শায়েস্তা করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। গোবিন্দ রাজপুতদের দলে টানতে চেয়েছিলেন, কিন্তু জাতিভেদ ও দলাদলিতে বিভক্ত রাজপুতদের দিয়ে কোন কাজ হবে না মনে করে তিনি সমাজের নিম্ন শ্রেণীর লোকেদের উপর অধিকতর নির্ভরশীল হয়েছিলেন, এবং তাদের নিয়েই বাহিনী গঠন করেছিলেন।

গোবিন্দ মুঘলদের সঙ্গে অসংখ্য যুদ্ধ করেছিলেন, এবং বহুবার সাফল্য লাভ করে-ছিলেন। দুর্গম আনন্দপুর অঞ্চলে তাঁর ঘাঁটি ছিল। পরপর পাঁচবার মুঘলরা এখানে আক্রমণ চালায়। সবচেয়ে জোরদার আক্রমণ হয়েছিল ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দে। শেষ পর্যন্ত উভয় পক্ষের একটি বোঝাপড়া হয় যে গোবিন্দ তাঁর লোকজনসহ আনন্দপুর পরিত্যাগ করে যাবেন এবং তাতে মুঘলবাহিনী কোন বাধা দেবে না। মুঘল সেনা-পতি ভজির খান কোরান স্পর্শ করে এই শপথ করেছিলেন, এবং এই বিষয়ে ঔরঙ্গজেব পত্র মারফৎ ভজির খানকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তুমুল বর্ষার মধ্যে শিখবাহিনী যখন আনন্দপুর ত্যাগ করে চলে যাচ্ছিল, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে ভজির তখন তাদের উপর আক্রমণ চালান এবং এর ফলে গোবিন্দের অসংখ্য অনুরাগী নিহত হয়। তাঁর দুই পুত্র মুঘলদের হাতে ধৃত হয়ে নিহত হন, অপর দুই পুত্র মারা যান পলায়ন কালে। গোবিন্দ ছদ্মবেশে নানাস্থানে পরিভ্রমণ করতে করতে দিনা নামক স্থানে হাজির হন। এখানে তিনি ঔরঙ্গজেবের কাছ থেকে একটি পত্র পান যাতে ঔরঙ্গজেব তাঁকে দাক্ষিণাত্যে তাঁর রাজসভায় হাজির হতে বলেন। জবাবে গোবিন্দ একটি পত্রে

ভজির খানের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তাঁকে শাস্তি দেবার দাবি জানান। এরপর গোবিন্দ তালবন্দীতে উপস্থিত হন যেখানে ঔরঙ্গজেবের কাছ থেকে তাঁর চিঠির উত্তর পান। এই চিঠিতে বাদশাহ গোবিন্দের প্রতি বিশ্বাসভঙ্গের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন এবং তাঁকে নিজ দরবারে সাক্ষাতের জন্য আমন্ত্রণ জানান। গোবিন্দের দাক্ষিণাত্যে যাবার ইচ্ছা ছিল, বিশেষ করে মারাঠাদের যুদ্ধকৌশল সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে জানবার আগ্রহ ছিল, ফলে তিনি দাক্ষিণাত্য অভিমুখে অগ্রসর হন, কিন্তু পথে রাজস্থানে খবর পান যে ঔরঙ্গজেব মারা গেছেন (৩রা মার্চ ১৭০৭)।

এরপর গোবিন্দ শিখদের সংগঠন নূতন ভাবে গড়ে তোলেন, এবং গুরুর পদ অবলুপ্ত করে দেন। আকস্মিকভাবে ১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আততায়ীর ছুরিকাঘাতে নিহত হন।

৬॥ ঔরঙ্গজেব ও দাক্ষিণাত্য : দ্বিতীয় পর্যায়

শিবাজীর মৃত্যুর পর কিছু মারাঠা সর্দারের প্রচেষ্টায় তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র রাজারাম মাত্র দশ বছর বয়সে রাজপদে অভিষিক্ত হন, কিন্তু অপর এক গোষ্টির সহায়তায় শিবাজীর অপর পুত্র শম্ভুজী শেষ পর্যন্ত ক্ষমতা দখল করেন (১৮ই জুন ১৬৮০)।

শম্ভুজী মুঘলদের বিরুদ্ধে তাঁর পিতার নীতিই অনুসরণ করেছিলেন। ১৬৮০-৮১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি উত্তর খান্দেশ ও বুরহানপুরে ব্যাপক লুণ্ঠন চালান। ১৬৮১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আহমদনগর দুর্গ জয়ের চেষ্টা করেছিলেন যদিও এই চেষ্টা সফল হয়নি। ঔরঙ্গজেবের বিদ্রোহী পুত্র আকবরকে তিনি আশ্রয় দিয়েছিলেন। দক্ষিণের এই পরিস্থিতি সামাল দেবার জন্য স্বয়ং ঔরঙ্গজেব এই সময় দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত হন। তিনি সৈয়দ হুসেন আলিকে উত্তর কোঙ্কনে নিযুক্ত করেন। শিহাবুদ্দীন খান ও দলপৎ রাই নাসিকের ভারপ্রাপ্ত হন, রুহুল্লা খান এবং রাজকুমার শাহ আলমের উপর আহমদনগরের ভার দেওয়া হয়, এবং রাজকুমার আজমকে নিযুক্ত করা হয় বিজাপুরের ব্যাপারে। এঁরা কেউই তাঁদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে না পারায় ঔরঙ্গজেব রীতিমত বিরক্ত হন।

১৬৮৩ খ্রীষ্টাব্দে শম্ভুজী মুঘলদের সঙ্গে সন্ধি করলে ঔরঙ্গজেব হাতে কিছু সময় পান। বিদ্রোহী রাজকুমার আকবর এতে ক্ষুব্ধ হয়ে গোয়ায় পোর্তুগীজদের সাহায্যে পারস্যে পালিয়ে যাবার মতলব করেন, কিন্তু শম্ভুজীর মন্ত্রী কবি কলস এবং রাঠোর দুর্গাদাস যিনি মারাঠাদের সঙ্গে ছিলেন তাঁকে গোয়া থেকে বুঝিয়ে সুজিয়ে ফেরত

নিয়ে আসেন। এদিকে শম্ভুজী বিলাস ব্যসন ও আমোদ প্রমোদে কাল কাটাতে শুরু করেন। আকবর মারাঠা সাহায্য সম্পর্কে হতাশ হন। ঔরঙ্গজেব এই সুযোগটিকে নিজের পক্ষে কাজে লাগান। তিনি জঞ্জীরের সিদিকে আকবরের গতিবিধির উপর নজর রাখার নির্দেশ দেন এবং রাজকুমার শাহ আলমকে সাবন্তওয়ারি ও দক্ষিণ কোঙ্কনের মধ্যে দিয়ে মারাঠা রাজ্য আক্রমণ করতে পাঠান। শিহাবুদ্দীনকে পুনা থেকে কোলবা আক্রমণের নির্দেশ দেওয়া হয়। রাজকুমার আজমকে বাগলান ও খান্দেশের রাস্তা আটকানোর জন্য নাসিকে পাঠানো হয়। খান জাহানকে অকলকোটে পাঠানো হয় যাতে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা থেকে কোন সাহায্য মারাঠারা না পায় তা দেখার জন্য।

শাহ আলম বেলগাঁও দখল করে সাবন্তওয়াড়ির সমভূমিতে উপস্থিত হন। বিচোলিম নামক স্থানে তিনি হটকারিতা করে পোর্তুগীজদের শত্রু করে তোলেন যারা জলপথে খাদ্য ও রসদ আসার পথ বন্ধ করে দেয়। দুর্ভিক্ষ ও মড়কে তাঁর ক্ষতিও প্রচুর হয় এবং শেষ পর্যন্ত অতিকষ্টে তিনি রামঘাট হয়ে আহমদনগর পৌঁছান (১৮ই মে ১৬৮৪)। কিন্তু অন্যান্য ফ্রণ্টে মুঘলবাহিনী যথেষ্ট সাফল্যলাভ করেছিল। মারাঠারা পরপর পরাজিত হয়েছিল। শম্ভুজীর দুই স্ত্রী ও এক কন্যা মুঘলদের হাতে ধরা পড়েছিলেন। তাঁদের বাহাদুরগড় দুর্গে আটক রাখা হয়েছিল। বিদ্রোহী রাজকুমার আকবর ১৬৮৬র জুন মাসে এককভাবে মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ব্যর্থ হয়ে ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দে একটি জাহাজ ভাড়া করে পারস্যে চলে যান। তাঁকে জাহাজে তুলে দিয়ে রাঠোর দুর্গাদাস মারবারে প্রত্যাবর্তন করেন।

বিজাপুরে তখন আদিলশাহী বংশের শেষ সুলতান সিকন্দর আদিল শাহ (১৬৭২-১৬৮৬) রাজত্ব করছিলেন। তাঁর রাজসভায় দক্ষিণী ও আফগানী আমীরদের গোষ্টিকলহ তখন তুঙ্গে উঠেছিল। দক্ষিণী গোষ্ঠীর আমন্ত্রণে মুঘল বাহিনী বিজাপুর আক্রমণ করে নলদুর্গ ও গুলবর্গা দখল করে (১৬৭৭)। মুঘলদের সহায়তায় সিদি মাসুদ ১৬৭৭ খ্রীষ্টাব্দে বিজাপুরের প্রধান মন্ত্রী হন। মাসুদ কিন্তু গোপনে শিবাজীর সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছিলেন, এবং শিবাজীর মৃত্যুর পরেও এই সম্পর্ক বজায় থাকে। ঔরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যে এসে রাজকুমার আজমকে বিজাপুর আক্রমণের নির্দেশ দেন (১৬৮২)। কিন্তু মুঘলবাহিনী এই ব্যাপারে মোটেই সফল হয়নি। ১৬৮৩ খ্রীষ্টাব্দে বিজাপুরের প্রধানমন্ত্রী মাসুদ পদত্যাগ করেন। পরবর্তী প্রধান মন্ত্রী আকা খুসরব মারা যান ১৬৮৪ খ্রীষ্টাব্দে। অতঃপর সিকন্দর আদিল শাহ সরজা খানকে প্রধানমন্ত্রী

নিযুক্ত করেন এবং মুঘলদের বিরুদ্ধে বিজাপুরের ব্যাপক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার নির্দেশ দেন।

ঔরঙ্গজেব বিজাপুর দখল করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি সুলতান সিকন্দর আদিল শাহকে কড়া চিঠি লেখেন যে তাঁকে মুঘলবাহিনীর রসদ সরবরাহ করার দায়িত্ব নিতে হবে, শম্ভুজীর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করতে হবে, এবং বিজাপুরের মধ্য দিয়ে মুঘলবাহিনীকে যাবার অধিকার দিতে হবে। এই প্রস্তাবগুলিতে সুলতান অসম্মত হলে ঔরঙ্গজেব রাজকুমার আজমকে বিজাপুর দুর্গ অবরোধ করার নির্দেশ দেন। গোলকুণ্ডার সুলতান এবং শম্ভুজী বিজাপুরকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন। ১৬৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল বিজাপুর দুর্গ আরুদ্ধ হয়। প্রবল বিক্রমের সঙ্গে বিজাপুর মুঘল আক্রমণ প্রতিহত করে। মুঘলবাহিনীর বার বার ব্যর্থতায় ক্ষিপ্ত হয়ে ঔরঙ্গজেব স্বয়ং বিজাপুর অবরোধের দায়িত্ব নেন এবং দীর্ঘ পনের মাস অবরুদ্ধ থাকার পর ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জুলাই বিজাপুরের সুলতান সিকন্দর আদিল শাহ আত্মসমর্পণ করেন। এতদিনকার আদিলশাহী বংশের শাসন অবলুপ্ত হয়। বিজাপুর মুঘল সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত হয়। সুলতান সিকন্দর বন্দী অবস্থায় ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা এপ্রিল পরলোক গমন করেন।

বিজাপুরের পর ঔরঙ্গজেব গোলকুণ্ডার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। প্রত্যক্ষ-ভাবে কোনদিন গোলকুণ্ডা মুঘলদের বিপক্ষে যায়নি এবং নিয়মিত ভাবে করপ্রদানও করে এসেছে। কিন্তু মারাঠাদের সঙ্গে ও বিজাপুরের সঙ্গে গোলকুণ্ডার গোপন সম্পর্কের অভিযোগে ঔরঙ্গজেব রাজকুমার শাহ আলমকে গোলকুণ্ডার বিরুদ্ধে ১৬৮৫ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে প্রেরণ করেন। গোলকুণ্ডার প্রধান সেনাপতি মীর মুহম্মদ ইব্রাহিম উৎকোচের দ্বারা বশীভূত হয়ে মুঘলপক্ষে যোগদান করেন। প্রায় বিনা বাধায় মুঘলবাহিনী হায়দ্রাবাদ পৌছায় এবং গোলকুণ্ডার সুলতান আবুল হাসান রাজকুমার শাহ আলমের দেওয়া শর্তাবলী মেনে নিয়ে সন্ধি করেন। কিন্তু ঔরঙ্গজেব গোলকুণ্ডা দখল করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন এবং রাজকুমার শাহ আলমকে গোলকুণ্ডার প্রতি নমনীয় মনোভাব প্রদর্শন করার অপরাধে বরখাস্ত করে অপর রাজকুমার আজমের উপর গোলকুণ্ডা দখলের দায়িত্ব দেন এবং ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারি তারিখে স্বয়ং গোলকুণ্ডায় হাজির হন। রাজকুমার শাহ আলম ব্যাপারটিকে মেনে নিতে পারেননি এবং গোপনে গোলকুণ্ডাকে সাহায্য করে পিতার মতলব ব্যর্থ করবেন এটাই ছিল তাঁর অভিলাষ, কিন্তু তা ফাঁস হয়ে যেতে

তিনি সপরিবারে বন্দী হন এবং তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। হায়দ্রাবাদ দখল করে মুঘলবাহিনী গোলকুণ্ডা দুর্গ অবরোধ করে (৭ই ফেব্রুয়ারি ১৬৮৭)। প্রবল যুদ্ধের ফলেও যখন মুঘলবাহিনী গোলকুণ্ডা দুর্গ দখল করতে ব্যর্থ হল, তখন ঔরঙ্গজেব উৎকোচের সাহায্যে গোলকুণ্ডার সেনাপতিদের ক্রয় করতে শুরু করলেন। এইবার ফল ফলল। ১৬৮৭র ২১শে সেপ্টেম্বর বেলা তিনটার সময় কুতবশাহী বংশের শেষ সুলতান আবুল হাসান আত্মসমর্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে গোলকুণ্ডা মুঘলদের অধিকারে এল। এরপর ঔরঙ্গজেব বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার প্রভাবাধীন দুর্গসমূহ দখল করলেন যেগুলি ছিল সাগর, আদোনি, কর্নুল, রায়চুর, সেরা, বাঙ্গালোর, বংকাপুর, বেলগাঁও, বন্দীবাস ও কঞ্জীভেরাম।

যখন ঔরঙ্গজেব বিজাপুর ও গোলকুণ্ডায় ভীষণভাবে ব্যস্ত নির্বোধ শম্ভুজী তখন মদ্য ও নারীসঙ্গে বিভোর ছিলেন সঙ্গমেশ্বর নামক স্থানে। ১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারি তারিখে মুকর্‌রব খান নামক একজন মুঘল কর্মচারী তাঁকে ও তাঁর মন্ত্রী কবি কলসকে গ্রেপ্তার করেন। ১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মার্চ তাঁদের নিহত করা হয়।

শম্ভুজী বন্দী হবার পর তাঁর ভাই রাজারাম রায়গড় দুর্গে ১৬৮৯র ৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে মারাঠা সিংহাসনে অভিষিক্ত হলেন। মুঘলবাহিনী এই দুর্গ অবরোধ করলে রাজারাম জিঞ্জিতে পলায়ন করেন। ১৯শে অক্টোবর তারিখে রায়গড় দুর্গ মুঘল অধিকারে আসে। শিবাজীর কয়েকজন বিধবা পত্নীসহ শম্ভুজীর পুত্র সাত বছর বয়স্ক সাহু বন্দী হন।

১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দটি ঔরঙ্গজেবের জীবনের সাফল্যের একটি স্মরণীয় বছর।

৭ ॥ ঔরঙ্গজেবের অনুপস্থিতিকালীন উত্তর ভারত

ঔরঙ্গজেব যখন দাক্ষিণাত্যে গমন করেছিলেন, মেবারের সঙ্গে তাঁর রফা হলেও, মারবার তখনও মুঘলদের বিরুদ্ধে খণ্ডযুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল। মারবারের বৈধ রাজা অজিত সিংহ তখনও নাবালক। ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দে রাঠোর দুর্গাদাস রাজকুমার আকবরকে পারস্যগামী জাহাজে তুলে দিয়ে মারবারে প্রত্যাবর্তন করেন। এরপর মুঘলদের বিরুদ্ধে মারবারের সংগ্রাম আরও জোরদার হয়। বুন্দির দুর্জন শাল হারার সাহায্যে রাঠোররা আজমীরের মুঘল শাসককে পরাস্ত করে, এমনকি মেওয়ার ও দিল্লীর সীমানার মধ্যে হামলা চালায়।

এদিকে রাজকুমার আকবরের পুত্র ও কন্যা দুর্গাদাসের নিকটে ছিল এবংঔরঙ্গজেব তাদের ফিরে পেতে উৎসুক ছিলেন। মারবারের মুঘলসুবাদার সুজাত খান এবং ঐতিহাসিক ঈশ্বরদাস নাগরের (ফুতুহাৎ-ই-আলমগীরী নামক গ্রন্থের লেখক) মধ্যস্থতায় দুর্গাদাস তাঁদের বাদশাহের নিকট সমর্পণ করেন (১৬৯৬ ও ১৬৯৮)। ঔরঙ্গজেব দেখে খুশি হন যে দুর্গাদাস তাঁর পৌত্র ও পৌত্রীকে ইসলামীয় পণ্ডিতদের অধীনে সুশিক্ষিত করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি দুর্গাদাসকে তিন হাজারী মনসবদারের পদ দেন এবং গুজরাতের অন্তর্গত পাটন নামক স্থানের সামরিক শাসক 'নিযুক্ত করেন। অজিত সিংহকেও তিনি কালোর, সাঞ্চোর ও সিওয়ানার জায়গীর উপহার দেন এবং তাঁকে মনসবদার পদে নিয়োগ করেন, কিন্তু তাঁকে মারবারের রাজা বলে মেনে নেননি।

কিন্তু এই বোঝাপড়া দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাতে মারাঠাদের হাতে মুঘলবাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলে সেই সুযোগে দুর্গাদাস ও অজিতসিংহ বিদ্রোহ করেন এবং অজিত নাগৌর নামক স্থানে মুঘল সেনাপতি মুখম সিংকে পরাস্ত করেন। ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া মাত্রই অজিত সিংহ তাঁর বাহিনী নিয়ে যোধপুরে প্রবেশ করেন এবং মারবার পুনরুদ্ধার করেন।

গোকলার ব্যর্থ বিদ্রোহের পর (১৬৬৯) জাঠরা সিনসানির রাজারাম এবং সোঘোরের রাম ছেরার নেতৃত্বে পুনরায় বিদ্রোহী হয় এবং আগ্রার উপকণ্ঠে ব্যাপক-ভাবে হামলা করতে থাকে। রাজারামের আক্রমণে ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দে মুঘল সেনাপতি উইঘুর খান নিহত হন। বিদ্রোহী জাঠরা আকবরের সমাধিক্ষেত্র সেকেন্দ্রা লুণ্ঠন করে। ১৬৯০-৯১ খ্রীষ্টাব্দে এই জাঠ বিদ্রোহ দমিত হয়। ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজারামের ভ্রাতুষ্পুত্র চূড়ামন বিদ্রোহী হন এবং শেষ পর্যন্ত ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর জাঠরা স্বাধীন ভরতপুর রাজ্য স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছিল।

বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত ওর্ছার চম্পৎ রাইর পুত্র ছত্রশাল শিবাজীর অনুপ্রেরণায় একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করেন। ধামোনি এবং সিরোঞ্জ অঞ্চলে তিনি মুঘলদের বিরুদ্ধে অনেকগুলি খণ্ডযুদ্ধ করেন। ঔরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যে ব্যস্ত থাকার সুযোগে তিনি কালিঞ্জর ও ধামোনি দখল করেন এবং মালব অঞ্চলেও মাঝে মাঝে হামলা শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত ঔরঙ্গজেব তাঁকে চার হাজারী মনসবদারের পদ দিয়ে তাঁর সঙ্গে সন্ধি করেন। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তিনি বুন্দেলখণ্ডে একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। পশ্চিমে বুন্দেলখণ্ডে ১৬৮৫ খ্রীষ্টাব্দে পহার সিং অনুরূপ

বিদ্রোহ করেছিলেন। মুঘলবাহিনীর হাতে পরাজিত ও নিহত হলেও তাঁর পুত্রদ্বয় ভগবন্ত ও দেবী সিং মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যান। শেষ পর্যন্ত ১৬৯২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁদের মুঘল দরবারে চাকুরি দিয়ে শান্ত করা হয়।

বিহারের গঙ্গারাম নাগরের বিদ্রোহ ১৬৮৪ খ্রীষ্টাব্দে দমন করা হয়। পুরাতন গণ্ডোয়ানা অঞ্চলে দেওগড়ের রাজা বিদ্রোহী হয়েছিলেন। ১৭০১ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠাদের সহযোগিতায় মুঘলদের সঙ্গে যুদ্ধ করে পরাস্ত হলেও তিনি বশ্যতা স্বীকার করেননি। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তিনি একটি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ আগস্ট তারিখে জোব চার্ণক কর্তৃক কলকাতায় ইংরাজদের কুঠিস্থাপন।

৮॥ দাক্ষিণাত্যে : শেষ পর্যন্ত মারাঠাদের সঙ্গে চূড়ান্ত যুদ্ধ

১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দে শম্ভুজী নিহত হবার পর তাঁর ভাই রাজারাম জিঞ্জিতে পালিয়ে যান। কয়েকজন মারাঠা সেনাপতি নিজ নিজ এলাকা থেকে মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাবার দায়িত্ব নেন, সর্বাধিনায়ক রামচন্দ্র বাভদেকর। অপরাপর সেনাপতিরা ছিলেন প্রহ্লাদ নিরাজী, শংকরজী মলহার, পরশুরাম ত্রিম্বক, ধনজী যাদব ও শন্তাজী ঘোরপরে।

১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে রাজারাম মুঘল সেনাপতি জুলফিকর খান কর্তৃক জিঞ্জিতে অবরুদ্ধ হন। কিন্তু মারাঠারা পিছন থেকে গেরিলা কায়দায় আক্রমণ করে মুঘলদের রসদ যোগানের রাস্তা বন্ধ করে দেয়। ফলে বাধ্য হয়ে জুলফিকরকে অবরোধ প্রত্যাহার করতে হয়। ১৬৯৬-এ জুলফিকর পুনরায় জিঞ্জি অবরোধ করলে ধনজী যাদব এবং শন্তাজী ঘোরপরে তা ব্যর্থ করে দেন। জুলফিকর তৃতীয়বার জিঞ্জি অবরোধ করেন ১৬৯৭-এর নভেম্বরে এবং ১৬৯৮-এর জানুয়ারিতে ওই দুর্গ অধিকৃত হয়। রাজারাম প্রথমে ভেলোর ও পরে বিশালগড়ে পালিয়ে যান।

পশ্চিমদিকে মারাঠারা সাফল্যলাভ করে। ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে ২৫শে মে তারিখে তারা সাতারা দখল করে। মুঘল সেনাপতি সরজা খান প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ সহ বন্দী হন। মারাঠা সেনাপতিদ্বয় রামচন্দ্র ও শংকরজী ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে প্রতাপগড়, রোহিরা, রাজগড় ও তোরনা দুর্গ পুনরুদ্ধার করেন। সেনাপতি পরশুরাম ১৬৯২ খ্রীষ্টাব্দে পানহালা দুর্গ জয় করেন। শন্তাজী এবং তাঁর সাগরেদ অমৃত রাও বেরার ও খানদেশে অভিযান চালিয়ে চৌথ আদায় করেন। ১৬৯৫-এর ডিসেম্বরে তিনি

মুঘল সেনাপতি কাশিম খানকে পরাজিত করে প্রচুর সম্পদ লুণ্ঠন করেন। কাশিম খান আত্মহত্যা করেন। ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারিতে শম্ভাজী অপর একজন মুঘল সেনাপতি হিম্মত খানকে পরাজিত ও নিহত করেন।

কিন্তু ইতিমধ্যে শম্ভাজী ও ধনজীর মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হওয়ায় মুঘলরা কিছুটা সুযোগ পায়। শম্ভাজী সেনাপতি হিসাবে অমিত প্রতিভাবান হলেও ব্যক্তিগত ব্যবহারের দ্বারা সকলের অপ্রিয় হয়েছিলেন, এবং তিনি মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে স্বয়ং রাজারাম ধনজীকে তাঁর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। ১৬৯৬-র মে মাসে কঞ্জীবরমের নিকটবর্তী একটি স্থানে ধনজী পরাজিত হন। পরবৎসর (১৬৯৭, মার্চ) সাতারায় ধনজীর নিকট শম্ভাজী পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন। ওই বছরেই শম্ভাজী আততায়ীর হস্তে নিহত হন।

১৬৯৭ খ্রীষ্টাব্দে যে বছর মুঘলরা জিঞ্জি অধিকার করে, ভীমা নদীর একটি ভয়ঙ্কর বন্যায় মুঘলদের পেদর্গাও এবং ইসলামপুরীর শিবিরগুলি বিধ্বস্ত হয়। ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দে কোন উল্লেখযোগ্য মুঘল-মারাঠা যুদ্ধ হয় নি। ১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দে খান্দেশ ও বেরারের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হবার কালে রাজারাম পরেন্দার নিকটবর্তী একটি স্থানে মুঘল সেনাপতি বিদর বখতের নিকট পরাজিত হয়ে আহমদনগর অভিমুখে চলে যান।

১৭০০ খ্রীষ্টাব্দের ২রা মার্চ রাজারামের মৃত্যু হলে তাঁর দুই স্ত্রীর গর্ভজাত দুই সন্তানের তরফ থেকে সিংহাসন দাবি করা হয়, এবং শেষ পর্যন্ত তারাবাই এর পুত্র তৃতীয় শিবাজী রাজা হিসাবে ঘোষিত হন। তিনি নাবালক থাকায় তারাবাই শাসন-কার্যের মূল দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনারও দায়িত্ব তিনি নেন।

এদিকে ঔরঙ্গজেব যুদ্ধের শেষ কবে এবং কোথায় হবে তা বুঝতে পারছিলেন না। সম্মুখ যুদ্ধে মারাঠারা পরাজিত হলে পিছন থেকে গেরিলা কায়দায় যুদ্ধ করে তারা অসম্ভব ক্ষতিসাধন করে। তাছাড়া মাঝে মাঝে বিভিন্ন সর্দারের অধীনে মারাঠাদের বিভিন্ন দল খোদ মুঘল এলাকায় প্রবেশ করে লুটপাট করে। ফলে ঔরঙ্গজেব স্থির করেন যে তিনি স্বয়ং এই বিষয়ে একটা হেস্তনেস্ত করবেন। অতিবৃদ্ধ বয়সে তিনি স্বয়ং প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব নিয়ে বিস্তৃত প্রস্তুতির পর মারাঠাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হলেন। ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দের ২১ শে এপ্রিল তারিখে তিনি সাতারা অধিকার করলেন। তারপর পার্লি (জুন ১৭০০), পানহালা (মে ১৭০১), বিশালগড় (জুন ১৭০২), সিংহগড় (এপ্রিল ১৭০৩), এবং রাজগড়, তোরনা ও ওয়াগিঙ্গেরা (১৭০৪-০৫) তাঁর অধিকারে

আসে। সকল দুর্গই তিনি যুদ্ধের দ্বারা জয় করেননি, উৎকোচের দ্বারা বশীভূত হয়ে অনেক দুর্গাধ্যক্ষই স্বেচ্ছায় দুর্গ ছেড়ে দিয়েছিলেন। ১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে জানুয়ারি তিনি আহমদনগরে আসেন। কিন্তু মারাঠা বাহিনী এক্ষেত্রে ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেছিল, এবং তা ছিল মুঘল বাহিনীর পিছু পিছু অগ্রসর হওয়া। মুঘল অধিকৃত অঞ্চলগুলি পুনরধিকার করতে করতে তারাও এগিয়ে চলছিল। ১৭০৬-এর মাঝামাঝি থেকে তারা অকস্মাৎ আক্রমণমুখী হয়ে ওঠে এবং মুঘল এলাকাগুলিতে আক্রমণ শুরু করে। মুঘল শক্তি একদিকে কেন্দ্রীভূত হবার সুযোগে ওই বছর তারা গুজরাতে অভিযান চালিয়ে বরোদা লুণ্ঠন করে। ধনজী বেরার ও খান্দেশ আক্রমণ করেন। ঔরঙ্গাবাদ থেকে আহমদনগরের পথ মারাঠারা অবরুদ্ধ করে দেয়, খোদ সম্রাটের শিবিরও এর পর থেকে মাঝে মাঝে আক্রান্ত হতে থাকে।

অতিবৃদ্ধ সম্রাট দাক্ষিণাত্যের এই সমস্যা মেটবার আগেই, ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা মার্চ শুক্রবার প্রভাতে নব্বই বছর বয়সে আহমদনগরে দেহত্যাগ করেন। দৌলতাবাদের চার মাইল পশ্চিমে খুলদাবাদ নামক স্থানে সাধু শেখ জৈনুল হকের সমাধির পাশে শেষ মহান মুঘল বাদশাহ ঔরঙ্গজেব আলমগীর সমাধিস্থ হন।

চতুর্দশ অধ্যায়

মুঘল যুগের রাষ্ট্রব্যবস্থা

ডঃ বার্নিয়েরের বিবরণ

মুঘল যুগের রাষ্ট্রব্যবস্থার একটা সম্যক পরিচয় দেবার জন্য আমরা এখানে বিখ্যাত ফরাসী চিকিৎসক ও পর্যটক ডঃ বার্নিয়েরের বিবরণ থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি। ডঃ ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ের সাধারণ পর্যটক ছিলেন না, তিনি ছিলেন অসাধারণ পর্যবেক্ষণ শক্তির ও অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী। ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে তিনি ভারতবর্ষে এসেছিলেন, এবং তিনি এদেশ ত্যাগ করে যান ১৬৬৭ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তের সবচেয়ে মূল্যবান অংশ ফ্রান্সের অর্থমন্ত্রী মঁশিয়ে কলবেরকে লেখা একটি চিঠি, যাতে তিনি ফ্রান্সের একজন গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারীর নিকট ভারতবর্ষের সামাজিক, ও অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার একটি নিখুঁত ছবি তুলে ধরেছেন।

বার্ণিয়েরের বিবরণ থেকে একটা বিষয় খুবই স্পষ্ট হয় যে, যে অর্থে ইউরোপে রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল, সেই অর্থে ভারতকে ঠিক রাষ্ট্র আখ্যা দেওয়া যায় না। এখানে রাষ্ট্রশক্তির যথার্থ বিকাশ না হবার প্রধান কারণ, রাজত্বের উত্তরাধিকার বিষয়ে জ্যেষ্ঠ পুত্রের অধিকার বাস্তবে স্বীকৃত না হওয়া। কোন সম্রাটের মৃত্যু হবার সঙ্গে সঙ্গেই ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব, গৃহযুদ্ধ ও রক্তপাত অনিবার্য ছিল। যদি কোন রাজকুমার সিংহাসনের সকল দাবিদার ও সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের দৈহিকভাবে উৎখাত করে ক্ষমতায় আসীন হতে পারলেন তো ভালই, নতুবা সাম্রাজ্যের বিচ্ছিন্নতা অবশ্যম্ভাবী। বার্নিয়ের ফ্রান্সের সঙ্গে ভারতের তুলনা করেছেন, চতুর্দশ লুই-এর সঙ্গে ঔরঙ্গজেবের। তাঁর মতে ফরাসী সম্রাট মোটের উপর একটি জাতির প্রতিনিধিত্ব করেন, হিন্দুস্তানের বাদশাহ তা করেন না।

ইউরোপে পাকাপাকিভাবে ফিউডাল সিস্টেম বা সামন্ততন্ত্র রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব রক্ষায় এবং প্রাথমিক ধরনের জাতীয়তাবাদ গঠনে যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, ভারতে সামন্ততন্ত্র তা করতে পারে নি, অর্থাৎ তার নেতিবাচক ভূমিকাটাই প্রধান ছিল। সত্য বলতে কি আক্ষরিক অর্থে এখানে সামন্ততন্ত্র কোনদিনই ঠিকমত গড়ে ওঠেনি, যদিও এখানকার অর্থনীতি ছিল মূলত কৃষি ও ভূমিনির্ভর। ফলে এখানে সামন্ততান্ত্রিক যুগের উপযুক্ত শোষণ, অত্যাচার ও নিপীড়ন ছিল, কিন্তু সামন্ততন্ত্রের ইতি-

বাচক দিকগুলি ছিল সম্পূর্ণভাবেই অনুপস্থিত। এই ইতিবাচক দিকগুলির একটি হচ্ছে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার। ব্যক্তিগত সম্পত্তির সুরক্ষা, সঞ্চয় ও ভোগাধিকার নিশ্চিত থাকলে মানুষ কাজ করতে উৎসাহী হয়, সম্পদের সৃষ্টি করে, দেশে উৎপাদনমনস্কতা গড়ে ওঠে। ভারতবর্ষে সবগুলিরই অভাব ছিল, এবং তার জন্যই ভারতীয় চরিত্র ছিল একান্তই কর্মবিমুখও নৈরাশ্যবাদী, বার্নিয়েরের দৃষ্টি যা এড়ায়নি।

বার্নিয়ের লিখেছেন: হিন্দুস্তানের মুঘল সম্রাট দেশের সমস্ত সম্পদের একমাত্র মালিক, অন্য কারো মালিকানা প্রথাসিদ্ধ নয়। আমীর ওমরাহ ও অপরাপর তথাকথিত পদাধিকারীরা কেউই সম্পত্তির মালিক নয়, বাদশাহের দেওয়া ধনদৌলতের উপরেই তাঁরা নির্ভরশীল, মৃত্যুর পরে তাঁদের যথাসর্বস্ব আবার বাদশাহের কাছে ফিরে আসে। ভারতবর্ষের প্রতি বিঘা জমির মালিক বাদশাহ, চাষী বা জমিদার নয়। বার্নিয়ের লিখেছেন ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার স্বীকার না করার অর্থ সব রকমের সামাজিক অগ্রগতির পথ রোধ করা। ইউরোপের সঙ্গে তুলনা করে তিনি বলেছেন যে তাঁদের দেশের সম্রাটেরা সমস্ত ভূসম্পত্তির মালিক নন। তা যদি হত তাহলে ইউরোপীয় সম্রাটরা প্রজাদের আনুগত্য থেকে বঞ্চিত হতেন। তাহলে দেশে ধনী ব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পেতনা, ব্যবসায়ী ও কারিগরদের উন্নতি হত না, পারী, লিয়ঁ, তুলু বা রুঁয়ের মত সুন্দর শহরও গড়ে উঠত না, শিল্পবাণিজ্য থেকে রাষ্ট্র যে রাজস্ব উপার্জন করে তাও সম্ভব হত না। এদেশের আমীর-ওমরাহরা ইউরোপের মত লর্ড বা ডিউক হিসাবে গড়ে ওঠার সুযোগ পাননি এবং কোন সম্পত্তির মালিকানা বংশপরম্পরায় ভোগ করার অধিকার পাননি। তাঁদের আভিজাত্য এক পুরুষের মধ্যেই খতম হয়ে যায়, তাঁদের বংশধরেরা ভিক্ষুকের পর্যায়ে নেমে আসে। এখানকার আমীর ওমরাহরা ভাগ্যান্বেষী, অনভিজাত, অশিক্ষিত ও আত্মমর্যাদাজ্ঞানহীন। বিবেক বলে কোন পদার্থও তাঁদের নেই।*

বাদশাহ ঔরঙ্গজেব ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার না থাকার কুফলগুলি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন, কিন্তু প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাকে বদলে দেওয়া ছিল তাঁর সামর্থের বাইরে। অফুরন্ত সম্পদ ও ক্ষমতার মালিক হওয়া সত্ত্বেও হিন্দুস্তানের বাদশাহরা

---

* প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস বার্নিয়েরের বৃত্তান্ত খুবই যত্ন করে পড়েছিলেন। "প্রাচ্য-স্বৈরাচার" ও "এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থা" সংক্রান্ত তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ মতবাদের মূলে বার্নিয়ের প্রদত্ত তথ্যাবলীর যথেষ্ট ভূমিকা ছিল। সামন্ত যুগেও প্রাচ্য দেশগুলিতে ভূসম্পত্তির মালিকানাস্বত্বের কোন জটিল বিকাশ সম্ভব হল না কেন এ বিষয়ে তাঁরা মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন।

ছিলেন মানসিকভাবে অপরিণত। বার্নিয়ের এ বিষয়ে ঔরঙ্গজেবের মত উদ্ধৃত করেছেন। ঔরঙ্গজেব প্রায়ই বলতেন এশিয়ার বিভিন্ন রাজ্যের দুর্গতি ও অবনতির প্রধান কারণ হল রাজকুমারদের অশিক্ষা ও কুশিক্ষা। বাল্যকাল থেকেই তারা জেনানা মহলে ও খোজাদের সংসর্গে মানুষ হয় এবং নানা কু-অভ্যাসের দাস হয়ে পড়ে। বিদ্যাবুদ্ধি ও বিবেচনাশক্তি না থাকার দরুন, সিংহাসনে আসীন হবার পর তারা সকল হিতাহিত বোধই হারিয়ে ফেলে। নিছক রাজকীয় দম্ভই তাদের অস্তিত্বের একমাত্র মূলধন হয়। এই কারণেই, বার্নিয়েরের মতে, এশিয়ার সম্রাটদের পশুর চেয়েও নির্মম ও নিষ্ঠুর আচরণ করতে দেখা যায়। ভোগবিলাস ও ইন্দ্রিয়-পরায়ণতার ক্ষেত্রে কোথায় সীমা টানতে হয় তা তারা জানে না। নিজেরা বুদ্ধিহীন ও অপদার্থ বলে শাসনকার্যের ভার তারা উজীর ও খোজাদের উপর ছেড়ে দেয়। ফলে কোন রাজকার্যই সাধিত হয় না। বিশাল হিন্দুস্তানকে প্রত্যক্ষভাবে শাসন করা অসম্ভব, তাই মুঘল বাদশাহদের স্থানীয় শক্তিগুলির উপর নির্ভর করতে হয়। বার্নিয়ের লিখেছেন মুঘল সাম্রাজ্যের মধ্যে একাধিক জাতির বসবাস, যাদের নিজস্ব রাজা বা প্রধান আছে। বাদশাহের নিকট এদের বশ্যতা স্বীকার একান্তই আনুষ্ঠানিক, কেউ কর দেয় নামমাত্র, কেউ দেয়-ই না, কেউ উল্টে আদায় করে। বেলুচি ও আফঘানরা নিজেদের সম্পূর্ণ স্বাধীন মনে করে। পাঠানরা মুঘলদের দুচক্ষে দেখতে পারে না, নিজেদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বা কোন রাজার অধীনে তারা বাস করে। বিজাপুরের সুলতান মুঘল সম্রাটকে কোন কর দেন না, এবং সুযোগ পেলেই মুঘলদের বিরুদ্ধাচরণ করেন। গোলকুণ্ডার রাজাও তাই। মুঘলদের একমাত্র মিত্র রাজপুত রাণারা, বিশেষ করে রাজা জয়সিংহ ও রাজা যশোবন্ত সিংহ।

মুঘল বাদশাহরা হিন্দু রাজাদের উপর অধিকতর নির্ভরশীল, তার কারণ রাজপুতরা সৈন্য হিসাবে চমৎকার, এবং এই রাজারা ইচ্ছা করলে একদিনে বিশ হাজারের বেশি সৈন্য মোতায়েন করতে পারেন। এঁরা দলে থাকলে পাঠানদের জব্দ করা সুবিধা হয়। বিদ্রোহী ওমরাহদের শাস্তি দেওয়াও সহজ হয়। গোলকুণ্ডা বা বিজাপুরের সুলতানরা গণ্ডোগোল করলে মুঘল সম্রাটরা সিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত ওমরাহদের পাঠাতে সাহস করেন না। দেশীয় রাজাদেরই পাঠানো হয়। অনুরূপভাবে পারস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বিগ্রহের সময় হিন্দুরাই ভরসা কেননা পারসিক আমীর ওমরাহরা পারস্যের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণে রাজি হন না। মুঘল সম্রাটরা সুন্নী সম্প্রদায়ভুক্ত হলেও তাদের পার্ষদ ও আমীর ওমরাহদের অধিকাংশই সিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত। প্রসঙ্গত বার্নিয়ের

একথাও উল্লেখ করেছেন যে হিন্দুস্তানের অধিবাসীদের শতকরা একজনও মুঘল নয়। উজবেক, পারসী, তাতার, আরবী, তুর্কী সকলেরই বংশধররা মুঘল বলে পরিচয় দেয়, যদিও তাদের কেউই মুঘল বলে খাতির করে না, না সরকার, না সাধারণ মানুষ।

ওমরাহরা দু'হাজারী, পাঁচ হাজারী প্রভৃতি পদমর্যাদা সম্পন্ন। এই পদমর্যাদা সৈন্যসংখ্যার অনুপাতে হয় না, হয় ঘোড়ার সংখ্যার অনুপাতে। যিনি দুশো ঘোড়ার মালিক তিনি দুহাজারী। এই ঘোড়া ও তার উপযুক্ত সৈন্যের খরচ তাঁরা রাজ সরকার থেকে পেয়ে থাকেন। এখানে চুরির সুযোগ প্রচণ্ড। যাঁর যতগুলি ঘোড়া রাখার কথা, কেউই তা রাখেন না, অথচ কাগজে কলমে নির্দিষ্ট সংখ্যক ঘোড়া রাখছেন দেখিয়ে পুরো টাকা আদায় করে নেন। বারো হাজারীরা সবচেয়ে পদস্থ ব্যক্তি। ওমরাহদের কয়েকটি কর্তব্য থাকে। ওমরাহ ছাড়া মনসবদারেরাও ঘোড়া রাখতে পারেন, কিন্তু তাঁরা বেতন পান খাস সরকারী কর্মচারী হিসাবে। রৌজিন-দাররা নিম্নপদস্থ কর্মচারী, যারা দৈনিক বেতন পায়। পদমর্যাদায় খাটো হলেও নানাভাবে এদের উপার্জন অনেক বেশি।

অশ্বারোহী বাহিনী ওমরাহদের অধীনে থাকে এবং ঘোড়া পিছু এই বাহিনীর ভরণপোষণের ব্যয় আদায় করা হয়, যদিও তার অধিকাংশই চুরি হয়, এবং অশ্বারোহী সৈন্যরা নামমাত্রই পেয়ে থাকে। আরও শোচনীয় অবস্থা পদাতিকদের, যদিও সংখ্যায় তারাই সবচেয়ে বেশি। গোলন্দাজদের বেতন অবশ্য অনেকটা বেশি, এবং এই বাহিনীতে প্রচুর সংখ্যক ইউরোপীয় কাজ করে। মুঘলবাহিনী যুদ্ধযাত্রা করলে একটা গোটা নগর তাদের সঙ্গে চলতে আরম্ভ করে, অথচ বিরাট বাহিনীর উপযুক্ত কোন রসদ নেওয়া হয় না। যেখানে বাহিনী থাকে তার আশে-পাশের খোলা মাঠগুলিতে জীবজন্তুদের ছেড়ে দেওয়া হয় চরে খাবার জন্য। কোন শহরে তারা হাজির হলে স্থানীয় বণিকরা সৈন্যদের খাদ্যদ্রব্য ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিক্রয় করতে বাধ্য হয়। সৈন্যরা ডালচাল মিশ্রিত খিচুড়ি খেয়ে জীবনধারণ করে। অনেকে অবসর মত আশেপাশের গ্রামে গিয়ে মাটি কুপিয়ে দু'পয়সা উপার্জন করে নেয়। গোটা ব্যবস্থাটাই পরিকল্পনাহীন। মুঘল বাহিনী অভিযানে বেরুলে রাজধানী খালি হয়ে যায়। এই কারণেই বার্নিয়ের দিল্লী বা আগ্রাকে যুদ্ধশিবির বলেছেন।

যেটা বার্নিয়েরের দৃষ্টি এড়ায়নি তা হচ্ছে ভারতবর্ষের দারিদ্র। তাঁর মতে অফুরন্ত সম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও মুঘল বাদশাহকে প্রকৃত অর্থে ধনী বলা

যায় না। তাঁর ব্যয়ও ততোধিক বিপুল, একটা বিচিত্র ধরনের কাণ্ডজ্ঞানহীন প্রশাসনকে চালু রাখতেই বিপুল অর্থের অপচয় ঘটে। আমীর, ওমরাহ ও পদাধিকারীরা নানা ফন্দীতে বাদশাহের কাছ থেকে যা আদায় করেন তার অনেকটাই নানা উপলক্ষে বাদশাহকে ভেট দিতে ব্যয় হয়ে যায়, আর বাকিটা ব্যয় হয় ভোগবিলাসে, ডজন ডজন উপপত্নীর খরচে এবং স্বর্ণালঙ্কার নির্মাণে। পৃথিবীতে আর কোথাও হিন্দুস্তানের মত এত সোনা জমা হয় না, কিন্তু সমাজের উপরতলায়, এমনকি সাধারণ মানুষের মধ্যেও, অলঙ্কার হিসাবে তা মজুত করার একটা সাংঘাতিক প্রবণতা বর্তমান। বার্নিয়েরের মতে উপার্জিত অর্থ লেনদেন করে যদি তা দিয়ে সোনা কিনে মজুত করা হয়, তাহলে কোন জাতির দারিদ্র্য দূর হতে পারে না। তিনি আরও বলেছেন যে, যদি সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত অধিকার স্বীকৃত হত তা হলে এ অবস্থা ঘটত না। এই অধিকার নেই বলেই ব্যবসাবাণিজ্যে বণিক শ্রেণী উৎসাহিত হয় না, কেননা টাকা করলে সে টাকা মারা যাবে। ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্বারা ধনোপার্জন করলে, পাছে তা বাদশাহের হাতে চলে যায়, সেই আশংকায় তারা গোপনে উপার্জিত অর্থকে সোনারূপায় পরিবর্তিত করে মাটির তলায় মজুত করে রাখে, আর বাস করে ভিক্ষুকের মত, যাতে কারো সন্দেহের উদ্রেক না হয়। এই অস্বাস্থ্যকর অর্থনীতি দেশকে স্বাভাবিকভাবেই দারিদ্রসীমার চরমে নিয়ে গেছে।

জমির ক্ষেত্রে ব্যবস্থাটা আরও মারাত্মক। ইউরোপে যে সব লর্ডরা জায়গীরদারী পেয়ে থাকেন, রাজার প্রতি এবং অধীনস্থ প্রজাদের প্রতি তাঁদের কতকগুলি বাধ্য-বাধকতা থাকে যেগুলির কোন নড়চড় হয় না। কিন্তু এখানকার জায়গীরদাররা কার্যত রাজস্ব আদায়কারী। এগুলি থেকে উপার্জনের ভাগ বাদশাহ পান, এবং সুবাদার, জায়গীরদার, জমিদার ও চৌধুরিরা নির্মম অত্যাচার ও শোষণের দ্বারা কৃষকের সর্বস্ব অপহরণ করে। অনেক সময় তারা গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যায়, এবং চাষের ব্যাপারে তাদের কোন উৎসাহ থাকে না। তাদের বক্তব্য : হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের ফলে তারা যা অর্জন করবে তা যদি স্বেচ্ছাচারী প্রভুর হাতে তুলে দিতে হয়, তাহলে সে পরিশ্রমে লাভ কি? তার চেয়ে যেমন ভাবেই হোক জীবনের কটা দিন কাটিয়ে দিতে পারলেই হল। জায়গীরদার জমিদারদের বক্তব্য : কৃষকের কথা ভেবে তাদের লাভ কি? কৃষকদের পিটিয়ে তারা যা আয় করছে, তারও তো অধিকার নিশ্চিত নয়। উত্তরাধিকারসূত্রে যখন কিছু ভোগই করতে পারা যাবে না বাদশাহ যে কোন মুহূর্তে সব কেড়ে নেবেন, বা গলাধাক্কা দিয়ে সরিয়ে অন্য লোকদের

জায়গীরদার বানাবেন, তখন প্রজা অনাহারেই মরুক আর ভিটেমাটি ছেড়ে চলে যাক, তাতে কার কি করার আছে? ফাঁকতালে যেটুকু পকেটে আসছে তা দিয়ে দু চারটে উপপত্নী পোষা ভাল। বার্নিয়েরের মতে, এই কারণেই শুধু হিন্দুস্তানের নয় এশিয়ার প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের প্রাত্যহিক অবনতি ঘটছে। হিন্দুস্তানের অধিকাংশ নগরের ঘরবাড়ির অবস্থা খুবই শোচনীয়। পরিত্যক্ত নগর ও গ্রাম অসংখ্য।

এরপর বার্ণিয়ের হিন্দুস্তানের শিল্প, শিক্ষা ও বাণিজ্যের কথা বলেছেন। তিনি সঠিকভাবেই বলেছেন যে ভারতীয়দের মধ্যে কোন শিল্পবোধ নেই কেননা যে দেশের মানুষ মাটির তলায় টাকা পুঁতে রাখাকেই পরমার্থ মনে করে সেখানে শিল্পকলা অসম্ভব। এখানে শিল্পীদের কোন মর্যাদা নেই, শিল্পসৃষ্টির স্বাধীনতা নেই, ধন সঞ্চয়ের অধিকার নেই, তাঁরা সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর মতই দাসত্ব করেন, নির্মম ব্যবহার ও বেত্রাঘাতই তাঁরা পেয়ে থাকেন। হিন্দুস্তানে শিক্ষাদীক্ষার কোন বালাই নেই। কোন কলেজ বা আকাদেমী এখানে অকল্পনীয়। শিক্ষার কোন মর্যাদাও এখানে নেই। এ অবস্থায় এখানে বাণিজ্যিক উন্নতিও নেই। বণিকদের কোন স্বাধীনতা ও সম্মান নেই। যেখানে অর্থোপার্জন নিরাপদ নয় সেখানে বাণিজ্যের উন্নতি সুদূর পরাহত।

বাদশাহ তাঁর চারদিকে নিরক্ষর ও বর্বর ক্রীতদাস পরিবেষ্টিত হয়ে থাকেন। বিচক্ষণ ব্যক্তির কোন মর্যাদা নেই, পরানুগ্রহজীবী মোসাহেবরাই তাঁর অবলম্বন। এদের দেশও নেই দেশপ্রেমও নেই। বিশাল সেনাবাহিনী ও দরবারী আড়ম্বর বজায় রাখতেই হিন্দুস্তান সর্বস্বান্ত। নিছক পশুশক্তির জোরে মানুষদের ক্রীতদাস বানিয়ে রাখা হয়েছে। প্রাদেশিক সুবাদারেরা বাদশাহের উপর আর এক কাঠি। টাকা দিয়ে প্রাদেশিক সুবাদারত্ব কেনা হয়। আমাদের দেশের মত হিন্দুস্তানে আইনসভা নেই, আদালত নেই, বিচারও নেই। ফ্রান্সের সঙ্গে তুলনা করে বার্নিয়ের বলছেন, আমাদের দেশের (ফ্রান্সের) সম্রাটেরও জমিদারী আছে, কিন্তু তিনি হিন্দুস্তানের বাদশাহের মত সকলের সব কিছুরই মালিক নন। তাঁকেও প্রচলিত আইন মেনে চলতে হয়। তিনি যে ভূ-সম্পত্তির মালিক, সেখানেও তিনি সম্রাট বলে আইন কানুন অমান্য করে মালিকানা খাটাতে পারেন না। তাঁর প্রজাদের প্রত্যেকেরই আইন আদালতের সাহায্য নেবার অধিকার আছে। কিন্তু হিন্দুস্তানে ও সাধারণ ভাবে এশিয়ায় কারোরই এ অধিকার নেই। শাসকের চাবুক ও মর্জি সেখানে এক-মাত্র ন্যায়দণ্ড। বার্নিয়ের একথাও জানিয়েছেন যে সামাজিক বিবেক বলে ভারত-বর্ষে কোন পদার্থ নেই।

পঞ্চদশ অধ্যায়

উপাদান পরিচিতি

মিনহাজ-উদ্দীন সিরাজ বিরচিত তবকাৎ-ই নাসিরী। সম্পাদনা: ডব্লিউ. এন লীস, খাদিম হুসেন এবং আবদুল হাই, কলিকাতা ১৮৬৩-৬৪; ইংরাজী অনুবাদ এইচ. জি. র‍্যাভার্টি, কলিকাতা ১৮৭৩-৯৭। এখানে গজনবীদের আক্রমণ, তুর্কী-বাখ্তিয়ারের বঙ্গদেশ বিজয়, পাঞ্জাবের ইয়ামিনি রাজবংশের পরিচয়, রাজস্থান ও গাঙ্গেয় উত্তর ভারতে তুর্কী অধিকার, দিল্লীর দাস-রাজবংশের ইতিহাস প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়েছে। লেখকের পুরো নাম আবু উমর মিনহাজ-উদ্দীন উসমান বিন সিরাজুদ্দীন-অল-জুজ্জানী।

মুহম্মদ কাশিম ফিরিশতা বিরচিত গুলশন-ই-ইব্রাহিমী, অপর নাম তরীখ-ই-ফিরিশতা। পাণ্ডুলিপির প্রথম লিথোগ্রাফ মুদ্রণ: বোম্বাই ১৮৩২; পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ: লক্ষ্ণৌ ১৯০৫; চারখণ্ডে ইংরাজী অনুবাদ: জে. ব্রিগস, লণ্ডন ১৮২৭-২৯; পুনর্মুদ্রণ কলিকাতা ১৯১১। এই গ্রন্থে গজনবীদের আক্রমণ, গাঙ্গেয় উত্তর ভারতে ও রাজস্থানে তুর্কী অধিকার, ইয়ামিনি ঘুর ও দাস বংশের ইতিহাস, দেবগিরি ও উড়িষ্যায় তুর্কী অনুপ্রবেশ প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়েছে।

ইসামী বিরচিত ফুতুহ-উস সালাতিন। রচনা কাল ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দ। সম্পাদনা: এ. এম. হুসেন, আগ্রা ১৯৩৮, এ. এস. উষা, মাদ্রাজ ১৯৪৮। হিন্দী অনুবাদ এস, এ, এ, রিজভি বিরচিত 'খলজী কালীন ভারত' পৃঃ ১৯৫-২১২ ও 'তুঘলককালীন ভারত' পৃঃ ৮৩-১৪১। এই গ্রন্থে গজনীর ইয়ামিনি, বংশের উত্থান থেকে শুরু করে মুহম্মদ বিন তুঘলকের আমল পর্যন্ত ঘটনা বিবৃত হয়েছে। লেখক স্বয়ং মুহম্মদ বিন তুঘলকের স্বেচ্ছাচারিতার শিকার হয়েছিলেন।

খ্বাজা মাসুদ বিন সঈদ বিন সালমান বিরচিত দিওয়ান-ই-সালমান। সম্পাদনা আবুল কাশিম আখওয়ানি, তেহরান ১৮৭৯। অংশবিশেষের ইংরাজী অনুবাদ: এলিয়ট ও ডওসন কৃত *History of India as Told by Its Own Historians*, চতুর্থ খণ্ড। বিষয়বস্তু: ইয়ামিনি বংশ থেকে মুহম্মদ ঘুরীর বিজয় পর্যন্ত ঘটনাবলী, মূলত পাঞ্জাব ও দিল্লী অঞ্চলের।

অল্‌ উৎবি বিরচিত তরীখ-ই-ইয়ামিনি। ইংরাজী অনুবাদ: জে রেনল্ডস, লণ্ডন ১৮৫৮; অংশবিশেষের অনুবাদ এলিয়ট ও ডওসন, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ: ১৪-৫২; শ্রীরাম শর্মা, *Medieval Indian History*, ১৯৫৬, পৃ: ৩৪-৬৬। বিষয়বস্তু: গজনীর ইয়ামিনি বংশের ইতিহাস।

হম্‌দ-উল্লাহ মুস্তৌফী কাজ্বিনী বিরচিত তরীখ-ই-গুজিদা। গিব মেমোরিয়াল সিরিজে প্রকাশিত অবিকল সংস্করণ; প্রথম খণ্ড পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি, লণ্ডন ১৯১১ দ্বিতীয় খণ্ড সংক্ষিপ্ত অনুবাদ ও নির্ঘণ্ট, ব্রাউন ও নিকলসন কৃত ১৯১৩-১৪। মূল পাণ্ডুলিপি বৃটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত, নং অতিরিক্ত ২২৬৯২। বিষয়বস্তু ইয়ামিনি বংশ থেকে দাসবংশ পর্যন্ত ঘটনাবলী।

খ্‌বান্দ মীর বিরচিত হবীব-উস-সিয়ার, বিষয়বস্তু গজনবীদের অভিযান ও ইয়ামিনিদের ইতিহাস, বোম্বাই ১৮৫৭; আংশিক অনুবাদ: এলিয়ট ও ডওসন, চতুর্থ খণ্ড পৃ: ১৫৪-২১২। একই লেখকের রৌজাৎ-উস-সাফা, বিষয়বস্তু উত্তরভারতে তুর্কী অধিকার, তেহরান ১২৭৪ হিজরী, সম্পাদনা: এফ এফ আরবাথনোট, পাঁচ খণ্ড, লণ্ডন ১৮৯১-৯৪; ইংরাজী অনুবাদ ই রেহাৎস।

মাহমুদ গার্দিজী বিরচিত কিতাব জৈন-উল আখবার। সম্পাদনা এম, নাজিম, বার্লিন ১৯২৮। এই গ্রন্থটিতে গজনীর ইয়ামিনিদের সংবাদ আছে। এই বিষয়ের অপর গ্রন্থ আবুল ফজল বইহাকি বিরচিত তরীখ-ই বইহাকি; সম্পাদনা ডব্লিউ এইচ মোর্লে। আংশিক অনুবাদ এলিয়ট ও ডওসন, দ্বিতীয় খণ্ড।

হাসান-উন নিজামী রচিত তাজ উল- ম' আসির। আংশিক অনুবাদ এলিয়ট ও ডওসন, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ: ২০৪-৪৩। এই গ্রন্থে উত্তর ভারতে তুর্কী অধিকারের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। এছাড়া এই বিষয়ে আরও দুটি প্রামাণ্য উপাদান আবদুল কাদির বুদাউনী বিরচিত মুন্তখব-উৎ-তওবারিখ এবং নিজামুদ্দীন (বকশী) আহমদের তবকাৎ-ই-আকবরী। প্রথমটির তিনখণ্ডে সম্পাদনা করেছেন ডব্লিউ, এন, লীস, কবিরুদ্দীন আহমদ এবং আহমদ আলি, কলিকাতা ১৮৬৪-৬৯ এবং অনুবাদ করেছেন যথাক্রমে জি. এস. এ র‍্যাঙ্কিং, ডব্লিউ. এইচ লোউই এবং টি ডব্লিউ হেগ, কলিকাতা ১৮৮৪-১৯২৫। দ্বিতীয় গ্রন্থটির সম্পাদনা করেছেন বি, দে এবং হিদায়ৎ হোসেন, কলিকাতা ১৯১৩-২৭, ১৯৩১,১৯৪১ এবং অনুবাদ করেছেন বি. দে. তিন খণ্ড, কলিকাতা ১৯১৩-৪০।

আমীর খুসরব রচিত ছয়টি গ্রন্থ। (১) কিরান উস স' দইন, রচনাকাল ১২৮৯

খ্রীষ্টাব্দ। এখানে বুঘরা খানের সঙ্গে তাঁর পুত্র কাইকোবাদের সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। (২) মিফতাহ উল-ফুতুহ্, রচনা কাল ১২৯১, বিষয়বস্তু জালালুদ্দীন খলজীর সামরিক অভিযানসমূহ। সম্পাদনা ওয়াই কে নিয়াজী ১৯৩৬-৩৭, আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৪, ইংরাজী অনুবাদ এলিয়ট ও ডওসন, তৃতীয়খণ্ড, পৃঃ ৫৩৪-৪০ ; রিজভী, খলজীকালীন ভারত (হিন্দী) পৃঃ ১৫১-৫৪। (৩) আশীক অথবা দিবাল রানী-ওয়া-খিজির খান, সম্পাদনা : আর. আহমদ আলিগড় ১৯১৭। আংশিক ইংরাজী অনুবাদ এলিয়ট ও ডওসন, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৫৪৪-৫৬। এটি দেবলাদেবী ও খিজির খানের প্রেমোপাখ্যান অবলম্বনে রচিত কাব্য হলেও তৎকালীন ভারতবর্ষের একটি সুন্দর চিত্র এখানে বর্তমান। এখানে মঙ্গোলদের হাতে তাঁর বন্দিত্ব ও অব্যাহতির কাহিনীও আছে। (৪) নুহ্ সিপিহ্র, রচনাকাল ১৩১৮, বিষয়বস্তু সুলতান মুবারক শাহের আমলের সামরিক অভিযান সমূহ। সম্পাদনা : এম ডব্লিউ মীর্জা, আলিগড় ১৯৫০ ; আংশিক ইংরাজী অনুবাদ এলিয়ট ও ডওসন, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৫৫৭-৬৫। (৫) তুঘলক-নাম, বিষয়বস্তু গিয়াসুদ্দীন তুঘলকের রাজ্যলাভের ঐতিহাসিক পরিস্থিতি। সম্পাদনা : এস, এইচ ফরিদাবাদী হায়দরাবাদ ১৯৩৩। ইংরাজী অনুবাদ : এস হুসামী, *Islamic Culture*, সপ্তম খণ্ড পৃঃ ৩০১-১২, ৪১৩-২৪ (৬) তারীখ-ই-অলাই, অন্য নাম খজাইন-উল-ফুতুহ, বিষয়বস্তু আলাউদ্দীন খলজীর রাজ্যকালের প্রথম ষোল বছরের ইতিহাস, বিশেষ করে মালিক কাফুরের দাক্ষিণাত্য অভিযানের কাহিনী। সম্পাদনা : এস. এম. হক, আলিগড় ১৯২৭। আংশিক ইংরাজী অনুবাদ : এলিয়ট ও ডওসন তৃতীয় খণ্ড পৃ ৬৭-৯২। পূর্ণাঙ্গ ইংরাজী অনুবাদ এম. হবিব ; *Journal of Indian History*, অষ্টম খণ্ড, গ্রন্থাকারে *Campaigns of Alauddin Khalji*, বোম্বাই ১৯৩১। সংশোধনী এচ. এম. শিরানী *Orientel College Magaxine, Lahore* ১৯৩৫-৫৬। হিন্দী অনুবাদ : রিজভী, খলজীকালীন ভারত, পৃঃ ১৫৫-৭০।

জিয়াউদ্দীন বরনী বিরচিত তারীখ-ই-ফিরুজশাহী, রচনাকাল ১৩৫৮। মিনহাজ-উদ্দীন সিরাজ তাঁর তবকাৎ-ই-নাসিরী যেখানে শেষ করেছেন বরনী সেখান থেকে শুরু করেছেন। তাঁর গ্রন্থে গিয়াসুদ্দীন বলবন থেকে মুহম্মদ বিন তুঘলকের আমল তৎসহ ফিরুজ তুঘলকের প্রথম ছয় বৎসরের রাজ্যকালের ঘটনাবলী স্থান পেয়েছে। বরনী সচেতন ইতিহাস লেখক, যদিও বহুস্থলে পক্ষপাতদুষ্ট। সম্পাদনা : এস. এ. খান, কলিকাতা ১৮৬০-৬২। আংশিক ইংরাজী অনুবাদ *Journal of the Asiatic*

Society of Bengal, ১৮৬৯, পৃঃ ১৮১-২২০, ১৮৭০, পৃঃ ১-৫১ ; এলিয়ট ও ডওসন, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৯৩-২৬৮, হিন্দী অনুবাদ : রিজভি, খলজীকালীন ভারত পৃঃ ১-১৪৮, তুঘলককালীন ভারত, পৃঃ ১-৮২ ।

শাম্‌স-ই শিরাজ অফীফ বিরচিত তারীখ-ই-ফিরুজশাহী, যেখানে ফিরুজ তুঘলকের রাজত্বের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ বর্তমান। সম্পাদনা : বিলায়েত হুসেন ১৮৯১। আংশিক ইংরাজী অনুবাদ : এলিয়ট ও ডওসন, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৬৯-২৭৩। ফিরুজ তুঘলক সংক্রান্ত আরও দুটি গ্রন্থ আছে। প্রথমটি হচ্ছে স্বয়ং ফিরুজ রচিত ফুতূহাত-ই-ফিরুজ শাহী, এবং দ্বিতীয়টি তাঁর কোন অনুগ্রহভাজন ব্যক্তি বিরচিত সীরৎ-ই-ফিরুজ-শাহী। তুঘলকদের সম্পর্কিত আরও দুটি গ্রন্থ বদ্র-ই চাচ রচিত কসা'ইদ এবং আমীর খুর্দ রচিত সিয়ার-উল-আউলিয়া। হিন্দী আংশিক অনুবাদ : রিজভি, তুঘলক কালীন ভারত, পৃঃ ১৪২-১৫৩। তৈমুরের অভিযান সম্পর্কিত শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ তৈমুরের আত্মজীবনী তুজ্‌ক-ই-তীমুরী, যার পোশাকী নাম মালফ্‌জাৎ-ই-তীমুরী। ইংরাজী অনুবাদ, এলিয়ট ও ডওসন তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৮৯-৪৭৭। অপর একটি গ্রন্থ শরাফুদ্দীন আলি ইয়াজদি রচিত জাফর নাম, ইংরাজী অনুবাদ এলিয়ট ও ডওসন, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪৭৮-৫২২।

গুজরাত ও খান্দেশের জন্য উপাদান সমূহ যথাক্রমে সিকন্দর বিন মুহম্মদ বিরচিত মিরাৎ-ই-সিকন্দরী (ইংরাজী অনুবাদ ই. সি. বেইলী : *The Local Muhammedan Dynasties, Gujarat*, লণ্ডন ১৮৮৬)। আলি মুহম্মদ খান বিরচিত মিরাৎ-ই-আহমদী ও তার পরিশিষ্ট (সম্পাদক এস. এন. আলি, বরোদা ১৯২৮-৩০ ; অনুবাদঃ জে. বার্ড, *Political and Statistcial History of Gujarat*, লণ্ডন ১৮৩৫), আবদুল্লাহ মুহম্মদ বিন উমর অলমক্কী বিরচিত জাফর-উল-ওয়ালি বি মুজফ্‌ফর ওয় আলিহ (আরবী, তিন খণ্ড, লণ্ডন ১৯২১-২৮), দিওয়ান রণছোড়জী অমরজী রচিত তারীখ-ই-সোরথ (ইংরাজী অনুবাদ : ই রেহ্‌টসেক ও জে বার্জেস, বোম্বাই ১৮৮২) এবং মীর আবু তুরব বলী রচিত তারীখ-ই-গুজরাত (সম্পাদনা : ই. ডেনিসন রস, কলিকাতা ১৯০৯)। মালবের জন্য ফিরিশতা ও নিজামুদ্দীনের পূর্বোক্ত গ্রন্থদ্বয় ছাড়াও আলি বিন মুহম্মদ অল্ কিরমানী বিরচিত মালবের সুলতান মাহমুদ খলজীর জীবনী ম'আসির-ই-মাহমুদ শাহী (অপ্রকাশিত) এবং অজ্ঞাতনামা লেখক বিরচিত তারীখ-ই-নাসির শাহী (অপ্রকাশিত) গুরুত্বপূর্ণ আকরগ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত। জৌনপুরের জন্য উপরি-উক্ত গ্রন্থগুলি ছাড়াও দ্রষ্টব্য ইয়াহিয়া বিন আহমদ সিরহিন্দী

রচিত তারীখ-ই মুবারক শাহী, সম্পাদনা : হিদায়ৎ হুসেন কলিকাতা ১৯৩১; অনুবাদ কে. কে. বসু, বরোদা ১৯৩২।

বাংলার জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজন গুলাম হুসেন সলীম বিরচিত রিয়াজ-উস-সালাতিন (সম্পাদনা : এ. এইচ. আবিদ, কলিকাতা ১৮৯০-৯৮; অনুবাদ : এ. সালাম, কলিকাতা ১৯০২-০৪) এবং সিন্ধুর জন্য আবুল ফজল, বাবুর, বরণী, ফিরিশতা ইবন বতুতা ও নিজামুদ্দীনের রচনাবলী ছাড়াও মীর মুহম্মদ মাসুম বিরচিত তারীখ-ই-সিন্দ (আংশিক অনুবাদ ; এলিয়ট ও ডওসন, প্রথম খণ্ড, পৃ: ২১৫-২৫২), মীর তাহির মুহম্মদ নস্যানী বিরচিত তারিখ-ই-তাহিরী (আংশিক অনুবাদ : এলিয়ট ও ডওসন, প্রথম খণ্ড, পৃ: ২৫৩-২৮৮), অজ্ঞাতনামা লেখক বিরচিত বেগলার-নাম (আংশিক অনুবাদ : এলিয়ট ও ডওসন, প্রথম খণ্ড, পৃ: ২৮৯-২৯৯) সৈয়দ জামাল রচিত তর্খান-নাম বা অর্ঘুন-নাম (আংশিক অনুবাদ : এলিয়ট ও ডওসন প্রথম খণ্ড পৃ: ৩০০-৩২৬) এবং আলি শের কানি বিরচিত তুহফাৎ-উল-কিরাম (আংশিক অনুবাদ : এলিয়ট ও ডওসন, প্রথম খণ্ড, পৃ: ৩২৭-৩৫১)।

বহমনী রাজ্য : ফিরিশতা, নিজামুদ্দীন, রফিউদ্দীন শিরাজী বিরচিত তজ্‌কিরৎ-উল মুলুক (অনুবাদ : জে. এস. কিং *The History of the Bahmani Dynasty*, লণ্ডন ১৯০০) ও আলি বিন আজিজুল্লাহ্‌ তবাতবা বিরচিত বুরহান-ই-ম' আসির (অনুবাদ : জে. এস. কিং, পূর্বোক্ত গ্রন্থ)। বিজয়নগর রাজ্য : ফিরিশতা, নিজামুদ্দীন ও তবাতবা, রাজপুত রাজ্যসমূহ : ফিরিশতা, নিজামুদ্দীন ও বাবুর। কাশ্মীর : বদাউনী, ফিরিশতা, নিজামুদ্দীন, জোনরাজ, শ্রীধর, শুক, প্রাজ্যভট্ট (দ্বিতীয়া, তৃতীয়া ও চতুর্থী রাজতরঙ্গিণী, ইংরাজী অনুবাদ জে. সি. দত্ত, *Kings of Kashmir*, কলিকাতা ১৮৭৯-৮৮) এবং মীর্জা হায়দার দুঘলৎ (তারীখ-ই-রশিদী অনুবাদ : ই. ডি. রস এবং এন. এলিয়াস, লণ্ডন ১৮৯৫)।

সৈয়দ ও লোদী আমল : জহিরুদ্দীন মুহম্মদ বাবুরের আত্মজীবনী বাবুর-নাম। গ্রন্থটি ওয়াকিয়ৎ-ই-বাবুরী বা তুজুক-ই-বাবুরী নামেও পরিচিত। মূল চাঘতাই তুর্কী ভাষায় লিখিত পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি, লণ্ডন ১৯০৫। জে. লেডেন ও ডব্লিউ আর-স্কাইন কৃত অনুবাদ *Memoirs of Babur*, অক্সফোর্ড ১৯২১। এ. এস বেভারিজ-কৃত ইংরাজী অনুবাদ *Babur-Nama* লণ্ডন ১৯২২। এলিয়ট ও ডওসন, চতুর্থখণ্ড (আংশিক অনুবাদ)। আবুল ফজল অল্লামী বিরচিত আইন-ই-আকবরী ; সম্পাদনা ও অনুবাদ ব্লকম্যান (প্রথম খণ্ড) কলিকাতা ১৮৭৭ ; সংশোধিত সংস্করণ : ডি. সি.

ফিললোট, কলিকাতা ১৯৩৯। ইংরাজী অনুবাদ : জেরেট (দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড) পূর্ণাঙ্গ সংশোধিত সংস্করণ জে. এন. সরকার, কলিকাতা ১৯৪৮-৪৯। শিহাবুদ্দীন আহমদ কর্তৃক আরবী ভাষায় রচিত অজাইব-উল মকদুর ফী আখবারী তিমুর বা তৈমুরের জীবনী। ইংরাজী অনুবাদ : জে. এইচ স্যাণ্ডার্স *Tamerlane or Timur the Great Amir* লণ্ডন ১৯৩৬।

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পাণ্ডুলিপি : মক্কার কাজী ইফিফুদ্দীন সৈয়দ হাসন-উল-হুসাইনীর পুত্র বিরচিত অজ্ঞাতনামা গ্রন্থ (বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি নং সাধারণ ১৭৬১) যেখানে ১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইতিহাস ধারাবাহিকভাবে আরবী ভাষায় রচিত। আহমদ বিন বহবল রচিত ম'দন-ই-আখবারী-আহমদী (বৃটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি, নং সাধারণ ১৮৮৩, ইণ্ডিয়া অফিসে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি নং ১২১) যার প্রথম খণ্ডে লোদী আমলের শেষ পর্যন্ত দিল্লী সুলতানীর ইতিহাস ও দ্বিতীয় খণ্ডে জাহাঙ্গীরের আমল পর্যন্ত তৈমুর বংশীয়দের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। এই গ্রন্থটি অবলম্বনে নিমাতুল্লাহ্‌র তারীখ-ই-খান জহানী ওয়া মখজান-ই-আফঘানী রচিত। মুহম্মদ শরীফ উউকি বিরচিত মজামি-উল-আখবার (ইণ্ডিয়া অফিসে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি, নং ১১৯) যেখানে ১৫৯১-৯২ পর্যন্ত রাজনৈতিক ঘটনাবলীর ইতিহাস লিপি-বদ্ধ হয়েছে। কামালুদ্দীন আবদুর রজ্জাক সমরকন্দী বিরচিত মৎলা-উস-স'দাইন ওয়া মজম'উল বহরইন (বৃটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি নং সাধারণ ১২৯১, অতিরিক্ত ১৭৯২৮, ইণ্ডিয়া অফিসে রক্ষিত অনুলিপি নং ১৯২, কেম্ব্রিজ পাণ্ডুলিপি নং ডি. ডি. ৩-৫) যেখানে ১৩০৪ থেকে ১৪৭০ পর্যন্ত তৈমুরীয়দের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে। লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত হামিদ বিন ফজল-উল্লাহ রচিত মিহ্‌র্‌ ওয়া মাহ্‌ যেখানে সিকন্দর লোদী সংক্রান্ত বহু তথ্য বর্তমান। ওই একই স্থানে রক্ষিত গিয়াসুদ্দীন আলি বিরচিত রুজনাম-ই-খজাওয়াৎ-ই-হিন্দুস্তান, যা তৈমুরের ভারত অভিযানের দিনলিপি ও নিজামুদ্দীন শামীর জাফর-নাম এর উৎস। মুল্লা আহমদ তট্টাওয়াই রচিত তারীখ-ই-আল্‌ফী (বৃটিশ মিউজিয়ম, সাধারণ নং ৪৬৫), বিষয়বস্তু ১৫৮৯ পর্যন্ত রাজনৈতিক ইতিহাস। আবদুল্লাহ বিরচিত তারীখ-ই দাউদী (লাহোর বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্কুল অফ ওরিয়েণ্টাল এণ্ড আফ্রিকান ষ্টাডিজের ৪৬৪৫১ নং), লোদী ও শূর বংশীয় সুলতানদের বিবরণী। শেখ আবদুল হক দেহল্‌ভি রচিত তারীখ-ই-হকী অথবা জিক্‌র উল মুল্ক (বৃটিশ মিউজিয়ম অতিরিক্ত ২৬২১০) যেখানে লোদী আমলের বিশেষ তথ্য সহ ১৫৯৬ পর্যন্ত ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। নিমাতুল্লাহ

বিরচিত তারিখ-ই-খান জহানী ওয়া মখজান-ই-আফঘানী (ইণ্ডিয়া অফিস নং ৫৭৬ এবং ২৭০৬) যা লোদী ও শূরদের বিবরণ। দ্বিতীয় অংশটি (মখজান-ই-আফঘানী) প্রথমটিরই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ, যার ইংরাজী অনুবাদ করেছিলেন বি ডোর্ণ *History of the Afghans,* লণ্ডন ১৮২৯-৩৬। মুহম্মদ বিহমদ খানী বিরচিত তারীখ-ই-মুহম্মদী (বৃটিশ মিউজিয়ম, নং সাধারণ ১৩৭) ও ফয়জুল্লা ইবন জৈল-উল আবেদিন বা মালিক উল কুজাৎ সদর-ই জাহান বিরচিত তারীখ সদ্র-ই-জাহান, অন্যনাম তবকাৎ-ই-মাহমুদ-শাহী (বৃটিশ মিউজিয়ম অতিরিক্ত নং ৭৬২৯ প্যারিস নং পারসী অতিরিক্ত ১৮৩, কেম্ব্রিজ নং জি ১২)। উভয়েরই বিষয়বস্তু সৈয়দ আমল পর্যন্ত ইতিহাস।

যে সকল বৈদেশিক ভ্রমণকারী দিল্লী সুলতানী আমলে ভারতবর্ষে এসেছিলেন, অথবা অন্যভাবে ভারতের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখ-যোগ্য ইবন বতুতা যিনি ভারতবর্ষ সহ নানা দেশ পরিভ্রমণ করেছিলেন, এবং ভারত-বর্ষেই ছিলেন প্রায় চৌদ্দ বছর। তাঁর রেহ্‌লা ভ্রমণবৃত্তান্ত নানা দিক থেকে ইতিহাসের অমূল্য উপকরণ। তাঁর রেহালা বা ভ্রমণবৃত্তান্তের মূল নাম তুহফাৎ-উল মুজ্‌জার ফী ঘর ইব-ইল-অমসার ওয়া অজ-ইব-ই-ল অস্তার। মূল গ্রন্থ ও ফরাসী অনুবাদ: সি. দেফ্রেমেরী এবং বি আর সাঙ্গুইনেত্তি,প্যারিস ১৮৫৩-৮৮; বর্ণানুক্রমিক নির্ঘণ্ট ১৮৫৯। ইংরাজী অনুবাদ: এইচ. ইউল ও এইচ কর্ডিয়ের *Cathay and Way Thither* লণ্ডন ১৯১৬; এস. লী *The Travels of Ibn Batuta* (অসম্পূর্ণ); এইচ. এ. আর. গিব *Ibn Batuta : Travels in Asia and Africa,* ব্রডওয়ে সিরিজ এবং *The Travels of Ibn Batuta,* প্রথম খণ্ড, হাকল্যুট সোসাইটি, দ্বিতীয় পর্যায় নং ১১০, কেম্ব্রিজ ১৯৫৮; এল হুসেন, রেহ্‌লা (ভারতবর্ষ, মালদ্বীপ ও সিংহল সংক্রান্ত নির্বাচিত অংশ), গাইকোবাড় ওরিয়েণ্টাল সিরিজ নং ১২২, বরোদা ১৯৫৩।

চতুর্দশ শতকের অল-কালকাসন্দী বিরচিত সুভ-উল অ'শা। এই লেখক কখনও ভারতবর্ষে আসেননি। পূর্বতন ভ্রমণকারীদের বক্তব্য অনুসরণ করে তাঁর গ্রন্থ রচিত। এই গ্রন্থের ভারত সংক্রান্ত অংশগুলি উপস্থাপিত হয়েছে ও. স্পাইস অনূদিত *An Arab Account of India in the Fourteenth Century* (স্টুটগার্ট ১৯৩৬) গ্রন্থে।

কালিকটের জামোরিনের (১৪৪২) রাজসভার পারসিক দূত আবদুর রজ্জাক বিজয়নগর পরিভ্রমণ করেছিলেন এবং সেখানকার সমাজ ও শাসনব্যবস্থার বিস্তৃত

বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছিলেন। ইতালীয় পরিব্রাজক নিকোলো কোন্তি ১৪২০ খ্রীষ্টাব্দে বিজয়নগর পরিভ্রমণ করেন এবং ল্যাটিন ভাষায় সেই বিবরণ পোপের জনৈক সেক্রেটারী কর্তৃক রচিত হয়। মূল ল্যাটিন বিবরণটি হারিয়ে গেলেও তার পোর্তুগীজ ও ইতালীয় অনুবাদ পাওয়া যায়। এছাড়া ফের্ণাও নুনিজ ও ডোমিঙ্গো পায়েস বিজয়নগর ভ্রমণ করে বিস্তৃত বিবরণ রচনা করেছিলেন। এই চারজনেরই বৃত্তান্ত আর. সিউয়েল তাঁর বিখ্যাত *The Forgotten Empire* গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন, নিকোলো কোন্তির সারাংশ পৃঃ ৮২-৮৭, নুনিজের *Chronicle of Fernao Nuniz* পৃঃ ২৯১-৩৯৫ এবং পায়েসের *Narrative of Domingo Paes,* পৃঃ ২৩৬-৯০।

রুশ পর্যটক আথানাসিউস নিকিতিন ১৪৭০ খ্রীষ্টাব্দে বহমনী রাজ্য পরিভ্রমণ করেছিলেন। তাঁর বৃত্তান্ত *The Travels of Athanasias Nikitin : A Native of Twer* এই নামে অনুবাদ করেছিলেন কাউণ্ট ভাইল হোর্স্কি যা পাওয়া যাবে আর. এইচ. মেজর সম্পাদিত *India in the Fifteenth Century* (পৃঃ ১-৩২), হাকল্যুট সোসাইটি, লণ্ডন ১৮৫৭, গ্রন্থে। ওই একই গ্রন্থে নিকোলো কোন্তির বৃত্তান্তের জে. ডব্লিউ জোন্স কৃত অনুবাদ *The Travels of Nicolo Conti* সন্নিবেশিত হয়েছে।

অপরাপর পর্যটকদের মধ্যে মন্তে কর্ভিনোর জন এবং মার্কো পোলো ত্রয়োদশ শতকের শেষ দশকে ভারতে এসেছিলেন চীন থেকে ফেরার পথে। চতুর্দশ শতকের প্রথমার্ধে এসেছিলেন পোর্দেলোনের ফ্রায়ার ওদোরিক ও ফ্রায়ার ইয়োরর্দানুস এবং ফ্লোরেন্সবাসী মারিগনোল্লির জন। ষোড়শ শতকের গোড়ার দিকে আরও দুজন বিখ্যাত পর্যটক ভারতবর্ষে এসেছিলেন যাঁরা হলেন ইতালীর বোলোগ্‌নার লুদোভিকো দি বার্থেমা (১৫০২-০৬) এবং পোর্তুগীজ দুয়ার্তে বার্বোসা (১৫০০-১৫০২)। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনের হাকল্যুট সোসাইটি কর্তৃক কয়েক খণ্ডে প্রকাশিত এইচ. ইউল এবং এইচ কর্ডিয়ের কৃত *Cathay and the Way Thither* (দ্বিতীয় মুদ্রণ, লণ্ডন ১৯১৫-১৬) গ্রন্থে পূর্বোক্ত ইবন বতুতার বৃত্তান্ত (চতুর্থ খণ্ড পৃঃ ১-১৬৬) ছাড়াও মন্তে কর্ভিনোর জন রচিত বিবরণীর সারাংশ (প্রথম খণ্ড), মারিগনোল্লির জনের বিবরণ (তৃতীয় খণ্ড পৃঃ ১৭৭-২৬৯) ও ফ্রায়ার ওদোরিকের বৃত্তান্ত (দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১-২৭৭) স্থান পেয়েছে। এছাড়া ইউল ও কর্ডিয়ের ফ্রায়ার ইয়োর্দানুসের *Mirabilia Descripta* (হাকল্যুট সোসাইটি, লণ্ডন ১৮৬৩) এবং মার্কোপোলোর ভ্রমণবৃত্তান্ত *Travels of Marco Polo* লণ্ডন ১৯০৩,১৯২০ (পরবর্তীকালে অনুবাদ করেছিলেন রিচি ১৯৩১) প্রকাশ করেছিলেন। দুয়ার্তে বার্বোসার গ্রন্থ অনুবাদ করেছিলেন

মানসেল লঙওয়ার্থ ডেমস (দুই খণ্ড, লণ্ডন ১৯১৮-১৯২১) *The Book of Duarte Barbosa* শিরোনামায়।

উপরি-উক্ত রচনাসমূহ ছাড়াও পোর্তুগীজ আলফোনসো দ'আলবুকার্ক কর্তৃক পোর্তুগালের সম্রাট মানোয়েলের নিকট প্রেরিত বিভিন্ন পত্র এবং সংবাদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য উপাদান। এই সকল চিঠিপত্র ও সংবাদে পোর্তুগীজদের সঙ্গে গুজরাতের রাজনৈতিক সম্পর্ক বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে। এইগুলির সঙ্কলন করেছিলেন আলবুকার্কের পুত্র ব্রাজ। এছাড়া সমকালীন কিছু চৈনিক বিবরণীতেও ভারত সংক্রান্ত অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। এইগুলি হচ্ছে ফেই-সিন বিরচিত সিঙ্গ-চা-সেঙ্গ-লান, হুয়াং-সিঙ্গ-ৎসেঙ্গ বিরচিত সি-ইয়াং চাও কুং তিয়েন লু, মা-হুয়ান বিরচিত য়িঙ্গ-য়িয়াই-সেঙ্গ-লান এবং ওয়াং-তা-য়ুয়ান বিরচিত তাও য়ি চে-লো। এইগুলি থেকে বিশেষ করে ভারতের উপকূল সংক্রান্ত বিবরণের অনুবাদ করেন ডব্লিউ ডব্লিউ রকহিল তোয়ুং পাও পত্রিকার ষোড়শ খণ্ডে (১৯১৫)। প্রথম তিনটি গ্রন্থ থেকে বঙ্গদেশ সংক্রান্ত অংশগুলির অনুবাদ করেন প্রবোধ চন্দ্র বাগচী, *Visvabharati Annals*, প্রথম খণ্ড পৃঃ ১১৭-২৭।

মুঘল যুগ সংক্রান্ত উপাদান সমূহ আরও ব্যপক। আমরা পূর্বেই বাবুরের আত্মজীবনী তুজুক-ই-বাবুরী বা বাবুর-নাম এবং বাবুরের জ্ঞাতি ভাই মীর্জা মুহম্মদ হায়দার দুঘলাতের তারীখ-ই-রশিদীর উল্লেখ করেছি। দ্বিতীয় গ্রন্থটি প্রথম গ্রন্থের পরিপূরক, কেননা ১৫৫১ খ্রীষ্টাব্দে সম্পূর্ণ হওয়া এই গ্রন্থে বাবুরের নিজস্ব যুদ্ধবিগ্রহ ছাড়াও, হুমায়ুনের সঙ্গে শের শাহের সংঘর্ষ, বিলগ্রামের যুদ্ধ, হুমায়ুনের পলায়ন, কাশ্মীরের জটিল ঘটনাবলী প্রভৃতি বিষয় স্থান পেয়েছে। ইংরাজী অনুবাদ, এন. এলিয়াস এবং ই. ডেনিসন রস, ১৮৯৫।

খবান্দ আমীর রচিত হবীব উস্ সিয়র এবং হুমায়ুন-নাম। লেখক ১৪৭৫ খ্রীষ্টাব্দে হীরাটে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দে গোয়ালিয়রে মারা যান। প্রথম গ্রন্থটিতে (লিথোগ্রাফ মুদ্রণ, তেহরান ১৮৫৫ এবং বোম্বাই ১৮৫৭) বাবুরের রাজ্যকাল ও হুমায়ুনের প্রথম তিন বছরের রাজ্যকাল বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় গ্রন্থটি প্রথমটির শেষ অংশের বিস্তৃতি। আংশিক অনুবাদ এলিয়ট ও ডওসন, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ১১৬-১২৬। সমকালীন আরও একটি বিখ্যাত গ্রন্থ মীর্জা বার্থওয়াদার তুর্কমান রচিত আহ্‌শন-উস-সিয়র যেখানে বাবুরের সঙ্গে পারস্যের শাহ ইসমাইলের সম্পর্ক বর্ণিত হয়েছে (রামপুরের রাজ-গ্রন্থাগারে রক্ষিত চার খণ্ডে রচিত পাণ্ডুলিপি)। তুর্কীভাষায় মুহম্মদ

সালিহ কতৃর্ক রচিত শাইবানী-নাম গ্রন্থের বিষয়বস্তু বাবুরের সঙ্গে উজবেগদের রাজনৈতিক সম্পর্ক। এই গ্রন্থটির সম্পাদনা ও জার্মান অনুবাদ করেন এইচ ভ্যাম্‌বেরী ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে। পরবর্তীকালে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে দুজন রুশ পণ্ডিত, পি. এম. মেলিওরানস্কি এবং এ. এন সামোইলোভিচ, গ্রন্থটির পুনরায় সম্পাদনা করেন। ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে পারস্যের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক নিয়ে ইস্কিন্দার মুনশী রচনা করেছিলেন তারীখ-ই-আলমারাই আব্বাসী।

বাবুরের কন্যা গুলবদন বেগম হুমায়ুন-নাম রচনা করেছিলেন ১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দে। এই গ্রন্থে প্রথম দুইজন মুঘল সম্রাটের আমলের অনেক ঘরোয়া কথা সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে, বিশেষ করে মুঘল অন্তঃপুরিকাদের কাহিনী। সম্পাদনা ও অনুবাদ এ. এস বেভেরিজ ১৯০২। হুমায়ুনের রাজ্যকাল নিয়ে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ জৌহর আফ্‌তাব্‌চী বিরচিত তজকিরাৎ-উল-ওয়াকিয়ৎ, রচনাকাল ১৫৮৭। লেখক হুমায়ুনের ব্যক্তিগত অনুচর ছিলেন, এবং গ্রন্থটি তাঁর অতি বৃদ্ধ বয়সে নিছক স্মৃতি থেকে লেখা বলে অনেক ক্ষেত্রেই অসঙ্গতিপূর্ণ। গ্রন্থটির ইংরাজী অনুবাদ: সি. স্টেওয়ার্ট, ১৮৩২। হুমায়ুনের পারস্যে আশ্রয় লাভ সংক্রান্ত বিবরণ পাওয়া যায় ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে শাহ্‌ তাহ্‌মাস্প বিরচিত তজকিরাৎ-ই-তাহ্‌মাস্প গ্রন্থে: ডি. সি. ফিল্লোট, কলিকাতা ১৯১২। হুমায়ুনের ভৃত্য বায়াজিদ কর্তৃক ১৫৯১-৯২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত তারীখ-ই-হুমায়ুন, পাণ্ডুলিপি, এশিয়াটিক সোসাইটি কলিকাতা, আংশিক অনুবাদ *Journal of the Asiatic Seciety of Bengal*, ১৮৯৮।

আকবর সম্বন্ধে সর্বপ্রথম যে গ্রন্থ রচিত হয়েছিল তা ছিল হাজী মুহম্মদ আরিফ কান্দাহারী বিরচিত তারীখ-ই-আকবরশাহী, যার পাণ্ডুলিপি রামপুর গ্রন্থাগারে পাওয়া গেছে। এটি একটি নির্ভরযোগ্য বিবরণ। কিন্তু সবচেয়ে বিখ্যাত আবুল ফজল কর্তৃক তিনখণ্ডে রচিত আকবর-নাম (ইংরাজী অনুবাদ: এইচ বেভারিজ, যার প্রথম খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে তৈমুর থেকে হুমায়ুন পর্যন্ত ইতিহাস, এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে আকবরের রাজ্যকাল। আবুল ফজলের দ্বিতীয় গ্রন্থ তিন খণ্ডে বিরচিত আইন-ই-আকবরীর কথা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। এটিকে কার্যত আকবরের আমলের ভারতবর্ষের একটি পরিসংস্থানগত বিবরণ বলা যায়। তাঁর তৃতীয় গ্রন্থ রুকাৎ-ই-আবুল ফজল, তাঁর রচিত চিঠিপত্রের সংকলন। এগুলি আকবর, মুরাদ, দানিয়েল, মরিয়ম মাকানি, সলিম ও অপরাপর বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট লিখিত এবং নানা প্রকার ঐতিহাসিক তথ্যে ভরপুর। গ্রন্থটি লক্ষ্ণৌর নবল কিশোর প্রেস

থেকে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত। আবুল ফজলের চতুর্থ গ্রন্থ ইনসা-ই-আবুল ফজল, অন্য নাম মুক্কবাৎ-ই-অল্লামী তাঁর রচিত সরকারী চিঠিপত্র ও নির্দেশাদির সংকলন। এগুলির প্রথম মুদ্রণ ঘটে ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে।

খাজা নিজামুদ্দীন আহমদ বিরচিত তবকাৎ-ই-আকবরীর (ইংরাজী অনুবাদ বি. দে ১৯৪০) কথা পূর্বে বলা হয়েছে। তিন খণ্ডে রচিত এই গ্রন্থটির প্রথম খণ্ডে দিল্লী সুলতানীর ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ডে প্রথম তিনজন মুঘল সম্রাটের আমলের ইতিহাস এবং তৃতীয় খণ্ডে বিভিন্ন আঞ্চলিক শক্তির ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। পূর্বোল্লিখিত আবদুল কাদির বদাউনী বিরচিত মুন্তখব-উৎ-তওয়ারিক বা তারীখ-ই-বদাউনী (ইংরাজী অনুবাদ: প্রথম খণ্ড, র‍্যাঙ্কিং, দ্বিতীয় খণ্ড, লোউই এবং তৃতীয় খণ্ড, হগ) আকবর পর্যন্ত মুঘল সম্রাটদের ইতিহাস। আকবর সম্পর্কে এই লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী যথেষ্ট সমালোচনামূলক। মুহম্মদ কাশিম বিরচিত পূর্বোল্লিখিত গুলশন্-ই-ইব্রাহিমী বা তারীখ-ই-ফিরিশ্‌তা পূর্বোক্ত দুই গ্রন্থের অনুরূপ বিষয়বস্তু অবলম্বনে রচিত, যেখানে জাহাঙ্গীরের রাজ্যলাভ পর্যন্ত ঘটনাবলী স্থান পেয়েছে, ইংরাজী অনুবাদ জি ব্রিগস্‌, লণ্ডন ১৮৯২, পুনর্মুদ্রণ কলিকাতা ১৯০৮।

ইনায়তুল্লার তকমীল-ই-আকবর-নাম। আবুল ফজলের আকবর-নামের পরিশিষ্ট যেখানে ১৬০৫ পর্যন্ত ঘটনাবলী স্থান পেয়েছে। ইংরাজী অনুবাদ বেভারিজ কৃত আকবর-নামের তৃতীয় খণ্ডে পরিশিষ্ট হিসাবে স্থান পেয়েছে। ১৫৯৬-৯৭ খ্রীষ্টাব্দে আবদুল হক রচিত তারীখ-ই-হক্কী (পাণ্ডুলিপি, সরস্বতী ভবন গ্রন্থাগার, উদয়পুর) আকবরের রাজ্যকাল অবলম্বনে রচিত। অলাহ্‌দাদ ফৈজী সিরহিন্দীর হুমায়ুন-শাহী ও আকবর-নাম প্রকৃত তথ্যমূলক ইতিহাস, শেষোক্ত রচনাটির অংশবিশেষের ইংরাজী অনুবাদ এলিয়ট ও ডওসন সিরিজের ষষ্ঠ খণ্ডে বর্তমান। আকবর ও সমকাল সম্পর্কিত অপরাপর রচনাবলী: হাসন বেগ রোমলু বিরচিত অহ্‌সন-উৎ-তওয়ারিখ (১৫৭৭), মীর্জা আলাউদ্দৌল্লা কজ্বিনী বিরচিত নফাইস-উল ম'আসীর (১৫৭৫), আব্বাস সারওয়ানির তারীখ-ই-শেরশাহী, অন্য নাম তুহ্‌ফা-ই-আকবরশাহী (১৫৮৭, ইংরাজী অনুবাদ এলিয়ট ও ডওসন, চতুর্থ খণ্ড, মুহিউদ্দীন আবদুল কাদির বিরচিত আমুর-উস-সাফির (১৬০৩) এবং রৌজিৎ-উৎ-তাহিরিন (১৬০৫), মুহম্মদ আমীন বিরচিত অনফাউল-ই-আকবরী (১৬২৬), ইয়াহা বিন আবদুল লতিফের পূর্বোল্লিখিত মুন্তখব-উৎ-তওয়ারিখ এবং আসদ বেগ রচিত ওয়াকায়া বা হালাৎ-ই-আসদ বেগ (১৬৩১-৩২)।

জাহাঙ্গীরের রাজ্যকালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান স্বয়ং সম্রাট রচিত আত্মজীবনী তুজুক-ই-জহাঙ্গীরী, সম্পাদনা সৈয়দ আহমদ খান, ইংরাজী অনুবাদ রজার্স ও বেভেরিজ ১৯০৯। তাঁর রাজ্যকাল সংক্রান্ত আরও দুটি বিখ্যাত আকরগ্রন্থ মুতামিদ খান বিরচিত ইকবাল-নাম ও মুহম্মদ হাদি বিরচিত তত্তিম্মা ওয়াকিয়াৎ-ই-জহাঙ্গীরী। প্রথমটির উর্দু অনুবাদ: আহমদ আলি শাউক, লক্ষ্ণৌ ১৮৭৪। জাহাঙ্গীরের রাজ্যকাল সংক্রান্ত আরও দুটি গ্রন্থ খাজা কামগার খরিয়ৎখান বিরচিত ম'আসির-ই-জুহাঙ্গীরী (ইংরাজী অনুবাদ: এলিয়ট ও ডনসন, ষষ্ঠ খণ্ড) এবং জনৈক অজ্ঞাতনামা লেখক বিরচিত ইন্তিখাব-ই-জহাঙ্গীর শাহ, আংশিক ইংরাজী অনুবাদ: এলিয়ট ও ডওসন, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৪৪৭-৫২।

শাহজাহানের রাজ্যকাল সম্পর্কে নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলি উল্লেখযোগ্য। ১৬৩৬ খ্রীষ্টাব্দে বাদশাহের আদেশে আমীন কজ্বীনী বিরচিত পাদশাহ-নাম, আবদুল হামিদ লাহউরী রচিত পাদশাহ-নাম দুই খণ্ডে প্রকাশিত, কলিকাতা ১৮৬৬-৭২), মুহম্মদ ওয়ারিস রচিত পাদশাহ-নাম (পাণ্ডুলিপি, রঘুবীর লাইব্রেরী সিতামৌ), ইনায়ৎ খান বিরচিত শাহজাহান-নাম (বৃটিশ মিউজিয়ম পাণ্ডুলিপি নং অতিরিক্ত ৩৯৭৭৭, ফোলিও ১-২৬২), মুহম্মদ শালিহ্ কম্বু রচিত অমল্-ই-শালিহ্ (প্রকাশ কলিকাতা ১৯১২) এবং মুহম্মদ সাদিক খান রচিত শাহজাহান-নাম (পাণ্ডুলিপি রামপুর)।

ঔরঙ্গজেব সংক্রান্ত ঐতিহাসিক উপাদান সমূহ: মীর্জা মুহম্মদ কাজিম রচিত আলমগীর-নাম যেখানে তাঁর প্রথম দশ বছরের রাজ্যকালের নির্ভরযোগ্য বিবরণ বর্তমান; মুহম্মদ সাকি মুস্তাইদ খান বিরচিত ম'আসির-ই-আলমগীরী (কলিকাতা ১৮৭০-৭৩); আকিল খান রাজী বিরচিত জাফর-নাম-ই-আলমগীরী (অন্যনাম ওয়াকিয়ৎ অথবা হালাৎ-ই-আলমগীরী) যেখানে ১৬৬৩ পর্যন্ত ঘটনাবলী বর্তমান (পাণ্ডুলিপি খুদাবক্স লাইব্রেরী, পাটনা); হাকিরী রচিত ঔরঙ্গজীব-নাম যাতে ঔরঙ্গজেবের ক্ষমতালাভের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে; মুহম্মদ হাসিম খাফী খান বিরচিত মুন্তখব-উল-লুবাব (কলিকাতা ১৮৬৯) যাতে ঔরঙ্গজেব পর্যন্ত তৈমুর-বংশীয় সকলেরই ইতিহাস বর্ণিত; ভীমসেন রচিত নুস্খ-ই-দিলকুশা যেখানে ১৬৭০ থেকে ১৭০৭ পর্যন্ত দাক্ষিণাত্যে বাদশাহের নীতি ও কার্যকলাপ আলোচিত হয়েছে; ঈশ্বর দাস বিরচিত ফুতুহাৎ-ই-আলমগীরী যাতে বিশেষ করে ১৬৫৭ থেকে ১৬৯৮ পর্যন্ত বাদশাহের রাজপুত নীতি বর্ণিত হয়েছে; প্রভৃতি।

শিহাবুদ্দীন আহমদ তালিশের ফথিয়া-ই-অব্রিইয়া মীরজুমলার কোচবিহার ও

আসাম অভিযানের একটি দিনলিপি। মীর মুহম্মদ মাসুমের তারীখ-ই-শাহ-সুজাই রাজকুমার সুজার শাসনকালীন বাংলার ইতিহাস যাতে ১৬৬০ পর্যন্ত ঘটনাবলী উল্লিখিত আছে (পাণ্ডুলিপি খুদাবক্স লাইব্রেরী)। নিয়ামৎ খান আলির ওয়কাই গ্রন্থে ঔরঙ্গজেব কর্তৃক ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দে গোলকুণ্ডা অবরোধের বর্ণনা আছে। হমীদুদ্দীন খানের অহ্‌কাম-ই-আলমগীরী গ্রন্থে ঔরঙ্গজেবের জীবনের নানা ছোটখাট ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যেগুলির মারফৎ বাদশাহের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের সম্যক অনুধাবন করা যায় (সম্পাদনা ও অনুবাদ স্যার যদুনাথ সরকার: *Anecdotes of Aurangzib*)। তিন খণ্ডে রচিত আলি মুহম্মদ খানের মীরাৎ-ই-অর্মাদী (গাইকোবাড় ওরিয়েণ্টাল সিরিজ, বরোদা) মুঘল যুগে গুজরাতের প্রামাণ্য ইতিহাস। অনুরূপ ভাবে সলিউল্লা্‌হর তবারীখ-ই-বাঙ্গালা (কলিকাতা ১৯১৮) বাংলাদেশের ইতিহাস অবলম্বনে রচিত।

মুঘলযুগের সরকারী কাগজপত্র ও দলিল দস্তাবেজের এবং চিঠিপত্রের নানা সংকলন বর্তমান যেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য দস্তুর-উল-অমল, অক্‌ভারাৎ-ই-দরবার-ই-মু'অল্লা, আদাব-ই-আলমগীরী, অখাম্‌-ই-আলমগীরী, কলিমাৎ-ই-তায়িবাৎ, কলিমাৎ-ই-ঔরঙ্গজীব, জাহির-উল-ইনসা, বাহার-ই-সখুন, হাফ্‌ৎ-আঞ্জুমান, রুকাৎ হমীদুদ্দীন খান প্রভৃতি। এগুলির অধিকাংশই পাণ্ডুলিপি আকারে বর্তমান। এ ছাড়া মুঘল সম্রাটদের প্রদত্ত ফরমানসমূহ মুঘল ইতিহাসের অমূল্য উপকরণ। এগুলির কিছু কিছু অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে, যেমন কে. এম. ঝাভেরি সম্পাদিত *Imperial Farmans* (বোম্বাই ১৯২৮), বি. এল. গোস্বামী এবং জে. এস. গ্রেবাল সম্পাদিত *The Mughuls and the Jogis of Jakhbar* (সিমলা ১৯৬৭), জে. জে. মোদী সম্পাদিত *The Parsees at the Court of Akbar and Dastur Meherji Rana* (বোম্বাই ১৯০৩), বিকানীরের ডিরেক্টরেট অফ আর্কাইভস প্রকাশিত (১৯৬২) *A Descriptive List of Farmans, Manshurs and Nishans Addressed by the Imperial Mughuls to the Princes of Rajasthan*, প্রভৃতি।

মুঘলযুগের আঞ্চলিক ইতিহাসের উপর অনেকগুলি আকরগ্রন্থ বর্তমান। বিশেষ উল্লেখযোগ্যগুলি আমরা এখানে লিপিবদ্ধ করছি। সৈয়দ আলি তবাতবা রচিত পূর্বোক্ত বুরহান-ই-ম'আসির এবং ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ হবিবুল্লাহ্‌ রচিত তারীখ-ই-মুহম্মদ কুতবশাহী গ্রন্থদ্বয়ে গোলকুণ্ডার ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। তারীখ-ই-আলী

আদিল শাহ সানি, এবং ১৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে জহুর-বিন-জহুরী রচিত মুহম্মদ-নাম বিজাপুরের ইতিহাসের মূল্যবান উপাদান। এই প্রসঙ্গে মীর্জা রফি বিরচিত তজকিরাৎ-উল-মুলুক গ্রন্থটিও উল্লেখযোগ্য। সিন্ধুর ইতিহাস: পূর্বোক্ত তারীখ-ই-সিন্দ, অন্য নাম তারীখ-ই.মাসুমী; ১৬২৪ খ্রীষ্টাব্দে রচিত বগলান-নাম; তাহির মুহম্মদ রচিত তারিখ-ই-তাহিরী; আলি শের কানি রচিত তুহ্ফাৎ-উল-কিরাম। গুজরাত: ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দে সিকন্দর-বিন-মুহম্মদ রচিত মীরাৎ-ই-সিকন্দরী; আলি মুহম্মদ খান রচিত মীরাৎ-ই-আহমদী; মীর আবু তুরাব বলী রচিত তারীখ-ই-গুজরাত; আবদুল্লা মুহম্মদ বিন উমর অল-মক্কী রচিত জাফর-উল-ওয়ালিহ্। বাংলা-দেশ: সিতাব খান রচিত বহারিস্তান-ই-খাইবী; গুলাম হুসেন সলীম রচিত রিয়াজ-উস সালাতিন; সলিমুল্লাহ রচিত তারিখ-ই-বাঙ্গালা। কাশ্মীর: মীর্জা হায়দার দুঘলাত রচিত তারীখ-ই-রশীদী; মুল্লা মুহম্মদ অজামী রচিত তারীখ-ই-অজামী; হায়দর মালিক রচিত তারীখ-ই-কাশ্মীর ও বদি-উজ-জমান রচিত লতইফ-উল-আখবার। অধিকাংশ গ্রন্থেরই পরিচয় পূর্বে দেওয়া হয়েছে।

আরও কয়েকটি বিখ্যাত গ্রন্থ: মুল্লা আবদুল বাকি নহাবন্দী কর্তৃক তিন খণ্ডে রচিত ম'আসির-ই-রহীমী; খাজা নিমাতুল্লাহ রচিত মখজান্-ই-আফঘানী; আহমদ ইয়াদগার রচিত তারীখ-ই-শাহী; আবদুল্লাহ্ রচিত তারীখ-ই-দাউদী; অজ্ঞাতনামা লেখক বিরচিত তারীখ-খানদান-ই-তিমুরীদ; মুহম্মদ হাদী কামওয়ার খান রচিত তজকিরৎ-উস-সলাতিন ই ছগতাইয়া; শাহ নওয়াজ খানের ম'আসির-উল-উমরা (ইংরাজী অনুবাদ: এইচ. বেভেরিজ ও বেনীপ্রসাদ), মহসীন ফানী রচিত দাবিস্তান-ই-মজাহিব (ইংরাজী অনুবাদ: ডেভিড শেয়া এবং অ্যাণ্টনি ট্রোয়ার); মীর্জা সাদিক ইস্ফাহানী রচিত সুভ-ই-সাদিক; মুহম্মদ ইউসুফ আতকী রচিত মুন্তখব-ই-তওয়ারীখ; শেখ মুহম্মদ বাকা রচিত মীরাৎ-ই-জহান-নুমা; বখতাওয়ার খান রচিত মীরাৎ-উল-আলম; বৃন্দাবন দাস রচিত লুব্ব্-ৎ-তওয়ারীখ; সুজন রাই খত্রী রচিত খুলাসৎ উৎ তওয়ারীখ; জাফর বেগ ও আসফ খান রচিত তারীখ-ই-অল্ফী; প্রভৃতি। এগুলি ছাড়া বিপুল পারসিক দীবান, মথনবী ও কুল্লিয়াৎ সাহিত্যে মুঘল আমলের অনেক সংবাদ জানা যায়।

বৈদেশিক বিবরণীসমূহে মুঘল আমলের ভারতবর্ষ সম্পর্কে অনেক নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়। এই জাতীয় প্রথম গ্রন্থ তুর্কী নৌ-অধ্যক্ষ সিদি আলি রইস রচিত ভারতবর্ষ, আফগানিস্তান, মধ্য এশিয়া ও পারস্যের বিবরণ যাতে বাবুর ও হুমায়ুনের

রাজ্যকালের খবর আছে ; ইংরাজী অনুবাদ : এ ভ্যাম্‌বেরী, লণ্ডন ১৮৯৯। পাদ্রী এফ. অ্যাণ্টনি মনসেরয়েট (১৫৮০-৮৩) রচিত *Mongolicae Legationis Commentarius* ল্যাটিন সংস্করণ, এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল ১৯১৪, ইংরাজী অনুবাদ : জে. এস. হোয়েল্যাণ্ড ১৯২২। পূর্বদেশে জন হয়েগেন ভ্যান লিনস্কোটেনের ভ্রমণ বৃত্তান্ত, সম্পাদনা এ. সি. বার্নেল ও পি. এ. টাইলে, লণ্ডন ১৮৮৫। রালফ্ ফিচ (১৫৮৩-৯১) ও জন মিলডেনহলের ভ্রমণ বৃত্তান্ত, *Early Travels in India,* সম্পাদনা ডবিউ ফস্টার ১৯২১। ফাদার ফের্নাও গুয়েরিওর বৃত্তান্ত (১৬০৭-৮), সংক্ষিপ্ত অনুবাদ : এইচ হস্টেন, *Journal of the Punjab Historical Society* সপ্তম খণ্ড। ডবিউ. হকিন্স (১৬০৮-১৩), ডব্লিউ ফিঞ্চ (১৬০৮-১১), এন. উইথিংটন (১৬১২-১৬), টি. কোরিয়াট (১৬১২-১৭) ও ই. টেরির (১৬১৬-১৯) ভ্রমণবৃত্তান্ত, *Early Travels in India,* সম্পাদনা ডব্লিউ ফস্টার ১৯২১। সার জেমস ল্যাঙ্কাস্টার (১৬১০-১১), সার হেনরী মিডলটন (১৬১০-১১), মাস্টার জোসেফ সালব্যাঙ্ক (১৬০৯-১০), *Purchas His Pilgrims* তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড। এরেদিয়া দে মানুয়েল গোদিনোর হিন্দুস্তান ও গুজরাত বিবরণ (১৬১১), ইংরাজী অনুবাদ এইচ. হস্টেন, এশিয়াটিক সোসাইটি ১৯৩৮। এফ. পিয়েরে দু জারিখ (১৬১৪) *Histoire des choses plus memorables advenues,* ইংরাজী অনুবাদ সি. এইচ. পায়নে *Akbar and the Jesuits,* লণ্ডন ১৯২৬ এবং *Jahangir and the Jesuits* লণ্ডন ১৯৩০।

নিকোলাস ডওটনের (১৬১৪-১৫) বৃত্তান্ত, সম্পাদনা ডব্লিউ. ফস্টার ১৯৩৯। রিচার্ড ষ্টিল ও জন ক্রোথার (১৬১৫-১৬), *Purchas* চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ২৬৬-৮০। সার টমাস রোর ভারতীয় দৌত্যের বিবরণ (১৬১৫-১৯), সম্পাদনা, ডব্লিউ ফস্টার ১৯৩৬। এফ পেলসায়ের্ত বিরচিত জাহাঙ্গীরের ভারত, ডাচ থেকে অনুবাদ, ডব্লিউ. এইচ মোরল্যাণ্ড এবং পি. গোয়েল, কেম্ব্রিজ ১৯২৫। পিটার ফ্লোরিসের (১৬১১-১২) ভ্রমণ বৃত্তান্ত, সম্পাদনা মোরল্যাণ্ড ১৯৩৪। টমাস বেস্টের (১৬১২-১৪) ভ্রমণ বৃত্তান্ত, সম্পাদনা ফস্টার ১৯৩৪। সুরাটে পিটার ভ্যানডেন ব্রোয়েক(১৬২০-২৯),*Journal of Indian History,* দশম খণ্ড, পৃঃ ২৫৫-৫০, একাদশ খণ্ড, পৃঃ ১১৬, ২০৩-০৮। পিয়েত্রো দেলা ভাল্লের (১৬২৩-২৪) ভ্রমণ বৃত্তান্ত, সম্পাদনা এডওয়ার্ড গ্রে। দে লায়েৎ-এর *De Imperio Magni Moglis, sive India vera Commentarius ex variis Auctoribus Congestis,* লাইডেন ১৬৩১, ইংরাজী অনুবাদ জে. এস.

হোয়ল্যাণ্ড ও টীকা এস. এন. ব্যানার্জী, *The Empire of the Great Mughal*, বোম্বাই ১৯২৮।

পিটার মাণ্ডির (১৬৩০-৩৪) ভ্রমণ বৃত্তান্ত, সম্পাদনা, রিচার্ড টেম্পল ১৯১৪। সেবাষ্টিয়ান মানরিকের ভ্রমণ বৃত্তান্ত (১৬২৯-৪৩), সম্পাদনা সি. ই. লুয়ার্ড এবং ফাদার এইচ হোস্টেন ১৯২৬-২৭। অ্যালবার্ট মাণ্ডেলস্লোর (১৬৩৮-৩৯) ভ্রমণবৃত্তান্ত, সম্পাদনা অ্যাডাম ওলিয়ারিউস ১৬৬৯। ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়েরের ভ্রমণ বৃত্তান্ত (১৬৫৬-৬৮), সম্পাদনা, এ. কনস্টেবল, অক্সফোর্ড ১৯১৪। জাঁ বাপ্তিস্ত তাভের্নিয়েরের ভ্রমণ বৃত্তান্ত (১৬৪০-৮৭), সম্পাদনা ও ইংরাজী অনুবাদ ভি. বল, লণ্ডন ১৮৮৯। নিকোলাও মানুচ্চীর (১৬৫৩-১৭০৮) *Storia de Mogor*, সম্পাদনা ও ইংরাজী অনুবাদ ডব্লিউ আরভিং (১৯০৭-০৮। দে থেভেনোর (১৬৬৭) ভ্রমণবৃত্তান্ত (তিন খণ্ডে ইংরাজী অনুবাদ ১৬৮৬)। জন মার্শালের (১৬৬৮-৭২) বিবরণ, সম্পাদনা সফাৎ আহমদ খান, অক্সফোর্ড ১৯২৭। টমাস বাওরি (১৬৬৯-৭২) রচিত বঙ্গোপসাগর অঞ্চলের ভৌগোলিক বিবরণ, *A Geographical Account of the Countries Round the Bay of Bengal*, সম্পাদনা রিচার্ড টেম্পল, লণ্ডন ১৯০৫। জন ফ্রেয়ারের (১৬৭২-৮১) *A New Account of East Indies and Persia*, সম্পাদনা, উইলিয়ম ক্রুক, লণ্ডন ১৯০৯, ১৯১২, ১৯১৫। উইলিয়ম হেজেসের (১৬৮১-৮৭) ডায়েরি, সম্পাদনা কর্নেল হেনরী ইউল। আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটনের (১৬৮৮-১৭২৩) *A New Account of East Indies*, লণ্ডন ১৭২৪। ওভিংটনের (১৬৮৯) *Voyage to Surat* লণ্ডন ১৬৯৬, সম্পাদনা : এইচ. জি. রলিনসন ১৯২৯। থেভেনো ও কেরীর ভ্রমণবৃত্তান্ত, সম্পাদনা এস. এন. সেন ১৯৪৯।

কলাপঞ্জী

১০৩০	সুলতান মাহমুদের মৃত্যু।
১০৩১	মাসুদের গজনীর সিংহাসন লাভ।
১০৩৪	আহমদ নিয়ালতিগীনের বারাণসী অভিযান। কলচুরি গাঙ্গেয়দেব কর্তৃক তুর্কী আক্রমণ প্রতিরোধ।
১০৩৬	মাসুদের দ্বিতীয় পুত্র মজদূদের পাঞ্জাবের শাসক হিসাবে নিযুক্তি।
১০৪০	মাসুদের হিন্দুস্তান অভিযান ও মৃত্যু।
১০৪৯	মৌদুদের মৃত্যু।
১০৫৯	গজনীর সিংহাসনে ইব্রাহিম।
১০৬৩	পুত্র কলসের অনুকূলে কাশ্মীররাজ অনন্তের সিংহাসন ত্যাগ।
১০৭৫	পাঞ্জাবের শাসকরূপে ইব্রাহিমের পুত্র মাসুদের নিয়োগ।
১০৯৯	গজনীতে তৃতীয় মাসুদের সিংহাসন লাভ।
১১০১	কাশ্মীররাজ হর্ষের মৃত্যু। হোয়সল বিনয়াদিত্যের মৃত্যু ও প্রথম বল্লালের সিংহাসন লাভ।
১১১১	কাশ্মীররাজ উচ্চলের মৃত্যু।
১১১৮	বহ্‌রাম কর্তৃক গজনী অধিকার।
১১৫২	বহরামের মৃত্যু ও খুসরব শাহের সিংহাসন লাভ।
১১৬০	ঘুসরব মালিক খুসরব শাহের উত্তরাধিকারী।
১১৬৩	গিয়াসুদ্দীন মুহম্মদের ঘুরের সিংহাসন লাভ।
১১৭০	জয়চন্দ্রের কনৌজের সিংহাসন লাভ।
১১৭৩	ঘুজদের নিকট থেকে গিয়াসুদ্দীন মুহম্মদের গজনী উদ্ধার ও নিজ ভ্রাতা শিহাবুদ্দীনকে (মুইজুদ্দীন) সেখানকার শাসক পদে নিযুক্তি।
১১৭৫	কারামিতদের কাছ থেকে মুইজুদ্দীন মুহম্মদ ঘুরীর মুলতান ও উচ দখল।
১১৭৭	পৃথ্বীরাজ চৌহানের সিংহাসন লাভ।
১১৭৮	মুহম্মদ ঘুরী কর্তৃক গুজরাত আক্রমণ, নাডোল দখল ও লুণ্ঠন, দ্বিতীয় মূলরাজ কর্তৃক প্রতিহত, পেশোয়ার দখল। চৌলুক্য দ্বিতীয় ভীমের সিংহাসন লাভ।

১১৮১ মুহম্মদ ঘুরীর লাহোর আক্রমণ।

১১৮২ চন্দেল্লদের উপর পৃথ্বীরাজ চৌহানের বিজয় লাভ। সুমরা প্রধান কর্তৃক মুহম্মদ ঘুরীর প্রভুত্ব স্বীকার।

১১৮৪ মুহম্মদ ঘুরীর লাহোর অভিযান।

১১৮৫ মুহম্মদ ঘুরীর শিয়ালকোট অধিকার।

১১৮৬ মুহম্মদ ঘুরী কর্তৃক খুসরব মালিককে উৎখাত। তৃতীয় লাহোর অভিযান।

১১৯১ তরাইনের প্রথম যুদ্ধ।

১১৯২ তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ, পৃথ্বীরাজের পরাজয় ও মৃত্যু। খুসরব মালিক ও তাঁর পুত্র বহরামকে হত্যা।

১১৯৩ মুহম্মদ ঘুরীর হস্তে চন্দাবারের নিকট জয়চন্দ্রের পরাজয়। কুতুবুদ্দীন কর্তৃক আজমীর বিজয় ও দিল্লীতে রাজধানী স্থাপন।

১১৯৫ মুহম্মদ ঘুরী কর্তৃক বয়ান ও গোয়ালিয়র অধিকারের পরিকল্পনা।

১১৯৬ গোয়ালিয়রে তুর্কী অধিকার। মুহম্মদ ঘুরীর নিকট কুনওয়ার পালের পরাজয়। তৃতীয় কুলোত্তুঙ্গ কর্তৃক কাঞ্চী পুনরধিকারী।

১১৯৭ কুতবুদ্দীনের সেনাপতি খুসরবের নিকট ধারাবর্ষের পরাজয়। কুতবুদ্দীনের গুজরাত অভিযান। যাদব জৈতুগীর সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ।

১২০০ বখ্তিয়ার খলজীর পূর্বাঞ্চল অভিযান।

১২০২ কুতবুদ্দীন কর্তৃক কালঞ্জর অভিযান। গিয়াসুদ্দীনের মৃত্যু ও মুহম্মদ ঘুরীর রাজ্যলাভ। বক্তিয়ার খলজীর নদীয়া জয়।

১২০৫ খওয়ারিজমীগণ কর্তৃক মুহম্মদ ঘুরী পরাজিত। বক্তিয়ার খলজীর তিব্বত অভিযান।

১০৩৬ মুহম্মদ ঘুরীকে হত্যা। বক্তিয়ার খলজীকে হত্যা।

১২১০ কুতবুদ্দীনের মৃত্যু।

১২১১ হোয়সল দ্বিতীয় বল্লালের বিরুদ্ধে যাদব সিংহণের অভিযান।

১২১৪ আলাউদ্দীন খওয়ারিজম শাহ কর্তৃক ঘুরীদের বিতাড়ন।

১২১৫ গজনীতে ঘুরী সাম্রাজ্যের অবসান।

১২২৬ ইলতুৎমিশের রণথম্ভোর অধিকার। গিয়াসুদ্দীন আইওয়াজ কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের ব্যর্থ প্রচেষ্টা।

১২২৯ ইলতুৎমিশকে খলিফার অনুমোদন।

১২৩৩ ইলতুৎমিশের ভিলসা জয় এবং উজ্জয়নী ও মালব লুণ্ঠন।

১২৩৪ ছাহড়দেব কর্তৃক মালিক নুসরতুদ্দীন তয়াসী পরাজিত।

১২৩৬ ইলতুৎমিশের মৃত্যু। কাশ্মীরে সংগ্রামদেবের রাজ্যলাভ।

১২৪০ রজিয়া নিহত।

১২৪২ মুইজুদ্দীন বহরামের পতন।

১২৪৬ আলাউদ্দীন মাসুদ শাহের পতন।

১২৪৮ উলুঘ খানের রণথম্ভোর অভিযান।

১২৫০ বলবনের মালব অভিযান। কাকতীয় গণপতির কাঞ্চী দখল।

১২৫১ বলবন কর্তৃক ছাহড়দেব পরাজিত।

১২৫৪ কাতেরিয়াদের বিরুদ্ধে বলবনের অভিযান।

১২৫৭ ইখতিয়ারউদ্দীন উজবক তুঘ্রিল খানের কামরূপ অভিযান।

১২৫৮ বলবন কর্তৃক গোয়ালিয়র অধিকার।

১২৬৫ বলবন সম্রাট পদে অভিষিক্ত।

১২৮৩ সোনার গাঁও-এ দনুজ রায়ের সঙ্গে বলবনের চুক্তি।

১২৮৬ বলবনের জ্যেষ্ঠ পুত্র মুহম্মদের মৃত্যু।

১২৮৭ বলবনের মৃত্যু।

১২৯০ জালালুদ্দীন খলজীর দিল্লীর সুলতানী লাভ।

১২৯৪ আলাউদ্দীন খলজীর দেবগিরি অভিযান।

১২৯৬ জালালুদ্দীন নিহত। আলাউদ্দীন খলজীর সুলতানী দখল।

১২৯৯ উলুঘ খান ও নুসরৎ খান কর্তৃক গুজরাতের কর্ণ পরাজিত।

১৩০১ আলাউদ্দীন খলজীর রণথম্ভোর অধিকার।

১৩০৩ আলাউদ্দীনের চিতোর অধিকার।

১৩০৫ আলাউদ্দীনের মালব অভিযান। হোয়সল বল্লাল কর্তৃক যাদবদের আক্রমণ।

১৩০৭ যাদব রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে মালিক কাফুর প্রেরিত।

১৩০৯ মালিক কাফুরের বরঙ্গল আক্রমণ।

১৩১৩ কাফুরের দেবগিরি অভিযান। শংকরদেব নিহত।

১৩১৬ আলাউদ্দীন খলজীর মৃত্যু।

১৩১৭ মুবারকের দেবগিরি অভিযান।

১৩২০ মুবারক নিহত। নাসিরুদ্দীন খুসরবের সুলতানীলাভ, পরাজয় ও মৃত্যু। গিয়াসুদ্দীন তুঘলকের সুলতানী লাভ।

১৩২১ জৌনা খানের বরঙ্গল অভিযান।

১৩২৩ দ্বিতীয় বরঙ্গল অভিযান। কাশ্মীরে রিঞ্চনের মৃত্যু ও উদয়নের রাজ্যলাভ। পশ্চিমবঙ্গে নাসিরুদ্দীনের ক্ষমতা দখল।

১৩২৪ গিয়াসুদ্দীন তুঘলকের বঙ্গদেশ অভিযান।

১৩২৫ গিয়াসুদ্দীন তুঘলকের মৃত্যু। মুহম্মদ বিন তুঘলকের সুলতানীলাভ। পশ্চিমবঙ্গে গিয়াসুদ্দীন বাহাদুরের পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

১৩২৬ গুরশাস্পের বিদ্রোহ। কম্পিলীতে অভিযান।

১৩২৭ দিল্লী থেকে দৌলতাবাদে রাজধানী স্থানান্তর।

১৩২৮ মুলতানের কিশ্‌লু খানের বিদ্রোহ। তর্মাশিরীনের ভারত অভিযান।

১৩২৯ মুহম্মদ তুঘলক কর্তৃক নূতন মুদ্রাব্যবস্থার প্রচলন।

১৩৩০ পূর্ব বঙ্গে বহরামের ক্ষমতালাভ।

১৩৩১ গিয়াসুদ্দীন বাহাদুরের বিদ্রোহ।

১৩৩৪ মাদুরায় জালালুদ্দীন আহশানের বিদ্রোহ।

১৩৩৫ মুহম্মদ তুঘলকের মাদুরা যাত্রা। বরঙ্গলে বিরতি। দক্ষিণে হিন্দু শক্তি-জোট। সিন্ধুতে জাম উনরের রাজ্যলাভ। লাহোর, দৌলতাবাদ, সরস্বতী ও চান্‌সিতে বিদ্রোহ।

১৩৩৬ দুর্ভিক্ষ। স্বর্গদ্বারী নগরীর পত্তন। বিদর, কায়া, গুলবর্গা। অবধে বিদ্রোহ ও হরিহর কর্তৃক বিজয়নগরের প্রতিষ্ঠা।

১৩৩৭ মুহম্মদ তুঘলকের হিমালয় অভিযান। নগরকোট অধিকার।

১৩৩৮ বঙ্গদেশে ফকরুদ্দীন মুহম্মদের স্বাধীনতা ঘোষণা। কাশ্মীরে উদয়নের মৃত্যু ও কোটার রাজ্যলাভ।

১৩৩৯ জালালুদ্দীন আহশান শাহের মৃত্যু ও মা'বারে আলাউদ্দীন উদাইজির ক্ষমতালাভ। কোটাকে অপসারণ ও কাশ্মীরে সামসুদ্দীনের রাজ্যলাভ। বঙ্গদেশে ইলিয়াস শাহের রাজ্যলাভ।

১৩৪০ বঙ্গদেশে আলাউদ্দীন আলি শাহের ক্ষমতালাভ। বুক কর্তৃক পেনু-গোণ্ড অধিকার। উদাইজির মৃত্যু ও মা'বারে কুতবুদ্দীন ফিরুজ ও

গিয়াসুদ্দীন মুহম্মদ দামঘানির পরপর ক্ষমতালাভ।

১৩৪২ কাশ্মীরে সামসুদ্দীনের মৃত্যু, জামসিদ ও তারপর আলি শেরের ক্ষমতালাভ। হোয়সল তৃতীয় বল্লালের মৃত্যু।

১৩৪৩ মুহম্মদ তুঘলকের সন্নাম, সামান, কৈথল ও কুহরানে অভিযান।

১৩৪৫ মালব, গুজরাত ও দাক্ষিণাত্যে বিদ্রোহ। মুহম্মদের গুজরাতে বিদ্রোহ দমন। দৌলতাবাদে বিদ্রোহ।

১৩৪৬ বুক্ক কর্তৃক হোয়সলরাজ্য অধিকার।

১৩৪৭ গুজরাতে তঘীর বিদ্রোহ। আলাউদ্দীন বহমন শাহ কর্তৃক বহমনী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা। বিজয়নগরের মারপ কর্তৃক কদম্ব রাজ্য জয়।

১৩৪৯ বঙ্গদেশে ফকরুদ্দীন মুবারকের মৃত্যু।

১৩৫০ সিন্ধুতে মুহম্মদ তুঘলক। বহমন শাহের রঙ্গেল অভিযান।

১৩৫১ মুহম্মদ তুঘলকের মৃত্যু ও ফিরুজের সিংহাসন লাভ।

১৩৫২ ইলিয়াস শাহের সোনার গাঁও অধিকার। কুমার কম্পন কর্তৃক মা'বার অধিকার।

১৩৫৩ ফিরুজ শাহের প্রথম বঙ্গ অভিযান।

১৩৫৬ হরিহরের মৃত্যু। বিজয়নগরের সিংহাসনে প্রথম বুক্ক।

১৩৫৭ বঙ্গে ইলিয়াস শাহের মৃত্যু ও সিকন্দরের রাজ্যলাভ। বহমন শাহের মৃত্যু ও দাক্ষিণাত্যে প্রথম মুহম্মদের রাজ্যলাভ।

১৩৫৮ বঙ্গদেশে ও উড়িষ্যায় ফিরুজ শাহের দ্বিতীয় অভিযান।

১৩৬১ ফিরুজ কর্তৃক কাংড়া বা নগরকোট দখল।

১৩৬২ ফিরুজের প্রথম সিন্ধু অভিযান। প্রথম মুহম্মদ বহমনীর বিজয়নগর আক্রমণ।

১৩৬৩ ফিরুজের দ্বিতীয় সিন্ধু অভিযান।

১৩৬৫ বহমনী প্রথম মুহম্মদ কর্তৃক কৃষ্ণানদীকে সীমানা হিসাবে স্বীকার।

১৩৭০ কুমার কম্পনের মা'বার গ্রাস।

১৩৭৩ কাশ্মীরে শিহাবুদ্দীনের মৃত্যু ও কুতবুদ্দীনের রাজ্যলাভ।

১৩৭৫ মুহম্মদ বহমনীর মৃত্যু ও আলাউদ্দীন মুজাহিদের রাজ্যলাভ।

১৩৭৭ এটাওয়া ও কাতেহরে বিদ্রোহ। মালিক মুফ্‌রহ গুজরাতের শাসক। প্রথম বুক্কের মৃত্যু ও দ্বিতীয় হরিহরের রাজ্যলাভ। মুজাহিদ বহমনীর

বিজয়নগর আক্রমণ।

১৩৭৮ মেবারে হম্মীরের মৃত্যু ও ক্ষেত্রসিংহের রাজ্যলাভ। মুজাহিদ ও দাউদ বহমনী নিহত ও দ্বিতীয় মুহম্মদের রাজ্যলাভ।

১৩৮৭ ফিরুজ শাহ ও তাঁর পুত্র নাসিরুদ্দীনের যুগ্ম শাসন। গুজরাতে ফরহাৎ-উল-মুল্‌কের বিদ্রোহ।

১৩৮৮ ফিরুজ তুঘলকের মৃত্যু।

১৩৯০ বঙ্গদেশে সিকন্দরের মৃত্যু ও গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের রাজ্যলাভ। মেবারের ক্ষেত্রসিংহ কর্তৃক মালবের দিলাবার খান পরাজিত। কাশ্মীরে কুতবুদ্দীনের মৃত্যু ও সিকন্দরের রাজ্যলাভ। দিল্লীতে আবুবকরের বহিষ্কার ও মুহম্মদের সুলতানী। বহমনী পৃষ্ঠপোষকতায় বেলমদের বিজয়নগর আক্রমণ। কুমার গিরি রেড্‌ডির উড়িষ্যা আক্রমণ।

১৩৯১ জাফরখান গুজরাতের শাসক নিযুক্ত।

১৩৯২ এটাওয়ায় বিদ্রোহ। গুজরাতের ফরহাৎ উল মুল্ক নিহত।

১৩৯৩ মেওয়াটে বিদ্রোহ।

১৩৯৪ দিল্লীর সুলতান মুহম্মদের মৃত্যু। আলাউদ্দীন সিকন্দরের রাজ্যলাভ ও মৃত্যু। নাসিরুদ্দীন মাহমুদের সুলতানী। সারঙ্গ খান কর্তৃক পাঞ্জাবের বিদ্রোহ-দমন। জৌনপুরে মালিক সর্বরের প্রতিষ্ঠা।

১৩৯৭ তৈমুরের নাতি পীর মুহম্মদের উচ দখল। বহমনী রাজ্যে পরপর হত্যা ও ফিরুজ বহমনীর রাজ্যলাভ।

১৩৯৮ দিল্লীতে মল্লু সর্বেসর্বা। দ্বিতীয় হরিহরের বহমনী রাজ্য আক্রমণ। তৈমুরের সিন্ধু অতিক্রম, দিল্লী আগমন ও লুণ্ঠন।

১৩৯৯ তৈমুরের প্রত্যাবর্তন। নুসরৎ শাহের মৃত্যু ও দিল্লীতে মাহমুদ শাহের প্রত্যাবর্তন। জৌনপুরে মুবারক শাহের রাজ্যলাভ। খান্দেশে নাসির খানের রাজ্যলাভ।

১৪০০ মল্লুর এটাওয়া অভিযান।

১৪০১ মাহমুদ শাহের দিল্লী প্রত্যাবর্তন। মালবে দিলবারের স্বাধীনতা ঘোষণা। গুজরাতের সুলতান মুজফ্‌ফরের দিউ অধিকার।

১৪০২ জৌনপুরে মুবারকের মৃত্যু ও ইব্রাহিম খানের রাজ্যলাভ। মল্লুর গোয়ালিয়র অধিকারের চেষ্টা।

১৪০৩ গুজরাতে তাতার খানের ক্ষমতালাভ।

১৪০৪ মল্লু্র এটাওয়া ও কনৌজ দখল। বিজয়নগরের দ্বিতীয় হরিহরেরর মৃত্যু ও বিরূপাক্ষের রাজ্যলাভ।

১৪০৫ মল্লু্র মৃত্যু। দৌলত খান লোদীর অনুরোধ কনৌজ থেকে মাহমুদ শাহের দিল্লী প্রত্যাবর্তন। মালবে দিলাবারের মৃত্যু ও হুসঙ্গের রাজ্যলাভ। বিজয়নগরে দ্বিতীয় বুক্ক কর্তৃক বিরূপাক্ষকে উৎখাত।

১৪০৬ প্রথম দেবরায় কর্তৃক দ্বিতীয় বুক্ক উৎখাত। ফিরুজ বহমনীর বিজয়নগর আক্রমণ।

১৪০৭ জৌনপুরের ইব্রাহিম কর্তৃক কনৌজ ও সম্ভল দখল। মুজফ্ফর গুজরাতের সুলতান ঘোষিত ও তৎকর্তৃক মালব আক্রমণ ও হুসঙ্গকে গ্রেপ্তার।

১৪১০ খিজির খানের দিল্লী অবরোধ ও ফিরুজাবাদ দখল। বাংলায় গিয়াসুদ্দীন আজমের মৃত্যু ও সৈফুদ্দীন হামজার রাজ্যলাভ।

১৪১১ গুজরাতে প্রথম মুজফ্ফরের মৃত্যু এবং প্রথম আহমদের রাজ্যলাভ। হুসঙ্গের গুজরাত অভিযান।

১৪১২ বাংলায় হামজার মৃত্যু ও শিহাবুদ্দীন বায়াজিদের রাজ্যলাভ।

১৪১৩ মাহমুদের মৃত্যুতে তুঘলক রাজত্বের অবসান। কাশ্মীরে সিকন্দরের মৃত্যুতে আলি শাহের রাজ্যলাভ।

১৪১৪ দিল্লীর সুলতানীতে খিজির খান। বাংলায় শিহাবুদ্দীনের মৃত্যু ও আলাউদ্দীন ফিরুজের রাজ্যলাভ। উড়িষ্যায় চতুর্থ নরসিংহের মৃত্যু ও চতুর্থ ভানুদেবের রাজ্যলাভ।

১৪১৫ বাংলায় আলাউদ্দীন ফিরুজের মৃত্যু, ও গণেশের পুত্র যদু বা জালালুদ্দীনের ক্ষমতা লাভ। নাগৌরে খিজিরের অভিযান। ফিরুজ বহমনীর পঙ্গল আক্রমণ। খান্দেশের নাসির খানের থালনের ও গুজরাত আক্রমণ ও পরাজয়।

১৪১৯ দেবরায় কর্তৃক ফিরুজ বহমনী পরাজিত। গুজরাতের প্রথম আহমদের মালব অভিযান।

১৪২০ লক্ষ সিংহের মৃত্যু ও মেবারে মোকলের ক্ষমতালাভ। কাশ্মীরে আলি শাহের পতন ও জৈনুল আবেদিনের রাজ্যলাভ। মালবের হুসঙ্গ কর্তৃক উড়িষ্যায় হামলা।

১৪২২ খোক্কর জসরথের বিদ্রোহ দমন। গুজরাতের প্রথম আহমদের মালব আক্রমণ ও মাণ্ডু অবরোধ। প্রথম দেবরায়ের মৃত্যু। ফিরুজ বহমনীর পতন ও পরাজয়।

১৪২৩ মুবারক কর্তৃক বয়ানের শাসক পরাজিত, ও হুসঙ্গের প্রভাবাধীন গোয়ালিয়র উদ্ধারে যাত্রা।

১৪২৫ মেওয়াটে বিদ্রোহ দমন। আহমদ বহমনী কর্তৃক বিদরে রাজধানী স্থানান্তর।

১৪২৮ দেবরায় (দ্বিতীয়) কর্তৃক কোণ্ডবিড়ু অধিকার। মুবারকের বয়ান অধিকার। আহমদ বহমনী কর্তৃক হুসঙ্গ পরাজিত।

১৪২৯ আহমদ বহমনীর গুজরাত অভিযান।

১৪৩০ পুলাদ তুর্কবাচ্ছার বিদ্রোহ। গুজরাতের নিকট বহমনীদের পরাজয়।

১৪৩১ শেখ আলির নেতৃত্বে মঙ্গোল আক্রমণ। হুসঙ্গের কাল্পি দখল। বাংলায় জালালুদ্দীনের মৃত্যু ও সামসুদ্দীন আহমদের রাজ্যলাভ।

১৪৩৩ মোকল নিহত ও কুম্ভ মেবারের রাজা।

১৪৩৪ সুলতান মুবারক নিহত। মুহম্মদ শাহ সুলতান। সর্বর-উল-মুল্ক বিতাড়িত। উড়িষ্যায় কপিলেন্দ্র।

১৪৩৫ মালবে হুসঙ্গের মৃত্যু ও মুহম্মদের রাজ্যলাভ।

১৪৩৬ বুহ্‌লুল কর্তৃক খোক্কর দমন। খান্দেশের নাসির কর্তৃক বহমনী রাজ্য আক্রমণ ও পরাজয়। মাহমুদ খলজীর মালবে ক্ষমতালাভ। আহমদ বহমনীর মৃত্যু ও আলাউদ্দীন আহমদের রাজ্যলাভ।

১৪৩৭ আলাউদ্দীন বহমনীর কোঙ্কণে অধিকার প্রতিষ্ঠা। খান্দেশে নাসিরের মৃত্যু ও মীরণ আলীর রাজ্যলাভ। বাংলায় সামসুদ্দীন আহমদের মৃত্যু ও ইলিয়াস শাহী বংশের নাসিরুদ্দীন মাহমুদের রাজ্যলাভ।

১৪৩৮ গুজরাতের প্রথম আহমদের মালব আক্রমণ। রণমল্ল নিহত ও মারবারে যোধার রাজ্যলাভ।

১৪৪০ মালবের প্রথম মাহমুদের দিল্লী অভিযান ও মধ্যপথে প্রত্যাবর্তন। জৌনপুরে ইব্রাহিম শার্কির মৃত্যু ও মাহমুদের রাজ্যলাভ।

১৪৪৩ মালবের প্রথম মাহমুদের চিতোর আক্রমণ ও কুম্ভের নিকট পরাজয়। গুজরাতে দ্বিতীয় মুহম্মদ শাহের রাজ্যলাভ। মুলতানের শসেকরূপে শেখ

ইউসুফ জাকেরিয়া। দ্বিতীয় দেবরায়ের বহমনী রাজ্য আক্রমণ।

১৪৪৪ মালবের মাহমুদ বনাম জৌনপুরের মাহমুদ। রায় সরহ্, মুলতানের রাজা।

১৪৪৫ সৈয়দ মুহম্মদ শাহের মৃত্যু ও আলম শাহের সুলতানী।

১৪৪৬ দ্বিতীয় দেবরায়ের মৃত্যু। বিজনগরের সিংহাসনে বিজয় রায় ও মল্লিকার্জুন। চাকনে দক্ষিনীদের হাতে পরদেশীরা বিধ্বস্ত।

১৪৫০ মালবের মামুদের গুজরাত অভিযান। কপিলেন্দ্র কর্তৃক কোণ্ডবিড়ু দখল।

১৪৫১ সৈয়দ সুলতান আলম শাহের অপসারণ। বুহ্‌লুল লোদী দিল্লীর সুলতান। গুজরাতে দ্বিতীয় মুহম্মদের মৃত্যু ও কুতবুদ্দীনের রাজ্যলাভ।

১৪৫২ জৌনপুরের মাহমুদ শাহের দিল্লী আক্রমণ ও বুহ্‌লুলের নিকট পরাজয়।

১৪৫৩ কুম্ভের নিকট গুজরাত ও মালব পরাজিত। কুম্ভ কর্তৃক নাগৌর দখল।

১৪৫৭ জৌনপুরের মাহমুদের মৃত্যু মুহম্মদের রাজ্যলাভ। খান্দেশে মীরন মুবারকের মৃত্যু ও দ্বিতীয় আদিল খানের রাজ্যলাভ। কুম্ভের নিকট মালব ও গুজরাতের যুগ্মবাহিনী পরাজিত।

১৪৫৮ জৌনপুরের মুহম্মদের মৃত্যু ও হুসেন শাহের রাজ্যলাভ। গুজরাতে কুতবুদ্দীনের মৃত্যু ও দাউদ এবং পরে মাহমুদ বেগরহের ক্ষমতালাভ। উড়িষ্যা কর্তৃক বহমনীদের নিকট থেকে বরঙ্গল উদ্ধার। আহমদ বহমনীর মৃত্যু এবং হুমায়ুন বহমনীর রাজ্যলাভ।

১৪৫৯ যোধা কর্তৃক যোধপুরের পত্তন। বাংলায় নাসিরুদ্দীনের মৃত্যু ও রুকমুদ্দীন বারবকের রাজ্যলাভ।

১৪৬১ হুমায়ুন বহমনীর মৃত্যু ও নিজামশাহের রাজ্যলাভ। মালবের মাহমুদ কর্তৃক বহমনীরাজ্য আক্রমণ। সিন্ধুতে জাম নন্দার রাজ্যলাভ। কপিলেন্দ্র কর্তৃক বহমনী রাজ্য আক্রমণ।

১৪৬২ গুজরাতের মাহমুদ বেগরহের হুমকিতে মালবের মাহমুদ বহমনী রাজ্য আক্রমণ থেকে প্রতিনিবৃত্ত।

১৪৬৩ নিজাম শাহ বহমনীর মৃত্যু ও তৃতীয় মুহম্মদের রাজ্যলাভ। উড়িষ্যার হম্বীরের বিজয়নগর আক্রমণ।

১৪৬৫ মল্লিকার্জুনের মৃত্যু এবং দ্বিতীয় বিরূপাক্ষের রাজ্যলাভ।

১৪৬৬ তৃতীয় মুহম্মদ বহমনীর সঙ্গে মালবের মাহমুদের সন্ধি।

১৪৬৮ রাণা কুম্ভ নিহত, উদয়ের রাজ্যলাভ।

১৪৬৯ মালবের প্রথম মামুদের মৃত্যু, গিয়াসুদ্দীনের রাজ্যলাভ। মাহমুদ বেগরহের জুনাগড় দখল। সালুব নরসিংহের উড়িষ্যা অভিযান।

১৪৭০ জৈনুল আবেদিনের মৃত্যু ও কাশ্মীরে হায়দর শাহের রাজ্যলাভ। বহমনী-গণ কর্তৃক বিজয়নগর আক্রমণ ও গোয়া দখল। সালুব নরসিংহের উদয়গিরি দখল।

১৪৭২ কাশ্মীরে হায়দার শাহের মৃত্যু ও হাসান শাহের রাজ্যলাভ। গুজরাতের মাহমুদ বেগরহের সিন্ধু আক্রমণ।

১৪৭৩ বুহলুল কর্তৃক জৌনপুরের হুসেন শাহ পরাজিত। মেবারে উদয়ের পতন ও রায়মল্লের রাজ্যলাভ।

১৪৭৪ বাংলায় রুকনুদ্দীন বারবকের মৃত্যু ও সামসুদ্দীন ইউসুফের রাজ্যলাভ।

১৪৭৮ বুদায়ুনে সৈয়দ আলমঙ্কু শাহের মৃত্যু।

১৪৭৯ বুহলুল কর্তৃক হুসেন শাহ পরাজিত ও জৌনপুর দিল্লীর দখলে।

১৪৮০ মামমুদ গওয়ানের বিরুদ্ধে চক্রান্ত। সালুব নরসিংহ কর্তৃক জৌনপুর অধিকার।

১৪৮১ বঙ্গদেশে ইউসুফের মৃত্যু, সিকন্দর ও তারপর জালালুদ্দীন ফত শাহের রাজ্যলাভ। মাহমুদ গওয়ান নিহত।

১৪৮৪ মাহমুদ বেগরহ কর্তৃক চাম্পানের দখল। কাশ্মীরে হাসনের মৃত্যু ও মুহম্মদের রাজ্যলাভ।

১৪৮৫ বিজয়নগরে দ্বিতীয় বিরূপাক্ষের মৃত্যু, পৌঢ় দেবরায়ের রাজ্যলাভ, সঙ্গম বংশের অবসান। সালুব নরসিংহের রাজ্যলাভ।

১৪৮৬ ফথ খান কর্তৃক কাশ্মীরের সিংহাসন দখল।

১৪৮৭ বাংলায় ফথ শাহ নিহত, হাবসী বারবকের ক্ষমতালাভ ও মৃত্যু, সৈফুদ্দীন ফিরুজের ক্ষমতালাভ।

১৪৮৮ মারবারে যোধার মৃত্যু ও সাতলের রাজ্যলাভ।

১৪৮৯ বুহলুল লোদীর মৃত্যু ও সিকন্দরের রাজ্যলাভ।

১৪৯০ সালুব নরসিংহের মৃত্যু ও বিজয়নগরে তিম্মের রাজ্যলাভ, নরস নায়ক প্রতিনিধি। বাংলায় ফিরুজের মৃত্যু ও নাসিরুদ্দীন মাহমুদের রাজ্যলাভ। আহমদনগর, বেরার ও বিজাপুরের স্বাধীনতা ঘোষণা।

১৪৯১ কোঙ্কনে বাহাদুর গিলানীর বিদ্রোহ। মারবারে সাতলের মৃত্যু ও সুজার রাজ্যলাভ। বাংলায় সিদি বদর কর্তৃক নাসিরুদ্দীনকে হত্যা ও সামসুদ্দীন মুহম্মদ শাহ নাম নিয়ে রাজ্য গ্রহণ।

১৪৯৩ সিদীবদর নিহত। বাংলায় হাবসী শাসনের অবসান ও আলাউদ্দীন হুসেন শাহের রাজ্যলাভ।

১৪৯৪ সিকন্দর লোদী কর্তৃক জৌনপুরের হুসেন পরাজিত। কোঙ্কনে বাহাদুর গিলানী নিহত।

১৪৯৫ সিকন্দর লোদীর বঙ্গ অভিযান। কাশ্মীরের সিংহাসনে মুহম্মদের পুনরাধিকার।

১৪৯৬ ফথ খান কর্তৃক কাশ্মীরের সিংহাসন দখল।

১৪৯৭ উড়িষ্যায় পুরুষোত্তমের মৃত্যু ও প্রতাপরুদ্রের রাজ্যলাভ।

১৪৯৮ ভাস্কো-ডা-গামার কালিকটে আগমন। মাহমুদ বেগরহের খান্দেশ আক্রমণ।

সিকন্দর লোদী কর্তৃক সম্ভলে রাজধানী স্থানান্তর। হুসেনশাহের আসাম আক্রমণ।

১৫০০ কেব্রালের নেতৃত্বে পর্তুগীজ নৌবাহিনীর কালিকটে উপস্থিতি। মালবে গিয়াসুদ্দীনের রাজ্যত্যাগ ও নাসিরুদ্দীনের রাজ্যলাভ।

১৫০২ মুলতানে প্রথম হুসেনের মৃত্যু ও মাহমুদের রাজ্যলাভ। সিকন্দর লোদীর গোয়ালিয়র অভিযান। মাহমুদ শাহ বাহমনী কর্তৃক রায়চুর দখল। ভারতে ভাস্কো-ডা-গামার দ্বিতীয় অভিযান।

১৫০৩ খান্দেশে আদিল খানের মৃত্যু ও দায়ুদের রাজ্যলাভ। বিজয়নগরে নরসনায়কের মৃত্যু ও বীর নরসিংহের ক্ষমতালাভ।

১৫০৫ সিকন্দর লোদী কর্তৃক ধোলপুর অধিকার। বীর নরসিংহ কর্তৃক ইম্মদী নরসিংহকে হত্যা ও বিজয় নগরের সিংহাসন লাভ। পর্তুগীজ আলমেদিয়ার ভারতে আগমন।

১৫০৮ গুজরাত ও মিশরের সম্মিলিত বাহিনীর নিকট চাউলের যুদ্ধে ডন্ লরেঞ্জো পরাজিত ও নিহত। কপিলেন্দ্রের বঙ্গদেশ আক্রমণ।

১৫০৯ দিউয়ের নিকট আলমিদা কর্তৃক গুজরাত ও মিশরীয় নৌবাহিনী

পরাজিত। আলবুকার্ক পর্তুগীজ অধিনায়ক নিযুক্ত। বীর নরসিংহের মৃত্যু ও কৃষ্ণদেব রায়ের রাজ্যলাভ। তৎকর্তৃক বহমনীগন পরাজিত। রায়মল্লের মৃত্যু ও মেবারের সংগ্রাম সিংহের রাজ্যলাভ।

১৫১০ খান্দেশে ৩য় আদিলখানের রাজ্যলাভ। আলবুকার্ক কর্তৃক কালিকট লুণ্ঠন ও গোয়া অধিকার।

১৫১১ গুজরাতে মাহমুদ বেগহরহের মৃত্যু ও দ্বিতীয় মুজফ্‌ফরের রাজ্যলাভ। আলবুকার্ক কর্তৃক কালিকটে পর্তুগীজ কুঠি স্থাপন ও মলাক্কা অধিকার। মালবে নাসিরুদ্দিনের মৃত্যু ও ২য় মাহমুদের রাজ্যলাভ।

১৫১২ মালবে আমীরদের বিদ্রোহ। কৃষ্ণদেবরায়ের রায়চুর দখল।

১৫১৩ সিকন্দর লোদীর মালব অভিযান। হুসেন শাহের আরাকান অভিযান। কৃষ্ণদেবরায়ের উদয়গিরি দখল। অহোম চুতিয়া যুদ্ধের সূত্রপাত।

১৫১৫ ঈদারে ভীমসিংহের মৃত্যু। মারবারে সুজার মৃত্যু ও গঙ্গার রাজ্যলাভ।

১৫১৭ সিকন্দর লোদীর মৃত্যু। ইব্রাহিম লোদীর রাজ্যলাভ ও জালালখানের বিদ্রোহ। মালবের ২য় মাহমুদের পলায়ন এবং গুজরাতের ২য় মুজফ্‌ফরের আশ্রয়লাভ।

১৫১৮ গুজরাতের ২য় মুজফ্‌ফর কর্তৃক মাণ্ডু অধিকার। মাহমুদ বহমনীর মৃত্যু ইব্রাহিম লোদীর গোয়ালিয়র অধিকার। সংগ্রামসিংহের নিকট ইব্রাহিম লোদী পরাজিত।

১৫১৯ সংগ্রাম সিংহ কর্তৃক গুজরাত ও মালবের সম্মিলিত বাহিনী পরাজিত। বঙ্গদেশে হুসেনশাহের মৃত্যু এবং নুসরৎ শাহের রাজ্যলাভ।

১৫২০ খান্দেশে ৩য় আদিলের মৃত্যু এবং মীরন মাহমুদের রাজ্যলাভ। কৃষ্ণদেবরায় কর্তৃক বিজাপুর বাহিনী পরাজিত। সংগ্রামসিংহ কর্তৃক গুজরাত বাহিনী পরাজিত। শাহবেগ আরঘুন কর্তৃক সিন্ধু অধিকার।

১৫২৩ অহোম-চুতিয়া যুদ্ধাবসান।

১৫২৪ বাবুর কর্তৃক মুলতান দখল।

১৫২৫ আরঘুন কর্তৃক মুলতান দখল।

১৫২৬ পানিপথের ১ম যুদ্ধ। ইব্রাহিম লোদীর পরাজয় ও মৃত্যু। দিল্লীর সিংহাসনে বাবুর। গুজরাতে ২য় মুজফ্‌ফরের মৃত্যু ও সিকন্দরের রাজ্যলাভ।

১৫২৭ খানুয়ার যুদ্ধ, সংগ্রামসিংহের পরাজয়। বাবুরের আলোয়ার অভিযান, মেওয়ার দখল। মুঘল শিবিরে শের শাহের যোগদান।

১৫২৮ বাবুরের চান্দেরী দখল, আফগানদের বিরুদ্ধে পূর্বদিকে অভিযান। শের শাহের জায়গীর প্রাপ্তি। সুলতান মুহম্মদের মৃত্যু ও জালালের রাজ্যলাভ। খান্দেশ, বেরার ও গুজরাতের সমবেতভাবে দৌলতাবাদ অধিকারে ব্যর্থতা। নুনো দা কুনহা পোর্তুগীজ অধিকৃত এলাকার শাসক।

১৫২৯ গোগরার যুদ্ধ। জালাল বাবুরের সামন্ত। জালালের নায়েব পদে শের শাহের নিযুক্তি। গুজরাতের সুলতান বাহাদুরের সঙ্গে বেরার ও আহমদ-নগরের সুলতানদের সন্ধি।

১৫৩০ বাবুরের মৃত্যু ও হুমায়ুনের রাজ্যলাভ। শের শাহ চুনার দুর্গের মালিক। কাশ্মীরের সিংহাসনে মুহম্মদ শাহ চতুর্থ ও শেষবার। ইসমাইল আদিল কর্তৃক রায়চুর ও মুদগল অধিকার ও আমীর বারিদকে বিদরের অধিকার লাভে সহায়তা। দরিয়া ইমাদ-শাহ বেরারের সুলতান। অচ্যুত দেবরায় বিজয়নগরে রাজা।

১৫৩১ পোর্তুগীজগণ কর্তৃক দিউ ও গুজরাতে গোলাবর্ষণ। গুজরাতের সুলতান বাহাদুরের মাণ্ডু অধিকার। দদরার যুদ্ধে হুমায়ুনের নিকট সুলতান মাহমুদের নেতৃত্বাধীন আফগান বাহিনী পরাজিত। হুমায়ুনের চুনার অভিযান ও শের শাহকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্যকরণ। রুদ্রপ্রতাপ কর্তৃক বুন্দেলখণ্ডে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন। বিদর ও বিজাপুরের মধ্যে সংঘর্ষ। বাংলার সুলতান নুসরৎ শাহের গুজরাতে দূত প্রেরণ। বিক্রমাদিত্য মেবারের রানা।

১৫৩২ গুজরাতের বাহাদুর শাহ কর্তৃক রাইসেন, চান্দেরী, ভিলসা ও রণথম্ভোর অধিকার। মীর্জা সিকন্দর কর্তৃক কাশ্মীর অভিযান।

১৫৩৩ বাহাদুর শাহ কর্তৃক চিতোর অবরোধ। বিহারে শের শাহের ক্ষমতাবৃদ্ধি।

১৫৩৪ হুমায়ুনের বিরুদ্ধে তাঁর ভ্রাতৃদ্বয় জামান মীর্জা ও সুলতান মীর্জার বিদ্রোহ, পরাজয় ও বন্দীত্ব। বাহাদুর শাহ কর্তৃক দ্বিতীয়বার চিতোর অবরোধ ও হুমায়ুনের সঙ্গে চুক্তিভঙ্গ। বাহাদুরের সঙ্গে পোর্তুগীজদের সন্ধি। শের শাহ কর্তৃক সুরজগড়ের যুদ্ধ জয়। বিজাপুরের ইসমাইল আদিল শাহের মৃত্যু ও মল্লু আদিলের রাজ্যলাভ।

১৫৩৫ গুজরাতের বাহাদুর শাহের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য হুমায়ুনের আগ্রা ত্যাগ। বাহাদুরের মাণ্ডুতে পলায়ন ও মান্দাসোরে হুমায়ুনের সঙ্গে যুদ্ধ। হুমায়ুনের চিতোর অধিকার। ইখতিয়ার খান কর্তৃক হুমায়ুনকে চাম্পানের দুর্গ সমর্পণ। গুজরাতের সঙ্গে পোর্তুগীজদের সন্ধি চুক্তি। বাহাদুরের অনুকূলে গুজরাতের সামন্তদের হুমায়ুনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও মুঘলবাহিনী নবসারী, ব্রোচ, সুরাট, ক্যাম্বে ও পাটন থেকে বিতাড়িত। শের শাহ কর্তৃক ভাগলপুর পর্যন্ত দখল। গুজরাতের বাহাদুর কর্তৃক চিতোর অধিকার। পোর্তুগীজগণ কর্তৃক দিউ দখল।

১৫৩৬ মুঘল শাসক তর্দী বেগের গুজরাত ত্যাগ, বাহাদুর পুনরায় প্রতিষ্ঠিত। বনবীর কর্তৃক মেবারের রাণা বিক্রমাদিত্য নিহত।

১৫৩৭ দিউতে গুজরাতের বাহাদুর শাহের মৃত্যু। হুমায়ুনের চুনার অভিযান। শের শাহের গৌড় অবরোধ। পোর্তুগীজদের হুগলীতে সনদ লাভ। কাশ্মীরে মুহম্মদ শাহের মৃত্যু ও সামসুদ্দীনের রাজ্যলাভ।

১৫৩৮ হুমায়ুনের চুনার অধিকার। তেলিয়াঘেরির যুদ্ধে শের শাহের জয়লাভ। হুমায়ুনের বঙ্গবিজয়। তুর্কী ও গুজরাতী নৌবাহিনী দিউ অধিকারে ব্যর্থ। শেষ বহমনী সুলতান কলিমুল্লার মৃত্যু।

১৫৩৯ বঙ্গদেশ থেকে হুমায়ুনের প্রত্যাবর্তন, চৌসার যুদ্ধে পরাজয়, গৌড়ে শের শাহের রাজ্যাভিষেক।

১৫৪০ বিল্বগ্রামের যুদ্ধে শের শাহের নিকট হুমায়ুন পরাস্ত। হুমায়ুনের লাহোরে পলায়ন। মীর্জা হায়দরের কাশ্মীর জয়। বনবীরের চিতোর অধিকার।

১৫৪১ সিন্ধুর রোহরি ও সেহওয়ানে হুমায়ুন।

১৫৪২ হুমায়ুনের বিকানীরে যাত্রা। আকবরের জন্ম। শের শাহের মালব অধিকার। বিদরে আলি বারিদের স্বাধীন সুলতানী।

১৫৪৩ শের শাহের চান্দেরী অভিযান, রায়সেন দখল। কান্দাহারের পথে হুমায়ুন। গোলকুণ্ডায় কুলি-কুতব নিহত। শের শাহের মারবার আক্রমণ ও উত্তর সিন্ধু জয়। বিজয়পুরের বিরুদ্ধে আহ্মদনগর, বেরার, গোলকুণ্ডা ও বিজয়নগরের জোট।

১৫৪৪ হুমায়ুনের সঙ্গে পারস্যের শাহ তাহমাস্পের সাক্ষাৎ। শের শাহের চিতোর দখল ও কালঞ্জর অভিযান।

১৫৪৫	হুমায়ুনের কান্দাহার অধিকার ও কাবুলে প্রত্যাবর্তন। শের শাহের মৃত্যু। কাশ্মীরে মীর্জা হায়দরের মুঘল প্রভুত্ব স্বীকার।
১৫৪৬	হুমায়ুনের বাদকশান অভিযান। দিউতে পোর্তুগীজদের নিকট গুজরাত পরাজিত।
১৫৪৭	হুমায়ুনের নিকট মীর্জা কামরান পরাজিত। বিজয়নগরের রামরায়ের সঙ্গে পোর্তুগীজদের বাণিজ্যিক চুক্তি।
১৫৪৮	কামরান কর্তৃক হুমায়ুনকে তালিকান দুর্গ সমর্পণ। বিজাপুরের ইব্রাহিম আদিলের সঙ্গে পোর্তুগীজদের সন্ধি।
১৫৪৯	বালখ্‌ ও উজবেগদের বিরুদ্ধে হুমায়ুনের যুদ্ধ।
১৫৫০	হুমায়ুনের কাবুল অধিকার। ইব্রাহিম কুতব গোলকুণ্ডার সুলতান। কাশ্মীরে মীর্জা হায়দরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।
১৫৫৩	হুমায়ুন কর্তৃক কামরানের চক্ষু উৎপাটন। আহমদনগর ও বিজয়নগর কর্তৃক বিজাপুর আক্রান্ত।
১৫৫৪	ইসলাম শাহ শূরের মৃত্যু। দিল্লী অভিযানকল্পে হুমায়ুনের আফগানিস্তান ত্যাগ ও বৈরাম খানের সাহায্যলাভ। গুজরাতের সুলতান তৃতীয় মাহমুদের মৃত্যু।
১৫৫৫	হুমায়ুনের লাহোর অধিকার, মাছিওয়ারা ও সিরহিন্দের যুদ্ধে বিজয়লাভ ও দিল্লী দখল।
১৫৫৬	হুমায়ুনের মৃত্যু, আকবরের রাজ্যলাভ। হিমু কর্তৃক আগ্রা ও দিল্লী দখল। পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ। বৈরাম কর্তৃক কাশ্মীরে অভিযান প্রেরণ।
১৫৫৭	মুঘলদের নিকট সিকন্দর শূরের মানকোট সমর্পণ। মীর্জা কামরানের মৃত্যু। খিজির খান শূরের নিকট আদিল শাহ শূরের পরাজয়। কাশ্মীরে ইসমাইলের মৃত্যু। বিজাপুরে ইব্রাহিম আদিল শাহের মৃত্যু। গোলকুণ্ডা ও আহমদনগরের গুলবর্গা আক্রমণ ও রামরায়ের হস্তক্ষেপে সন্ধি।
১৫৫৮	পারস্য কর্তৃক কান্দাহার অধিকার। বিজাপুরের সঙ্গে বিজয়নগরের সন্ধি। রামরায়ের সঙ্গে পোর্তুগীজদের যুদ্ধ।
১৫৬০	বৈরাম খানের বিদ্রোহ। কাশ্মীরে মুঘল বাহিনীর পরাজয়।
১৫৬১	বৈরাম খান নিহত। মালবের বাজবাহাদুর আকবরের নিকট পরাজিত।

গুজরাতের সুলতান তৃতীয় আহমদ নিহত। মুঘলগণ কর্তৃক আফগান বিদ্রোহ দমন। দৌলত চক কর্তৃক হবিবকে কাশ্মীরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা।

১৫৬২ আকবর কর্তৃক মাহম আনাঘা গোষ্ঠীর পতন। শাহ তহমাস্প কর্তৃক আকবরের নিকট দূত প্রেরণ। বেরারের দরিয়া ইমাদ শাহের মৃত্যু। আকবর কর্তৃক মালবের বিরুদ্ধে আবদুল্লাকে প্রেরণ।

১৫৬৩ আকবর কর্তৃক তীর্থকর রহিত। হুসেন খান কর্তৃক কাশ্মীরে ক্ষমতা দখল।

১৫৬৪ বিজয়নগরের বিরুদ্ধে দক্ষিণী সুলতানদের জোট। আকবর কর্তৃক জিজিয়া কর রহিত।

১৫৬৫ তালিকোটার যুদ্ধ। বঙ্গদেশে সুলেমান কররানীর সুলতানী।

১৫৬৬ আকবরের পাঞ্জাব অভিযান।

১৫৬৭ মীর্জাদের বিরুদ্ধে আকবরের অভিযান। আকবরের চিতোর অভিযান, উজবেক বিদ্রোহ দমন। সীজার ফ্রেডরিকের বিজয়নগর ভ্রমণ।

১৫৬৮ চিতোরের পতন।

১৫৬৯ বুন্দির সুর্জনের রণথম্ভোর সমর্পণ।

১৫৭০ পোর্তুগীজদের বিরুদ্ধে বিজাপুর, আহমদনগর ও কালিকটের ব্যর্থতা। আকবরের নিকট বাজবাহাদুরের কর্মগ্রহণ। পেনুগোণ্ডাতে তিরুমলের রাজ্যাভিষেক।

১৫৭২ মেবারের রাণা উদয়সিংহের মৃত্যু ও প্রতাপসিংহের রাজ্যলাভ। আকবরের গুজরাত অভিযান। গুজরাতের তৃতীয় মুজফ্‌ফর কর্তৃক আকবরের বশ্যতা স্বীকার। বাংলায় সুলেমান কররানী ও বায়জিদের মৃত্যু ও দাউদের রাজ্যলাভ। শ্রীরঙ্গ বিজয়নগরের রাজা। পাটনে মুঘল বাহিনীর জয়লাভ।

১৫৭৩ আকবরের নিকট সুরাটের বশ্যতা। গুজরাতে আকবরের বিদ্রোহ দমন, খান্দেশ ও আহমদনগরে দূত প্রেরণ, শাসনতান্ত্রিক সংস্কার।

১৫৭৪ আকবরের বিরুদ্ধে যোধপুরের বিদ্রোহ। দাউদের বিরুদ্ধে আকবরের যুদ্ধাভিযান। আহমদনগর কর্তৃক বেরার অধিকার।

১৫৭৫ মুঘলদের নিকট দাউদ পরাজিত। ইবাদৎখানা স্থাপন।

১৫৭৬ হলদিঘাটের যুদ্ধ ও প্রতাপসিংহের পরাজয়। বাংলায় দাউদ পুনরায় পরাজিত ও নিহত। প্রতাপের বিরুদ্ধে আকবরের যুদ্ধযাত্রা। বিজয়নগর কর্তৃক বিজাপুর পরাজিত।

১৫৭৭ খান্দেশের বিরুদ্ধে আকবরের অভিযান প্রেরণ। আকবর সকাশে আহমদনগর ও উজবেগ শাসকের দূত।

১৫৭৮ আকবরের কুম্ভলগড় অধিকার। প্রতাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। আকবরের রাজসভায় আন্তোনিও কাব্রাল পোর্তুগীজ দূত। আকবরের নিকট বুন্দেল মধুকর শাহের বশ্যতা স্বীকার।

১৫৮০ কাশ্মীরে ইউসুফ শাহের পুনরায় ক্ষমতালাভ। মীর্জা হাকিম কর্তৃক পাঞ্জাবের মুঘল এলাকায় হাঙ্গামা। বাংলায় বিদ্রোহ। বিজাপুরে আলি আদিল শাহ নিহত।

১৫৮১ মানসিংহ কর্তৃক লাহোরে মীর্জা হাকিম প্রতিহত। আকবরের কাবুল গমন।

১৫৮২ খান আজম বাংলায় মুঘল শাসক নিযুক্ত। আকবরের দীন-ই-ইলাহী মতের প্রবর্তন।

১৫৮৩ আকবরের রাজসভায় জেসুইট প্রতিনিধি। খান আজম কর্তৃক তেলিয়াগরহী দখল। গুজরাতে তৃতীয় মুজফ্‌ফরের বিদ্রোহ ও আমেদাবাদ দখল। বাংলায় মাসুম খান কাবুলীর বিদ্রোহ দমন।

১৫৮৪ গুজরাতে তৃতীয় মুজফ্‌ফর পরাজিত। বুখারার আহমদ খান উজবেগ কর্তৃক বাদকশান দখল। প্রতাপ সিংহ কর্তৃক হারানো এলাকা পুনরুদ্ধার।

১৫৮৫ কাশ্মীরে মুঘল বাহিনী প্রেরিত। কাবুল মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। আকবরের সভায় ইংলণ্ডের দৌত্য। বেরারে মুঘল অভিযান।

১৫৮৬ আকবরের কাশ্মীর অভিযান। মুঘলদের শেহওয়ান অবরোধ। সিন্ধুর জানি বেগের মুঘল বশ্যতা স্বীকার ও পরে স্বাধীনতা ঘোষণা। বেরারে মুঘল অভিযান ব্যর্থ। বিজয়নগরের শাসক দ্বিতীয় বেঙ্কট।

১৫৮৭ মানসিংহ বিহারে বদলি। বাংলায় বিদ্রোহ দমন।

১৫৮৮ আহমদনগরে হুসেন সুলতান। সোয়াট ও বাজৌরে মুঘল অভিযান।

১৫৮৯ আকবরের প্রথম কাশ্মীর যাত্রা। ভগবান দাস ও তোডরমলের মৃত্যু।

১৫৯০ মুঘলগণ কর্তৃক উত্তর উড়িষ্যায় আফগানদের দমন।

১৫৯১ আহমদনগরে দ্বিতীয় বুরহান নিজাম শাহ সুলতান। খান্দেশ, আহমদনগর, বিজাপুর ও গোলকুণ্ডায় আকবরের দূত প্রেরণ। রাজকুমার সলিম কর্তৃক ক্ষমতা দখলের চেষ্টা। দ্বিতীয় জেস্যুইট মিশন। পারস্যের শাহ আব্বাস কর্তৃক মুঘল দরবারে দূত প্রেরণ। আহমদনগরের নিকট বিজাপুরের পরাজয়।

১৫৯২ উড়িষ্যার বেনাপুরে আফগানদের পরাজয়। কাশ্মীরে বিদ্রোহ।

১৫৯৩ উড়িষ্যায় মুঘল অধিকার। উত্তর পশ্চিম সীমান্তের বিদ্রোহ দমিত। গুজরাতের তৃতীয় মুজফ্‌ফর মুঘলহস্তে ধৃত ও নিহত। দক্ষিণের সুলতান-গণ কর্তৃক মুঘল বশ্যতা স্বীকারে অস্বীকৃতি।

১৫৯৫ আকবরের কান্দাহার জয়। মুঘলগণ কর্তৃক আহমদনগর অবরোধ। বালুচিস্তান, কচ্ছ ও মাকরানে মুঘল অধিকার।

১৫৯৬ আহমদনগরের চাঁদ সুলতান কর্তৃক মুঘলদের সঙ্গে সন্ধি। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে মুঘলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

১৫৯৭ প্রতাপসিংহের মৃত্যু। আস্‌তির যুদ্ধে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার বিরুদ্ধে মুঘলদের জয়।

১৫৯৮ বেরারে মুঘলদের কয়েকটি দুর্গ জয়।

১৫৯৯ রাজকুমার মুরাদের মৃত্যু। বুরহানপুরে আবুল ফজল। আকবরের দাক্ষিণাত্য অভিযান। বাংলাদেশে উসমান খানের বিদ্রোহ।

১৬০০ আকবরের গোয়ায় দূত প্রেরণ। মুঘলগণ কর্তৃক আহমদনগর অধিকার। চাঁদ সুলতান নিহত। আগ্রা দখলে সলিমের ব্যর্থ চেষ্টা। মালিক অম্বর কর্তৃক দ্বিতীয় মুর্তাজাকে আহমদনগরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা।

১৬০১ সলিমের বিদ্রোহ। দাক্ষিণাত্য থেকে আকবরের প্রত্যাবর্তন। মুঘলদের আসীরগড় বিজয়।

১৬০২ আবুল ফজল নিহত।

১৬০৩ রাজকুমার দানিয়েলের মৃত্যু। সলিমের সঙ্গে আকবরের বোঝাপড়া।

১৬০৫ আকবরের মৃত্যু, সলিম বা জাহাঙ্গীর আগ্রায় মুঘল সম্রাট।

১৬০৬ শিখগুরু অর্জুনের মৃত্যু। কুতবুদ্দীন বাংলায় মুঘল শাসক।

১৬০৭ জাহাঙ্গীরের গোয়ায় দূত প্রেরণ।

১৬০৮ মহাবৎ খানের নেতৃত্বে মেবারে ব্যর্থ মুঘল অভিযান। খান খানানকে দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ। মুঘল দরবারে হকিন্সের সুরাটে কুঠি স্থাপনে অনুমতি প্রার্থনা।

১৬০৯ কোচবিহার মুঘলদের সামন্তরাজ্যে পরিণত। রাজকুমার পরভিজ খান্দেশ ও বেরারে মুঘল শাসক।

১৬১০ আলবুকার্কের গোয়া দখল। পুলিকটে ডাচ কুঠি। জাহাঙ্গীরের গোয়ায় দূত প্রেরণ।

১৬১১ বোম্বাই-এ ইংরাজ নৌবাহিনীর নিকট পোর্তুগীজরা পরাস্ত। মসুলিপতমে ইংরাজ কুঠি। সুরাটে ইংরাজদের বাণিজ্যে অনুমতিলাভ। আবদুল্লা খান গুজরাতে মুঘল শাসক নিযুক্ত।

১৬১২ নূরজাহানের প্রভাব বৃদ্ধি। বাংলার আফগান শক্তি দমিত। মুমতাজের সঙ্গে খুররমের বিবাহ। শিখ গুরু হরগোবিন্দ জাহাঙ্গীর কর্তৃক মুক্ত। গুজরাতের মুঘল শাসক আবদুল্লার ব্যর্থ আহমদনগর অভিযান। সুরাটে ইংরাজদের বাণিজ্যকুঠি।

১৬১৩ মুঘলদের কামরূপ অধিকার। সুরাটের নিকট মুঘল হস্তে পোর্তুগীজ নৌবাহিনীর পরাজয়।

১৬১৪ মুঘলদের সঙ্গে মহারাণা অমরসিংহের সন্ধি। ডাচদের জন্য পুলিকটে ইংরাজদের অবতরণ ব্যাহত। জাহাঙ্গীরের কাংরা অভিযান। আসামে ব্যর্থ মুঘল অভিযান।

১৬১৬ মুঘলদের নিকট আহমদনগরের মালিক অম্বর পরাজিত। জামোরিনের সঙ্গে ইংরাজদের বাণিজ্য সম্পর্ক।

১৬১৭ খুররমের দাক্ষিণাত্যে উপস্থিতি। নবনগর ও বহরের শাসকদের মুঘল অধীনতা স্বীকার।

১৬১৮ মুঘল দরবারে টমাস রোর দৌত্য।

১৬১৯ বিদরে বিজাপুরের অধিকার প্রতিষ্ঠা।

১৬২০ অমর সিংহের মৃত্যু। মালিক অম্বরের দাক্ষিণাত্যে সাফল্য।

১৬২২ রাজকুমার খুসরব নিহত। কান্দাহার পারসিক দখলে।

১৬২৩ খুররমের বিদ্রোহ।

১৬২৪ মালিক অম্বরের নিকট মুঘলদের পরাজয়।

১৬২৬ মালিক অম্বরের মৃত্যু। বোম্বাই-এ ইংরাজ-ডাচ প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

১৬২৭ শিবাজীর জন্ম। জাহাঙ্গীরের মৃত্যু। ওর্চার সিংহাসনে জুহার সিংহ।

১৬২৮ শাহজাহান মুঘল সম্রাট। মেবারের মহারাণা কর্ণ সিংহের মৃত্যু। ডাচ ও ইংরাজদের মসুলিপতম পরিত্যাগ।

১৬৩১ মুঘল সেনাপতি আসফখানের ব্যর্থ বিজাপুর অভিযান। মালিক অম্বরের পুত্র ফথ খানের মুঘল বশ্যতা স্বীকার।

১৬৩২ শাহজাহানের দাক্ষিণাত্য অভিযান। হুগলীতে পোর্তুগীজ শক্তি ধ্বংস।

১৬৩৩ উৎকোচের দ্বারা মুঘলদের দৌলতাবাদ দখল।

১৬৩৪ শিখ গুরু হরগোবিন্দ কর্তৃক মুঘল আক্রমণ প্রতিহত।

১৬৩৫ মুঘলদের ওর্চা ও গণ্ডবাল অধিকার।

১৬৩৬ শাহজাহান দৌলতাবাদে। মুঘলদের নিকট বিজাপুর পরাস্ত। শাহজাহানের মাণ্ডু অভিযান। দাক্ষিণাত্যের শাসকপদে ঔরঙ্গজেব। আহমদনগর সুলতানীর উৎখাত।

১৬৩৮ মুঘলদের সঙ্গে অহোমরাজ্যের সন্ধি।

১৬৩৯ শাহজাহান কর্তৃক বুন্দেল বিদ্রোহ দমন, কোচবিহারের সঙ্গে সন্ধি।

১৬৪৪ হরগোবিন্দের মৃত্যু। ঔরঙ্গজেব পদচ্যুত।

১৬৪৬ রাজকুমার মুরাদের নেতৃত্বে বালখ অভিযান।

১৬৪৮ কান্দাহারে পারসিক অভিযান। শাহজী ভোঁসলে বিজাপুরে বন্দী।

১৬৪৯ কান্দাহারে ব্যর্থ মুঘল অভিযান।

১৬৫১ হুগলীতে ইংরাজ কুঠি।

১৬৫২ কান্দাহারে মুঘল অভিযান পুনরায় ব্যর্থ।

১৬৫৩ কান্দাহারে পুনরায় মুঘল ব্যর্থতা। ঔরঙ্গজেব পুনরায় দাক্ষিণাত্যের সুবাদার। শিবাজীর স্বাধীন রাজ্য স্থাপন।

১৬৫৪ মুঘলদের নিকট কুমায়ুনের রাজার বশ্যতা স্বীকার।

১৬৫৬ ঔরঙ্গজেবের গোলকুণ্ডা অবরোধ। শিবাজীর জাবলী অধিকার।

১৬৫৭ মুঘলদের নিকট বিদর ও কল্যাণীর আত্মসমর্পণ। মেবারের রাণা রাজসিংহ কর্তৃক হৃত অঞ্চল উদ্ধার। শাহজাহান অশক্ত। ঔরঙ্গজেবের বিজাপুর আক্রমণ। শিবাজী কর্তৃক আহমদনগরের মুঘল এলাকায় হানা ও জুনার লুণ্ঠন। সুরাট ইংরাজদের প্রেসিডেন্সী।

১৬৫৮ সুলেমান শিকো কর্তৃক সুজা পরাস্ত। শাহজাহান ও দারার সেনাপতি যশোবন্ত সিংহের বিরুদ্ধে ধর্মাটের যুদ্ধে ঔরঙ্গজেবের জয়লাভ। সামোগড়ের যুদ্ধে ঔরঙ্গজেবের নিকট দারার পরাজয়। শাহজাহান ও রাজকুমার মুরাদ বন্দী। ঔরঙ্গজেব মুঘল সম্রাট। লাহোরে দারার পলায়ন। সুজা কর্তৃক খাজুয়া পর্যন্ত এলাকা অধিকার। অহোমগণ কর্তৃক পশ্চিম ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা দখল।

১৬৫৯ ঔরঙ্গজেবের নিকট সুজার পরাজয় ও পলায়ন। চম্পৎ রাইয়ের বিরুদ্ধে ঔরঙ্গজেবের শুভকরণ বুন্দেলাকে প্রেরণ। দেওরাই-এ ঔরঙ্গজেবের নিকট দারার পরাজয়। ঔরঙ্গজেবের দ্বিতীয় অভিষেক। ধর্মদ্রোহিতার অপরাধে দারার প্রাণদণ্ড। শিবাজীর হস্তে বিজাপুরের আফজল খান নিহত।

১৬৬০ বিজাপুর সেনাপতি সিদি জৌহর কর্তৃক শিবাজীকে পানহালা দুর্গ থেকে বিতাড়ন। দাক্ষিণাত্যের মুঘল শাসক শায়েস্তা খান কর্তৃক শিবাজীর বিরুদ্ধে অভিযান। মীরজুমলা বঙ্গদেশের মুঘল শাসক।

১৬৬১ আরাকানের মগ রাজা কর্তৃক সুজা নিহত। গোয়ালিয়রে মুরাদের প্রাণদণ্ড। ব্রাগাঞ্জার রাজকুমারী ক্যাথারিনের বিবাহ ও যৌতুক স্বরূপ বোম্বাই দ্বীপ লাভ।

১৬৬২ মীরজুমলার আসাম অভিযান ও অহোমরাজ জয়ধ্বজের পলায়ন। দারার পুত্র সুলেমান শিকো নিহত। কোচবিহারের মুঘল অধীনতা থেকে মুক্তি। স্যার এডওয়ার্ড উইণ্টার মাদ্রাজের ইংরাজ প্রেসিডেণ্ট। স্যার জর্জ অকসেনডেন সুরাটের ইংরাজ গভর্নর।

১৬৬৩ মীরজুমলার মৃত্যু। শিবাজী কর্তৃক পুনা দখল, শায়েস্তা খানের পলায়ন। বিজাপুর কর্তৃক ত্রিচিনোপলী লুণ্ঠন। শায়েস্তা খান বাংলার মুঘল সুবাদার।

১৬৬৪ শিবাজীর সুরাট লুণ্ঠন। জয়সিংহ ও দিলির খানের নেতৃত্বে শিবাজীর বিরুদ্ধে মুঘল অভিযান। শিবাজীর পিতা শাহজীর মৃত্যু।

১৬৬৫ ঔরঙ্গজেব কর্তৃক হিন্দুদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতমূলক আইনের প্রবর্তন। শিবাজীর সঙ্গে মুঘলদের পুরন্দরের সন্ধি। বিজাপুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে শিবাজী কর্তৃক মুঘলদের সহায়তা। মালাবার উপকূলে শিবাজীর নৌ-

অভিযান প্রেরণ। মুঘলগণ কর্তৃক পূর্ব বাংলার উপকূল থেকে ফিরিঙ্গীদের উৎখাত। বোম্বাইয়ে ইংরাজ বসতি। ফক্সক্রফট মাদ্রাজের ইংরাজ গভর্নর।

১৬৬৬ শাহজাহানের মৃত্যু। আগ্রায় শিবাজীর বন্দিত্ব ও পলায়ন।

১৬৬৭ উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে বিদ্রোহ। ঔরঙ্গজেবের সেনাপতি জয়সিংহের মৃত্যু।

১৬৬৮ ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে শিবাজীর সন্ধি ও শিবাজীর রাজা উপাধি লাভ।

১৬৬৯ গোকলার নেতৃত্বে ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে জাঠদের বিদ্রোহ।

১৬৭০ শিবাজীর সিংহগড় দখল, মুঘল শহরগুলিতে লুণ্ঠন ও দ্বিতীয়বার সুরাট লুণ্ঠন। উইলিয়ম ল্যাঙ্গহোর্ন মাদ্রাজের ইংরাজ গভর্নর।

১৬৭১ মুঘলদের নিকট থেকে শিবাজীর সালহের অধিকার।

১৬৭২ ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে শতনামী বিদ্রোহ।

১৬৭৩ শিবাজীর পান্‌হালা দখল।

১৬৭৪ রায়গড়ে শিবাজীর অভিষেক। মেবারের রাণা রাজসিংহ কর্তৃক দেওবারি গিরিপথ রোধ।

১৬৭৫ শিখ গুরু তেগ বাহাদুরের প্রাণদণ্ড।

১৬৭৭ গোলকুণ্ডার সঙ্গে শিবাজীর মিত্রতা ও জিঞ্জি, ভেলোর প্রভৃতি অধিকার। মুঘলগণ কর্তৃক নলদুর্গ ও গুলবর্গা দখল।

১৬৭৮ জামরুদে যশোবন্ত সিংহের মৃত্যু। পানহালা থেকে শম্ভুজীর পলায়ন ও মুঘলপক্ষে যোগদান।

১৬৭৯ ঔরঙ্গজেব কর্তৃক জিজিয়া পুনঃপ্রবর্তন। দিলির খান ও শম্ভুজী কর্তৃক ভূপালগড় দখল। ঔরঙ্গজেব কর্তৃক মারবার অধিকার ও ইন্দ্রসিংহকে যোধপুরের রাজা হিসাবে ঘোষণা। দুর্গাদাস কর্তৃক মৃত যশোবন্তের পত্নী ও নাবালক পুত্র অজিত সিংহকে উদ্ধার। রাঠোরদের বিরুদ্ধে ঔরঙ্গজেবের যুদ্ধযাত্রা। শম্ভুজীর পানহালায় পুনঃপ্রত্যাবর্তন। শিবাজীর নিকট নৌযুদ্ধে ইংরাজরা পরাজিত। উৎকোচের দ্বারা মুঘলদের গৌহাটি অধিকার।

১৬৮০ মুঘলগণ কর্তৃক উদয়পুর ও চিতোর দখল। শিবাজীর মৃত্যু। মেবারের রাজসিংহের মৃত্যু। রাজারামের নিকট থেকে শম্ভুজীর মারাঠা সিংহাসন দখল ও খান্দেশ লুণ্ঠন।

১৬৮১ রাজকুমার আকবরের বিদ্রোহ। শম্ভুজীর বুরহানপুরে হামলা। মুঘলদের সঙ্গে মেবারের সন্ধি। আকবরের সন্ধানে বুহরহানপুরে ঔরঙ্গজেব। শম্ভুজীর নিকট আকবরের আশ্রয়লাভের চেষ্টা। উইলিয়ম হেজেস হুগলীতে ইংরাজ কোম্পানীর ডিরেক্টর। মারবারের স্বাধীনতা ঘোষণা।

১৬৮২ আকবরের সন্ধানে ঔরঙ্গাবাদে ঔরঙ্গজেব। শম্ভুজী কর্তৃক পোর্তুগীজ অধিকৃত সান্তো এস্তেভাও দ্বীপ দখল। রাজকুমার আজমের নেতৃত্বে মারাঠাদের বিরুদ্ধে ঔরঙ্গজেবের বাহিনী প্রেরণ।

১৬৮৪ রাজকুমার আকবরের আহমদনগরে উপস্থিতি। মুঘলগণ কর্তৃক মঙ্গল-ভিদে ও সাঙ্গোলা অধিকার। বিহারে গঙ্গারাম নাগর কর্তৃক মুঘলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

১৬৮৫ মুঘলদের বিজাপুর অবরোধ। গৌর রাজপুত পাহার সিংহের মুঘলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

১৬৮৬ বিজাপুরে সুলতান সিকন্দর শাহের মুঘল বশ্যতা স্বীকার। ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে মুঘলদের সংঘর্ষ।

১৬৮৭ মুঘল বাহিনী কর্তৃক গোলকুণ্ডা অবরোধ। রাজকুমার আকবরের পারস্য যাত্রা। জাঠ নেতা রাজারাম কর্তৃক মুঘল সেনাপতি উইগুর খান নিহত।

১৬৮৮ মুঘলহস্তে শম্ভুজী বন্দী, রাজারাম মারাঠা সিংহাসনে।

১৬৮৯ শম্ভুজীর প্রাণদণ্ড। রায়গড়ে মুঘল অধিকার। শম্ভুজীর পুত্র শাহ মুঘল হস্তে বন্দী।

১৬৯০ জোব চার্ণক কর্তৃক কলিকাতার পত্তন। মুঘলদের সঙ্গে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বোঝাপড়া। মারাঠাগণ কর্তৃক প্রতাপগড়, রোহিরা, রাজগড় ও তোর্না উদ্ধার। দুর্গাদাসের নিকট আজমীরের মুঘলদের পরাজয়।

১৬৯২ মারাঠাগণ কর্তৃক পানহালা অধিকার।

১৬৯৫ মারাঠা সেনাপতি সন্তার নিকট মুঘলবাহিনী পরাজিত।

১৬৯৭ বিদ্রোহী আফগানদের মোকাবিলার জন্য বাংলায় ইউরোপীয়দের অনুমতি প্রদান।

১৬৯৮ মুঘল অধিকারে জিঞ্জি। মারাঠা রাজারাম কর্তৃক সাতারায় রাজধানী স্থাপন।

১৬৯৯ গুরুগোবিন্দ কর্তৃক খালসা বাহিনী গঠন। পারেন্দায় রাজারাম পরাজিত।

১৭০০ রাজারামের মৃত্যু। মুঘল অধিকারে সাতারা ও পার্লি। বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির পত্তন।

১৭০১ মুঘলদের পানহালা অধিকার। গণ্ডোয়ানায় মুঘলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

১৭০৪ গুরুগোবিন্দের দুই পুত্র ঔরঙ্গজেবের আদেশে নিহত।

১৭০৫ আহমদনগরে ঔরঙ্গজেবের প্রত্যাবর্তন।

১৭০৬ ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে ছত্রশালে বুন্দেলার বোঝাপড়া। ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে মারবারে বিদ্রোহ।

১৭০৭ ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু। অজিত সিংহের যোধপুর অধিকার।

নির্দেশিকা